বেলাভূমির গান

সুশীল জানা

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—চার টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীচণ্ডীচরণ সেন কর্তৃক পি. বি. প্রেস, হইতে মুদ্রিত।

নব উজ্জীবনের অগ্রণী জীবন-শিল্পী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে



বেলাভূমির গান

সুশীল জানা

জীবন

১

এ এক অন্ধবেগ প্রকৃতির রাজত্ব। সময় আর সভ্যতা অতিক্রম ক'রে নিরবচ্ছিন্ন দুরন্ত একটা গতিবেগ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে সমস্তটা আদিম বন্যতা নিয়ে। বয়ে চলেছে—অগাধ অথৈ জলরাশি দিকচিহ্নহীন কূল থেকে কূলে। শুধু বয়ে চলেছে।

ভাঙা কূলে ক্ষুরধার। উচ্ছ্বসিত। গর্জিত। ধসে পড়া পাড়ে ধাক্কা খেয়ে মাথা গোঁজ করে মোচড় মেরে ছুটেছে আবার পোষ-না মানা বুনো ভঁইসের মতো! সামনে সাগর। ওপারে সুন্দরবন। তার কলঙ্করেখাটুকুও দেখা যায় না—ফিকে নীল দিগন্তে হারিয়ে গেছে কোথায়। এপারে নাকচর। কবে নাকের মত একফালি চর জেগে উঠে দুরন্তবেগ স্রোতের মধ্যে সবুজের নিঃশ্বাস ফেলেছিল একটু।—

আহ্ হা! ধস নামলো কোথায় যেন একটা। ঘাস ছেঁড়ার চড়্ চড়্ শব্দ। ঝপাং ···

তবু দম চেপে, দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষুরধার স্রোতের কিনারে এখানে পৃথিবীর শেষপ্রান্তটুকু পড়ে আছে মাথা ঠুকে এখনও। ধস নামছে এখানে ওখানে। পুরাকালের কোনো পাথুরে বীরের মতো—তার হাত ভাঙছে, নাক ভাঙছে, পা ভাঙছে। তবু সংগ্রাম করে যাচ্ছে সময় আর সভ্যতার সঙ্গে। ধস্ নামা খাড়ি পাড় উঁচু হবে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত। সেই পঁচিশ হাত নিচে দিয়ে ভাগীরথী বয়ে চলেছে ঢল-নামা বন্যার মতো। পলিমাটি মেশা ঘোলা রাঙা জল। সে জলধারা ধু-ধু করছে ওপারের দিগন্ত পর্যন্ত।

সে তার অন্ধ গোঁয়ার হাতে গাছ-পালা বন-বাদাড় পরিত্যক্ত কুটির ভেঙে-চুরে দুমড়ে চিড় দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে হিড় হিড় করে। দুর্বার তার অভিযান। নির্মম। অন্ধ।

ঝপাং! ··· আহ্ হা! চালা-ওড়া ন্যাড়া কুঁড়ে একটা উল্টে পড়লো।

দেখো, এক পাশের মাটির দেয়াল একটা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে তবু মরিয়া সৈনিকের মতো। কার হাতে গড়া—কোন মিস্ত্রীর এমন মাটির বাঁধুনী? তবু শেষ পর্যন্ত ও হারবে!—হেরে গেল। পচিশ হাত নিচে একটা ঘূর্ণাবেগ গর্জন করে উঠলো মহা আস্ফালনে। তোলপাড় করে উঠেছে। যেন মত্ত ঐরাবৎ। টলোমল করছে। বিস্তীর্ণ জলধারা। এরা বলে 'গাঙ্।'—'ষোল কোশী গাঙ্।' না-কি এপার ওপার ষোলো ক্রোশ। এখানে প্রকৃতি আদিম। অথৈ আকাশের মতো হাবা এক মহাশূন্যতার মাঝখানে শুধু অগাধ জলধারার নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংসোন্মাদ কলোচ্ছ্বাস।

ঝনা ঝন্ ··· ঝনা ঝন্ ···

তবু এরই মাঝখানে খঞ্জনীর সুরের লহর উঠছে কোথায় খাপছাড়া ভাবে। সঙ্গে খোলের সঙ্গত। গানের আসর বসেছে এরই পাশে কোথায় যেন। মানুষের কলকণ্ঠ—তার গান; তার সৃষ্টি, তার সুর আর ছন্দ। সকরুণ কন্নার মতো একটা সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে ফাঁকা হাওয়ায়।

কতকগুলো লোকের গলা মিলে একটা কান্নার মতো টানা সুর ছুটে এসে গুমরে উঠছে ধস-ধরা খাড়ি পাড়ের গায়ে গায়ে।

আছে। তবু জীবন আছে। হার না-মানা গান-গাওয়া জীবন প্রকৃতির এ অন্ধ রাজত্বেও।

২

চরের চাষীদের গঙ্গাপুজোর উৎসব।

নতুন তৈরী খড়ের চালার হেটো দেউল—না টঙ! তার সামনে নোনা মাটি আর জঞ্জাল নিকিয়ে সাফ করে আসর বসেছে গানের। আসর জুড়ে বসেছে চরের মেয়ে-মরদ কাচ্চা-বাচ্চা। এরাই চরের মানুষ—চাষাভূষো।

আসরের মাঝখানে মূল গায়েন মাধব দাস উঠে দাঁড়ালো। হাতে চামর—গায়ে উড়ুনী। পুবে মাত্র বিশ হাত দূরে প্রলয়ংকরী ভাগীরথী। সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে বন্দনা শুরু করলো বুড়ো মাধব দাস:

আ গ' বন্দে মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি
পাপ তাপ নিবারিণী তুমি।
ধন্য ধন্য বসুমতী যাহাতে গঙ্গার স্থিতি
ধন্য হৈল স্বর্গ পাতাল ভূমি।

লোক আসছে তখনো মাঠ ভেঙে ভেঙে। আসর জমছে আস্তে আস্তে।

মাধব দাসের দীর্ঘ বন্দনা শেষ হলে পর খোল কাঁধে করে একজন বুড়ো মতো বায়েন উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো:

'বলি, হাঁ গা গায়েন?'

'হাঁ?' গায়েন সাড়া দিল।

'একটা কথার মোকে জবাব দাও।'

'হাঁ?'

'বলি মা গঙ্গা তো ছিল এখেন থেকে পঞ্চাশ বিঘা তফাৎ—ঠেলতে ঠেলতে ক-বছরে নিয়ে এলেন যমের দক্ষিণ দুয়ারে। ফি বছর বাঁশের ইয়া মোটা মোটা খুঁটি পুতে, তাতে মা গঙ্গার মঙ্গল ঘট বেঁধে

বলেছি—আর এসোনি মা, যেমন যেখেনে আছ সেইখেনে থাক। ইদিকে চরের বাঁশ ঝাড় সাফ হয়ে গেল শালার খুঁটি পুতে পুতে। তো মা থামে কই বলো ?'

গায়েন মাধব দাস তবু বললো, 'হাঁ ?'—

অর্থাৎ এখনও বাকী আছে বায়েন হরি দাসের চাপান। হরিদাস বললো, 'বল মোকে—মা যদি এতই করুণাময়ী হলেন তবে চরের এত চাষীর সব্বনাশ হলেন কেন বলো ? কোথায় গেলেন মোদের সোনার মাটি, লক্ষ্মীর গোলা—সুখের ঘর ? জবাব দাও।'

আহা, বড় মনের কথা বলেছে বায়েন হরি দাস! খলবল ক'রে খুশিতে হেসে উঠেছে আসরের সবাই :

'হে হে—বল, বল এবার।'

—ধর্মভীরু মানুষগুলো যে-কথা তাদের বোবা ভাগ্যকে শুধিয়েছে বহুদিন—উত্তর পায়নি।

এমনি ফি বছরই পুজো হয় বর্ষা নামার আগে বোশেখ জষ্ঠি মাসে। এ চলে আসছে যেদিন থেকে চরে ধস লেগেছে। পুজো ক'রে ক'রে খতম হয়ে গেছে গোটা পুব চর। পুজো থামেনি তবু। প্রতিমা গড়ে ওরা মকরবাহিনী গঙ্গার। পুজোর শেষে অধিষ্ঠানের বেদীর ওপরে খুঁটি পুতে মঙ্গলঘট বেঁধে রাখে ফি বছর। কিন্তু ধস ঠেকে না। এক একটা বর্ষা আসে আর প্রলয়ংকরী নদী এগিয়ে আসে চিড় দিয়ে দিয়ে। বুড়ো বায়েন হরিদাস বড় মনের কথাটা বলেছে!—

এবার মাধব দাসের জবাব দেওয়ার পালা। অর্থাৎ গঙ্গা উপাখ্যানের আসল পালা আরম্ভ হবে। তার আগে বায়েন গায়েন জিরোতে বসলো। তামাক টামাক খেয়ে সুরু হবে আবার।

এমন সময় এক কাণ্ড করে বসলো দীন দাস বৈরাগী। আসরের এক কোণা থেকে বলে বসলো, 'এবার মোদের অস্তাদ একটু বাজাও হে শুনি।'

'হাঁ—অস্তাদ !—'

চারদিকে হাঁক ডাক পড়ে যায়। হঠাৎ কথাটাকে লুফে নিল সবাই। উৎসাহে ছোকরাদেরই সংখ্যা বেশী।

'অস্তাদ !—ডাক মোদের অস্তাদকে হে।'—

কিন্তু ওস্তাদ আসরে নেই।

পেছন থেকে কে একজন বলে উঠলো, 'অস্তাদ দাঁড়িয়ে আছে হোই গাঙ ধারে।'

'ডাক।'—

আসর থেকে ছোকরা মতো দু'জন উঠে গেল ওস্তাদকে ডাকতে।

'হোই যে অস্তাদ মোদের।'—

একটা পড়ো ভিটের ঢিপির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা—দেখছে এক মনে ভাঙা কূলের দিকে চেয়ে চেয়ে। চিড় খাওয়া মাটি খসে ঝরে ঝরে পড়ছে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে। একটা কুঁড়ের আধখানা দেওয়াল হেলে আছে গাঙের দিকে। পাশের একটা নারকোল গাছ দোল খাচ্ছে নিঃশব্দে। দেখছে ওস্তাদ—দেখছে চরের চাষী মেয়ে-মরদের মুখে সর্বস্ব খোয়াবার চাপা অসহায়তা। গাঙের ধারে আসছে তারা ডাব ভাসাতে। সিঁদুর-মাখা ফুল-পাতা, ফল-মূল, ডাব ভাসাচ্ছে সবাই এসে—ভাঙা কূলে মাথা ঠুকে ঠুকে গড় করছে ভক্তিভরে: বাস্তু জমিন বাঁচাও মা গঙ্গা!

বুড়ো হরনাথ লাঠি ঠুকে ঠুকে এসে দাঁড়ালো ঢিপির তলায়—পেছনে তার মেয়ে আর বউ। ডালা ভাসাতে এসেছে গাঙে। হরনাথের হাতে সিঁদুর মাখানো ডাব একটা। কিন্তু বুড়ো গাঙের ধারে এসে এক মুহূর্তে যেন ভুলে গেছে সব। চেয়ে আছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। অথৈ গাঙের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ ক'রে। চোখে হতাশা আর ভয়। পাকা চুলগুলি বাতাসে ফুর ফুর ক'রে উড়ছে। সময়

আর শ্রম দাগ মেরে মেরে গেছে সারা মুখে তার—মুখের প্রতিটি কুঞ্চিত রেখায় আছে এই ভাঙন-ধরা চরের আবাদের ইতিহাস—আরণ্যক মৃত্তিকার ইতিহাস। সে সমস্তটা সামনের সর্বনাশা অথৈ গাঙের কাছে ব্যর্থতায়, হতাশায় যেন হা-হা ক'রে উঠছে ওর উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গীতে। ওস্তাদ চেয়ে আছে হরনাথের মুখের দিকে : এই এ চরের মানুষ !

পেছনে হরনাথের বউ তাড়া দিল, 'দেখ কি—ভাসিয়ে দাও না ডাবটা !' তাড়া দিল মেয়েকেও, 'তুইও যে দাঁড়িয়ে রইলি লো বাসি !'—বলে নিজের হাতের ফল ফুলের ডালা ভাসিয়ে দিল গাঙে।

হরনাথের হুঁস ফিরে এলো যেন। বললো, 'এই দিই বউ। নাও মা—শান্ত হও। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি—বাঁচাও মা, আশ্রয় দাও। মা গো !'

হাতের ডাবটা গাঙে ভাসিয়ে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলো হরনাথ—সঙ্গে সঙ্গে তার মেয়ে বউও। আর মুখ তুলে তাকালো যখন—ঝপাং করে শব্দ হলো পাশে। কঠিন বিদ্রূপের মতো সেই ছিলে থাকা ভাঙা দেওয়ালটা পড়ে গেল গাঙে।

ঢিপির ওপর থেকে দেখছে ওস্তাদ।—দেখছে হরনাথও ফ্যাল ফ্যাল করে। তার বউ আর মেয়ের চোখে সেই হৃতসর্বস্ব ভয়।

বউ বললো, 'গেল—বাঁকা জান্‌কীর বাপের ভিটার শেষ চিহ্নটুকুন গেল আজ।'

হরনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'মোদেরও ওই দশা হবে বাসির মা।'

'রাখ তোমার অলক্ষুণে কথা।'

'অলক্ষুণে কথা—না ?' হরনাথের কথায় আত্মঘাতী বিদ্রূপ। বললে, 'কোথায় ছিল গাঙ এক কোশ তফাৎ—আর আজ ঠেলতে ঠেলতে এসেছে কোথায় ! বাকী চরটুকুন আর কদিন ! তারপর

ভাসলম মোরা কপাল নিয়ে।'—

'আজ ওসব কথা বলতে নাই। থামো তুমি।'

'আমি থামলে গাঙ তো থামবেনি বাসির মা। ওই তো সরকারের বাঁধ—মাটি পড়লোনি এক মুঠা। একটা জোয়ারের তোড়ে এই বর্ষায় ধুয়ে মুছে যাবে সব। হোই গ্যাখো না'—

লাঠি উঁচিয়ে দেখায় হরনাথ। সর্পিল এমব্যাংকমেন্ট বাঁধ চলে গেছে গাঙের ধারে ধারে—জীর্ণ, সংস্কারহীন, বিধ্বস্ত। বাঁধের এপারে ভাঙা পাড় ঘেঁষে পড়ো ভিটে, ঢিপি আর থৈ-থৈ গাঙ—ওপারে এখানে ওখানে ছোট ছোট কুঁড়ের ঘন বসতি—নারকোল বন। আর শস্যশূন্য মাঠ হা-হা করছে বহুদূর থেকে বহুদূরে। সেই মাঠকে খোপে খোপে ভাগ করেছে ঘেরি বাঁধে—সেগুলো হলো জোতদার মালিকদের জমিদারী, চারদিকে বাঁধ দিয়ে ঘেরা চৌহদ্দী সীমানা। সোনামাটির সীমানা-বাঁধগুলোও গলে গলে পড়ছে এখানে ওখানে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয়, সমস্তটা কেমন যেন হৃতসর্বস্ব—লক্ষীছাড়া। তবু এরই মাঝখানে গঙ্গা পুজোর উৎসবের কোলাহল ফেটে পড়ছে থেকে থেকে—ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দমকা হাওয়ায় মাঠ প্রান্তর মুখর ক'রে।

চেয়ে চেয়ে দেখছে ওস্তাদ।

'অস্তাদ!'

ঢিপির ওপরে চোখ পড়েছে সখীর। ডাকলো। চিকন সরল মুখটা হেসে উঠছে যেন ওস্তাদকে দেখে। বললো, 'আসরে বাজাবে না কি গো অস্তাদ?' তারপরই হেসেই সে কুটি-কুটি। বললো, 'উদিকে মা গঙ্গার পূজা, পালা গান—আর ইদিকে ঝপাং ঝপাং করে চর ধসে পড়ছে গো অস্তাদ। কুনদিকে যাই বলো মোকে।'

সখীর কথা শুনে কটমট করে তাকালো হরনাথের বউ।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ওস্তাদ বিব্রত বোধ করে: কি জানি—মুখফোঁড় মেয়েটা আবার কি বলে বসে।

এমন সময়ে আসরের ডাক নিয়ে এলো সেই দু'টি ছোকরা। বললো, 'চলো অস্তাদ—তোমার বেহালা শুনবে বলে বসে আছে সবাই আসরে। চলো—'

তাদের দিকে তাকিয়ে ম্লান মুখে হাসলো ওস্তাদ। মাথা নাড়লো।

'উঁহু'—একটি ছোকরা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ভিনগাঁয়ে এত তোমার নামডাক আর আজকের দিনে তুমি বাজাবেনি গাঁয়ের আসরে—ইটি হবার লয় অস্তাদ। বেহালা কোথায় তোমার?'

ওস্তাদ শূন্য দু-হাত নেড়ে দেখালো—বেহালা নেই।

'চলো তুমি—বেহালা তোমার ঘর থেকে এনে দেবো মোরা।'

ছোকরা দু'টি মহা উৎসাহে ওস্তাদকে পাকড়াও করে নিয়ে চললো।

ওরা টিপি থেকে নেমে এগোলো আসরের দিকে। হরনাথ চেয়ে আছে তখনো গাঙের বিস্তারিত জল-ধারার দিকচিহ্নহীন ওপারে।

হরনাথের বউ তাড়া দিল, 'চলো এবার ঘরে।'

হরনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো যাওয়ার জন্যে।

যেতে যেতে তাকালো একবার আসরের দিকে। অন্যমনস্ক। চরের সর্বনাশা ভাঙনের পঁচিশ হাতের মধ্যে কোনো উৎসব কোলাহল ফেটে পড়ছে থেকে থেকে—চমকে দিচ্ছে হাওয়া, এটা যেন দাগই কাটে না হরনাথের মনে। বরং এই গঙ্গা পুজোর উৎসবের গভীরে এই চরের যে শঙ্কিত হৃতসর্বস্ব চোখ দুটো চেয়ে আছে ভাঙন-ধরা খাড়ি পাড়ের দিকে—হরনাথ হ'লো যেন তার মূর্ত প্রতীক। সুগভীর শোকচিহ্ন। আসরের কোলাহল স্পর্শ করে না তাকে।

তবু কিছু দূরে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটছে মানুষের সবল কলকণ্ঠের। কাচ্চাবাচ্চা চেঁচামেচি করছে বেপরোয়া। চরের বেকার কুকুরগুলো

মাটি শুঁকছে আশপাশের। একটা কুকুর থমকে দাঁড়ালো—চাইলো হরনাথের দিকে, অপেক্ষা করলো যেন—হয়তো এই বুড়োটাও হঠাৎ সবল কণ্ঠে গলার পেশী ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠবে। না। হরনাথ আসরের দিকে চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো শুধু: আসরের কোলাহলমুখর লোকগুলো যেন ভুলে গেছে কয়েকটা দণ্ডের জন্তে ভাঙনের কথা—উদ্যত সর্বনাশের কথা।

হরনাথের বউ বললো, 'যাবে নাকি আসরে ?'

'না বাসির মা।'

হরনাথ এগোলো লাঠি ঠুকে ঠুকে।

ওদিকে আসর লক্ষ্য করে লোক ছুটেছে তখন পিল পিল করে মাঠ বাট ভেঙে। ছড়ানো ভীড় জমাট বাঁধছে ধীরে ধীরে। খোলা গা, হাঁটু পর্যন্ত ঝুল কাপড়, কালো কালো পুরুষগুলির মাঝখানে কিসান বউদের হলুদে ছোপানো কাপড়ের রঙীন ঝিলিক। মাঝে মাঝে কচিৎ ফিকে গোলাপী। হরনাথকে ছুরির মতো বিঁধছে সবটা—বিঁধছে তাদের ছিটকে আশা হাল্‌কা হাসি, সাজগোজ, হর্‌রা। বুড়ো চোখে ভাসছে কেবলি তার: বাঁকা জান্‌কীর বাপের ভিটের হিলে পড়া শেষ দেওয়ালটা ঝপাং ক'রে পড়ে গেল কেমন করে !

বিড় বিড় ক'রে বললো হরনাথ, 'যাবে—সব যাবে এবার'—

৩

বুড়োদের ভালো লাগেনি ব্যাপারটা। আসরের আসল গাওনা গঙ্গামঙ্গল গানকে চাপা দিয়ে কে না কে এসে বেহালা বাজাবে—এ কেমন কথা! বুড়ো হরি মণ্ডল মাতব্বর মানুষ। উঠলো আসর ছেড়ে আগে।

কে বললো, 'বড় মণ্ডল উঠলে যে গো ?'

'নাঃ, শোন তোমরা।' হরি মণ্ডলের মুখ ব্যাজার। বললো, 'মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা বাজাবে—মোরা কি বুঝবো বুড়া লোক বল?'

হরি মণ্ডলের পেছনে পেছনে আরও দু-পাঁচটি বুড়ো উঠলো গা-ঝাড়া দিয়ে।

কে একটি ছোকরা বললো, 'সবাই বোঝে—আর তুমি বুঝবেনি মাতব্বর! হাট-গঞ্জের লোক এক কথায় বলে—নাকচরের অস্তাদ। বাস্—বুঝে নাও সে মোদের চরের লোক।'

'বেশ তো! শোনো তোমরা চ্যাংড়ারা।' হরি মণ্ডল আরও একটা খোঁচা লাগালো। বেরিয়ে গেল আসর থেকে। 'বাজনা শোন মুখি রাঁড়ীর ব্যাটার।'

মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা'!—চরের পুরাণো কথা একটাকে হঠাৎ টেনে এনে আসরে ছেড়ে দিয়ে গেল হরি মণ্ডল গুবরে পোকার মতো। সে হলো চন্দ্র ওস্তাদের জন্ম-কথা। দু-একটি বুড়ো তখনও উঠি উঠি করেও উঠছে না। বরং পেড়ে বসেছে মুখি রাঁড়ীর প্রসঙ্গ।

সে অনেক দিন আগের কথা। চরের মালিকের তহশীলদার কেনারাম কর এই চরে আসতো চাষীদের ধান বুঝে নিতে—মাড়াই করে, ভাগ করে মালিকের অংশ বেচে দিয়ে যেত ফড়ে মহাজনের কাছে। যে কটা দিন থাকতো সে—সে ক'দিন আস্তানা গাড়তো মুখি রাঁড়ীর ঘরে। বিধবা নিঃসন্তান মানুষ। জমি ভুমি ছিল না কিছুই—ওই মাথা গোঁজার চালাটুকু ছাড়া। তবু তার অভাব ছিল না, তহশীলদার কেনারামের দৌলতে। কিছুদিন পরে মুখি রাঁড়ীর পেটে এলো চন্দ্র। সে ভূমিষ্ঠ হলো। তারপর থেকে কেনারাম এলো না আর এ চরে ধান বুঝে নিতে। সরে পড়লো। সেই সব কথা ওঠে আসরে।

একটি বুড়ো একেবারে নিখুঁত ভাবে হিসেব বুঝিয়ে দিলে, 'সেবার চৈত্ মাস কেটে গেল—ফসল আর ওঠে না গোলায়। মালিকের

কোনো লোকই আর আসে না।—মনে নাই ? কেনারাম সেই যে গেল—বাস্। মুখি গলায় দড়ি দিল সেই বছর বর্ষার সময়ে। তারপর তো ওই দীন দাস মানুষ করলো চন্দ্রকে। জিজ্ঞেস করো না, দীন দাসকে।'

মাথা হেঁট করে বসে আছে বুড়ো দীন দাস। সে-ই মানুষ করেছিল বটে। বৈরাগী মানুষ—একটা পুরানো রংচটা বেহালা কাঁধে করে ভিক্ষে করে বেড়াতো গ্রামে গ্রামে। এই তার বৃত্তি। সে-ই হ'লো চন্দ্র ওস্তাদের গুরু। সে-ই নিয়েছিল মুখি রাঁড়ীর অবাঞ্ছিত সন্তানটির ভার।

তারপর কথায় কথায় ওঠে কেনারাম তহশীলদারের জুলুম। কি রকম জবরদস্তি করতো কেনারাম—সেই সব কথা এসে পড়ে একে একে। মাতব্বর হরি মণ্ডলের গুবরে পোকাটা উড়ে বসছে এখান থেকে ওখানে—এ-মুখ থেকে ও-মুখে।

একটি বুড়ো উঠলো।

'মামা উঠলে ?'

'উঠি বাবা !—এলম একটু ধম্মকথা শুনতে—তা আর হলোনি।'

'যে ধম্মকথা শুরু করলে তোমরা।' একটি ছোকরা বলে উঠলো। মুখে মুখে।

ছোকরারা ক্ষেপে গেছে। বললো, 'যাক—যার ভালো না লাগে উঠে যাক। মোরা শুনবো ! অস্তাদের বাপ-মা যে-ই হোক—সে মোদের লোক, মোদের চরের লোক।'

'শোন বাবারা—শোনো তোমরা তোমাদের বেহালা।' একটি বুড়ো ঘুরে বলে গেল, 'কিন্তু সে মোদের লোক নয়। নাকের জলে চোখের জলে হৈছি কেনারাম তশীলদারে সময়। সে-সব মনে আছে। তার রক্ত আছে ওর দেহে।'—

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বুড়ো উঠতে উঠতে ফোড়ন কাটলো, 'মাহিন্দ ফৌত হয়ে গেল। নন্দ গেল, মথুর গেল। কত দেখলম।'

'আর বিধবা বউগুলানকে বার করে নিয়ে গেল কোথায় না কোথায় শালা মহাপাতক।'

'তার ঔরসে ওর জন্ম। আবার বেজাত!'

'মোরা জানিনি সে-সব পুরানো কথা।' একটি ছোকরা বলে উঠলো, 'মোদের অস্তাদের অতো নাম-ডাক হাটে গঞ্জে—আর মোরা একদিন আসরে বসে শুনবনি তার বেহালা! যাও—তোমারা না শোন চলে যাও।'

জনা পাঁচেক বুড়ো উঠে গেল শুধু আসর ছেড়ে। গিয়ে কিন্তু ঘুরতে লাগলো আশেপাশে আসরের বাইরে। জটলা করতে লাগলো বুড়োরা মিলে। অতো বড় আসরটার একটি লোকও কেউ উঠে এলো না আর।

এমন সময় চন্দ্র ওঁস্তাদ এসে দাঁড়ালো আসরের মাঝখানে। ছেলে ছোকরারা কলরব করে উঠলো। কে একজন ছুটলো তার বেহালা আনতে। আসরের বাইরে বসে ক'জন বুড়ো মুখ চাওয়া চাউয়ি করলে শুধু।

তারপর হঠাৎ যেন একটা বুক-ফাটা আর্তনাদ ফেটে পড়লো ফসল-তোলা হা-হা করা মাঠে—ভাঙন-লাগা খাড়ি পাড়ের চিড়ে চিড়ে, চরের নারকোল বনে আর কিসানদের হুমড়ি খাওয়া কুঁড়েগুলোর আনাচে কানাচে। অবাক হয়ে চেয়ে আছে আসরের মানুষ—দেখছে রোগা মতো একটা লোককে। তার রোগা আঙুলগুলো বেঁকে কুঁজে চেপে চেপে বসছে তারের ওপর—রোগা মুখটাকে মনে হচ্ছে যন্ত্রণা-কাতর। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হবে। এ তল্লাটের নাম করা যাত্রার দল কুঁকড়া-হাটি অপেরা পার্টিতে বেহালা বাজায়। এই তাদের ওস্তাদ। নাম-ডাক গ্রাম-গ্রামান্তরে হাটে গঞ্জে। ডাক আসে বড়লোক বাবু মশায়দের বৈঠক-জলসা থেকে। ফিরে আসে প্যালা নিয়ে। চরের

মানুষ দেখেছে দিনের পর দিন। বাবু মশায়দের পাড়ায় যাত্রাগানের আসর ছাড়া এমন করে নিজেদের আসরে কোনদিন এ চরের মানুষ শোনেনি তার বেহালা।—শুধু শুনেছে তার খ্যাতি। পুরানো জন্ম-কথা পুরানো হয়ে গেছে নতুন আমলের ছোকরাদের কাছে, চলে গেছে একটা হেলা-ফেলার তাচ্ছিল্যের ভাব। আজ চুপ করে থাকে সারা আসর। আর একটা বোবা আর্তনাদকে গুমরে গুমরে উঠতে শোনে দমকা হাওয়ায়।—তারপর আস্তে আস্তে নিজেদের বুকের মধ্যেই। দীর্ঘদিনের একটা জমানো কান্না যেন মাথা কুটে মরছে বুকের ভেতরে।

সারা আসর শুনছে স্তব্ধ হয়ে—সকলের মুখে পড়েছে একটা বেদনার সকরুণ ছায়া। কেউ মাথা গুঁজে বসে আছে—কেউ বিষণ্ণ চোখে চেয়ে আছে অথৈ উদ্দাম ভাগীরথীর দিকে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস। এই রোগা লোকটা পুজো উৎসবের হল্লায় চাপা পড়া দীর্ঘশ্বাস একটাকে কোন এক দুর্জ্ঞেয় মন্ত্রোচ্চারণে সাপের মতো জীইয়ে তুলছে যেন। মুখটাকে মনে হচ্ছে তার আরও যন্ত্রণা-কাতর, একটা দুঃসহ কি যেন দাঁতে আর ঠোঁটে চেপে চেপে রাখছে সে, চোখ দুটো কেমন যেন ঝকোমক্ করছে। কোনো দিকে দৃষ্টি নেই তার—তবু কি যেন সে দেখছে, চোখে তার সেই দুরান্তের দৃষ্টি।

দেখছে সে। দেখছে এমব্যাংকমেন্ট বাঁধের এপারে দীর্ঘ ফাটল ধরা বাতিল পরিত্যক্ত চর—পড়ো ভিটে—হা-হা করা মাঠ—হরনাথের উদ্‌ভ্রান্ত বুড়ো মুখটা, তার পাশে একটি মেয়ের তরুণ তাজা মুখ। আর ধু-ধু জলধারা। অথৈ এপার ওপার। ভেঙে ভেঙে পড়ছে এপার—নাকচরের সবুজ নিশানা!—অগাধ জলরাশির কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সব ভেসে যাচ্ছে তীব্রবেগে—ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই চর—কুঁড়ে নারকোল বন। মানুষ। সব। ওর বেহালার সুরে কেঁপে কেঁপে উঠছে সেই হৃতসর্বস্বতার সুরটা যেন।

আসরের বাইরে বুড়ো ক'জনা জটলা পাকিয়ে বসেছে একজায়গায়। নিঃশব্দে মুখ নীচু করে শুনছে আর দাগ কাটছে মাটির ওপরে একজন। ক'জন চেয়ে আছে হরনাথের মতো উদ্‌ভ্রান্ত চোখে সেই পুবের অথৈ জলরাশির দিকে। মুখে একটা কালো বেদনা জমাট বেঁধে গেছে যেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সবাই। আসরে বেহালাটা থেমে গেল ইনিয়ে বিনিয়ে।

বুড়ো দীন দাস কেঁদে ফেলেছে হা-হা করে। বললো, 'সার্থক হাত—কে আছে আর অমন—'

কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে লাগলো বুড়ো।

পাশ থেকে কে একজন ফিস্‌-ফিস্‌ করে বললো, 'সে তো তোমারই দৌলতে গো!'

'আমি কিছু না গো—ও ওর আর জন্মের পুণ্য।'

আসর স্তব্ধ হয়ে আছে তখনও। কেউ কথা বলছে না। আশ্চর্য! সামান্য এই চাষীর গ্রামের সব কথা—সব হাল্লা যেন কেড়ে নিয়েছে ওস্তাদ। এতগুলো লোককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সেই চাপা-পড়া সর্বনাশের মুখোমুখি—হৃতসর্বস্ব একটা দীর্ঘশ্বাসের সামনে।

'আবার বাজাও অস্তাদ।'

কে একজন বলে উঠলো পেছন থেকে।

ওস্তাদ হাসলো ম্লান মুখে। লোকটা ঘেমে গেছে।

'বাজাও অস্তাদ।'—

নিঃশব্দে একটু হেসে আস্তে আস্তে আবার বেহালায় ছড় টানলো ওস্তাদ।

গায়েন মাধব দাসের দলবল মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলো একটু। খোল কত্তাল মন্দিরা চামর-টামর টেনে এবার আসরে উঠবে ভাবছিল তারা কিন্তু আবার বেহালার ফরমাসে সব সরিয়ে গা-ছেড়ে বসলো।

বসে রইলো হতাশ হয়ে। মাধব দাসের মুখটা ব্যাজার ব্যাজার লাগে। বললো :

'মোদের পালাগান শালা টানো এখন রাত তিন পহর পর্যন্ত।'

'হাঃ!' বায়েন হরিদাস খোলটা সরিয়ে রেখে হতাশ হয়ে বসলো।

চন্দ্র ওস্তাদের বেহালা তখন কলরব ক'রে উঠেছে আবার। এবার আর সেই বুক-ফাটা আর্তনাদ নয়। এ কেমন দোল দিচ্ছে যেন বুকের গভীরে'। আসরের মুখে আর বেদনার কালোছায়া নেই। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওস্তাদের রোগা চেহারাটার দিকে। এ চাষীর গাঁ যেন লোকটাকে নতুন ক'রে চেনবার চেষ্টা করছে। ওস্তাদের মুখটা কেমন হাসি হাসি যেন। আশ্চর্যভাবে সুরের হিল্লোলিত চাপল্য একটা লাগছে গিয়ে সকলের মনে, মন থেকে দেহে। দুলতে সুরু করেছে মানুষগুলো—প্রথম মাথা, তারপর যেন সারা দেহ—তালে তালে। বায়েন হরিদাস বুড়ো কখন কাছে টেনে নিয়েছে দূরে সরানো খোল। আর একজনের হাতে কখন উঠেছে মন্দিরা। তাল পড়ছে মৃদু মৃদু : ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্। তারপর হিন্দোলে হিন্দোলে হাততালি—সারা আসর দুলছে তালে তালে। দীন দাস গোঁজ মাথাটা ঝিঁকোচ্ছে সেই তালের সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য! আসরের বাইরে হরি মণ্ডলের দলের কয়েকটি বুড়োও দুলছে সেই তালে তালে, শুধু মুখটা যা ব্যাজার ব্যাজার।

মাথা গোঁজ ক'রে শক্ত হয়ে বসে আছে শুধু একা হরি মণ্ডল। বুড়োর চোকো মুখটা হয়ে উঠেছে বৈশাখের রোদপোড়া মাঠের মতো।

এমন সময়ে কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে দিলে কে পেছন থেকে। খলবলিয়ে হেসে বলে উঠলো, 'হায় গো মণ্ডল, এখানে বসে বসে শুনছো! আমি ভাবলম—ঘেন্নায় রাগে একেবারে চলে গেলে বুঝিন।'

সেই দুর্মুখ মেয়েটা—সখী। হরি মণ্ডল কটমট ক'রে তাকালো। সখী হেসে উঠলো ফের।

বেহালা থামলো চন্দ্র ওস্তাদের। এলোমেলো গলার একটা হাল্লা উঠলো আসরে—ছিটকে ছড়িয়ে পড়লো মাঠের বোবা আকাশে, চরের ফাটলে ফাটলে। হরি মণ্ডলের দল চোখে চোখে চাইলো পরস্পরের দিকে। তারপর বসে রইলো গুম মেরে। নানা ভাবে নানা কণ্ঠে চন্দ্র ওস্তাদ আর তার বেহালার নাম ছিটকে ছিটকে আসছে আসর থেকে—হরেক রকমের তারিফ। সবটার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে কথায় কথায়—এই চরের নাম, আর তার গর্বের মানুষটি।

'গাঙের এপারে কে আছে এমন আর! মোরা ঢের শুনেছি।'—

ছোকরা মতো একজন বলে উঠলো, 'তবু বুড়ারা ক-জন উঠে গেলঁ হে। মোদের অস্তাদের বেহালা তাদের ভালো লাগলোনি, যার অত নাম ডাক।'

'মরুক। আর একখানা ধরে দাও অস্তাদ।'—

আবেগে আবার কেঁদে ফেলে বুড়ো দীন দাস। গ্রামের কজন বুড়ো মানুষ একটু আগেই উঠে গেছে আসর থেকে—তার ভেতরে আছে মাতব্বর হরি মণ্ডল। খোঁচা মেরে গেছে চন্দ্রের জন্মপ্রসঙ্গ নিয়ে—এমন খোলা আসরে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে গেছে। ব্যাপারটা বড় বিঁধেছিল দীন দাসকে। এ রকম বিঁধেছে বহুদিনই—চরের মানুষ তার হাতে গড়া একটা গৌরবের বস্তুকে চিনতে পারলো না বলে। আজ সেই গ্রামের আসরে চরের এতগুলি লোকের মুখে যখন চন্দ্র ওস্তাদের তারিফ উছলে পড়ে তখন নিজেকে আর যেন সামলাতে পারে না দীন দাস। কেঁদে ফেলে। বহু দিনের সাধ মিটেছে একটা এতদিনে। জড়িয়ে ধরে গিয়ে চন্দ্র ওস্তাদকে:

'জীবন সার্থক মোর চন্দ্র—সার্থক মোর গুরুর বিদ্যা।, মোর সব সাধ আজ মিটে গেছে বাপ।'

ওদের দু'জনকে ঘিরে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়েছে আসরের এক অংশ। ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠলো :

'আহা, মোদের অস্তাদের মুখটা যদি ফুটতো!'

'নাই বা ফুটলো মুখ বাপুরে।' বুড়ো দীন দাস ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, 'মুখের কথা তিতা হয়, মিঠা হয়, সাচা হয়—মিছাও হয়। কিন্তু মনের কথা? সেই আসল সুখ-দুঃখের কথাটি বলে এই যন্ত্র বাপ্। এ হাসায়, কাঁদায়—বুক ভরে দেয়। মুখ এরও ফুটে না। তাই অনেক কষ্ট ক'রে মানুষের মনের কথাটিকে বলতে হয় এই শুকনো কাঠের যন্ত্রটিকে।'—ব'লে চন্দ্র ওস্তাদের হাত থেকে বেহালাটা নিজের হাতে নিয়ে যেন পরম স্নেহে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলো তার গায়ে : তার হাতের বেহালা—তার অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে জড়ানো। চন্দ্রের দিকে চেয়ে বললো আবার আস্তে আস্তে,—হয়তো নিজের জীবনের দিকেই চোখ রেখে, 'কত জনে হয়তো কত কি বলবে, করবে—কিন্তু মনের কথাটি জানবে না তারা। সে জানবে, সে বলতে পারবে শুধু এই যন্ত্রটি বাপ।'—বলে বেহালাটা তুলে দিল আবার চন্দ্র ওস্তাদের হাতে।

আবেগের মুখে কথা আর থামতে চায় না দীন দাসের মুখে। হ্যাঁ, অনেক দিনের সাধ মিটেছে তার। মুখি রাঁড়ী গলায় দড়ি দিল, তহশীলদার সেই যে চর ছাড়লো—এলো না আর। একটা বোবা অনাথকে অনেক দিন ধরে অনেক কষ্টে মানুষ করেছে দীন দাস পরম স্নেহে। বেহালা শিখিয়েছে তাকে হাতে ধরে ধরে। হেসেছে সবাই। ঠাট্টা করেছে চরের মানুষ :

'ওকে ভিক্ মাগতে সঙ্গে লিয়ে যাবে নাকি গো বৈরাগী?'

দীন দাস বলতো, 'মুখ যে ফুটে না গো বেচারার, জমি ভূমিও নাই যে চাষ আবাদ ক'রে খাবে। তাই শিখাই। শিখলে তবু ভিক মেগেও তো খাবে। পড়েছে বৈরাগী ফকিরের হাতে। আর কি হবে বল।'

সেদিনের সেই বোবা বাচ্চাটার আজ এত নাম ডাক। নাই বা ফুটলো তার মুখে কথা!

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বললো, 'মোদের অস্তাদের হাত যেন কথা বলে গো!'

দীন দাস বললো, 'বলে বলে—মনের কথা বলে। যেখানে ফাঁকী নাই গো—সব সাচ্চা।'

সারা আসরটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। গায়েন মাধব দাসের দল মুখ ব্যাজার ক'রে বসে আছে একপাশে। আসরের মেজাজ বদলে গেছে একেবারে। মাধব দাস চটে বলে উঠলো :

'তো মোদের গাওনা আর হবে কি না।'

'হবে বৈ কি গায়েন—গাওনা না হলে চলে! এই বসো—বসে যাও সব। বসে পড়ো'—

মাধব দাস মুখ ভার করে উঠে দাঁড়ালো আসরে—হাতে চামর। খোলে চাঁটি পড়লো—ঠুন্ ঠুন্ করে উঠলো আবার মন্দিরা। গান ধরলো মাধব দাস :

আ মা এলি গো।
আনন্দে দুন্দুভি বাদ্য বাজিল গো॥

কতকগুলো সরু মোটা কণ্ঠের ঐকতান একটা বিষণ্ণ হাওয়ার মতো হা-হা ক'রে ছুটে গেল বাতিল চরের শূন্য প্রান্তরের ওপর দিয়ে। বিকেলের মলিন আলো তখন কালো হয়ে আসছে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারে।

দীন দাস আসর ছেড়ে ঘরের পথ ধরলো। বুড়ো বুকের মধ্যে একটা আনন্দ তোলপাড় করছে আজ—একজায়গায় যেন আর বসে থাকতে পারছে না।

তুলসী ছুটে এলো। বগলে তার চন্দ্র ওস্তাদের বেহালাটা। ডাকলো, 'তুমি চলে যাচ্ছ বাবা?'

দীন দাস ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, 'অন্ধকার হয়ে গেলে দেখতে পাবো না আবার। চলে যাই এই বেলা। যাবি আমার সঙ্গে?'

'না, তুমি চলে যাও তা হলে। অস্তাদের সঙ্গে যাব আমি। তুমি শুধু এই বেহালাটা নিয়ে যাও বাবা।'

'ওরে বাপরে, এমনিতে অন্ধকার হয়ে গেছে—কোথায় ফেলবো, কি করবো!—তুই নিয়ে যাস। ও তোর হাতে দিয়েছে—তুই রাখ মা।'

তুলসী হাসলো বিব্রত ভাবে। বললো, 'ইটি বগলে করে আসরে বসতে যে মোর লাজ পায় বাবা!'—

দীন দাস হো-হো করে হেসে উঠলো। বললো, 'তুই তবে নিলি কেন?'

'দিল যে মোর কাছে গছিয়ে। দিয়ে চলে গেল। এখন বয়ে নিয়ে যেতে হবে মোকে।' হাসতে লাগলো তুলসী নিঃশব্দে—সলজ্জে।

সে মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ বড় ভালো লাগে দীন দাসের। তার লজ্জা-রাঙা মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আজ প্রথম এই কথাটি মনে হয়, মেয়ে তার ডাগর হয়েছে। ও লজ্জা তার একটা পুরুষের জন্যে।

গ্রামে অত বড় মেয়ে কে রাখে আইবুড়ো করে ঘরে? তবু রেখেছে দীন দাস। বিয়ে দেবে চন্দ্র ওস্তাদের সঙ্গে। এ-কথা চরের সবাই জানে।

কিছুটা এগোতেই সামনে পড়ে হরি মণ্ডলের দল। দীন দাস যেন লক্ষ্যই করে না তাদের প্যাঁচার মতো মুখ। আজ চন্দ্র ওস্তাদের আসর মাতানো দিনে মশগুল হয়ে আছে সে। এক গাল হেসে বরং বলে বসলো, 'উঠে এলে মণ্ডল! কেন কি জানি—চটে গেল সব। দু-দণ্ড বসে শুনলে মন তোমাদের ঠাণ্ডা হয়ে যেত—এ আমি বলে দিলম।'

'ঠাণ্ডা হতে আর বেশী দেরী নাই হে বৈরাগী।'—হরি মণ্ডল গাঙ লক্ষ্য করে বললো, 'সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তোমার আর কি! জমিভূমি—চাষ-আবাদের চিন্তা নাই, গোরু-ছাগল পরিবারের চিন্তা নাই।'

'আমি বৈরাগী মানুষ মণ্ডল।'—সাদাসিধে ভাবে জবাব দিল দীন দাস। বললো, 'এক চিন্তা মোর ওই মেয়েটা।'

হরি মণ্ডল বললো, 'তার আর ভাবনা চিন্তা কি! শুনি জামাই তো তোমার ঘরেই আছে বৈরাগী।—চন্দ্র অস্তাদ। তা বিয়ে সাদি একটা হবে না যেমন আছে তেমনি থাকবে? একদিন শুনবো ফের —অমুকের ছেলে হলো গো।—শালার ই চরের কাণ্ড তো?' বলে হাসতে লাগলো—চাকু-মারা হাসি।

'বিয়ে সাদি হবে বৈকি মণ্ডল। হবে এইবার।'—অত্যন্ত লজ্জিত সপ্রতিভ হয়ে বললো দীন দাস।

'তবু ভালো।' হরি মণ্ডল তেমনি হেসে হেসে বললে, 'তবে মিলবে ভালো। চুকিয়ে ফেল। অমন ঘর কোথায় পাবে আর! যেমন চ্যালা—তেমনি গুরু'—

কথাগুলো বসছে কেটে কেটে। তার চিড়িকটা এবার লাগে দীন দাসের গায়ে। বুঝতে পারে। ভালো মানুষী হাসি হাসি মুখটার রং বদলে যায় আস্তে আস্তে। তবু হাসতে হাসতে বলে, 'আমি বৈরাগী

মানুষ গো মণ্ডল। মোকে ওসব কথা শুনিয়ে লাভ নাই ভাই। সব সমান মোর কাছে। ছোট বড়—জাত অজাত। ওসব ভাবি না মণ্ডল, ভাবি মোর মেয়ের সুখে থাকার কথা। আর জানি—সুখ তার কপালে আছে।'—

সেই সুখের শুধু ইঙ্গিতময় রঙিন ছায়া একটু মাত্র দেখেছে দীন দাস আজ মেয়ের মুখে। ভালো লেগেছে বড়। চন্দ্র ওস্তাদের বেহালাটা কাঁধে করে একটি বিব্রত, লজ্জিত, সুখী মুখ দেখেছে আজ দীন দাস।

৪

আসর যখন ভাঙলো তখন রাত অনেক।

ভাঙা আসরের এলোমেলো ভিড় ছোট ছোট দলে ভেঙে ভেঙে চললো এবার ঘরমুখো। অন্ধকার রাত। শুধু বৈশাখী আকাশে অসংখ্য তারা ঝলোমল করছে। মিন্‌মিনে আলো অন্ধকারে ভালো ক'রে লোক চেনা যায় না।

আসর থেকে একটু তফাতে গিয়ে ভিড় এড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল তুলসী। ওস্তাদের বেহালার ঝোলাটা তেমনি ঝুলছে তার কাঁধে। পড়শী মেয়েরা চলে গেল দল বেঁধে বেঁধে। ডাকলো :

'দাঁড়িয়ে রইলি যে! যাবি না?'

মিছে কথা বললো তুলসী, 'অস্তাদকে বেহালাটা দেব বলে দাঁড়িয়ে আছি। গছিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।—তা দেখ দিকিন, অস্তাদেরই দেখা নাই।—'

'বুঝেছি লো—মোরা তবে পালাই। থাক একলা।—'

হাসতে হাসতে চলে গেছে মেয়েরা দু-একটা ঠাট্টা মস্করা ক'রে। তাকিয়েছে পুরুষের দল। লজ্জা পেয়ে তুলসী আরও একটু তফাতে

গিয়ে দাঁড়ালো। চোখ মেলে রইল ভিড়ের দিকে। ওস্তাদের দেখা নেই। কানে এসে লাগে ভীড়ের এলোমেলো কথা।

'মাধব দাস গায় ভালো।'

'কিন্তু অস্তাদের বেহালায় শালার রাগ হয়ে গেল। ব্যাটা গিধ্‌ধড়।'

'হাঁ, হাত বটে মোদের অস্তাদের। যেন কথা বলে গো।'

—আহা, কথা বলে—কথা বলে, বোবা লোকটা কথা বলে হাতে!…

কান খাড়া করে শোনে তুলসী। এলোমেলো গলা, এলেমেলো কথা :

'কিন্তু গাঙের ভাঙন কি থামবে বল এবার?'

'গাঙ!'—

গাঙ।—আশ্চর্য।—তারপর সব কথা যেন জমাট বেঁধে যায় অন্ধকারে। ভিড়টা মিলিয়ে যায় কোথায়। দূর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে আসে সর্বনাশা কলোচ্ছ্বাস। আর কিছু শোনা যায় না।

ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। আসরের মশালের লালচে আলো কিছুটা ছিটকে এসে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। ফাঁকা হয়ে গেছে আসর। কয়েকজন মাত্র আছে আর। তারা সারা রাত জেগে বসে থাকবে ওখানে। কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগছে সবটা এখন। তুলসী একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই দিকে। আসছে—ওস্তাদ আসছে এবার। এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ কেমন অস্বস্তি লাগে তার। কারণ, সে আসছে। সে থমকে দাঁড়ালো। কে যেন ডেকেছে আবার পেছনে।

ওস্তাদ ঘুরে তাকালো। সখী ডাকছে। আজ টিপির তলায় বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় দেখা সেই ঝকমকে মুখটা যার হেসে উঠেছিল ধারালো কাস্তের ধারের মতো। গাঙের কলোচ্ছ্বাসকে চাপা দিয়ে

হঠাৎ উছলে ওঠা হাসি যার পরিত্যক্ত ফাটল ধরা চরটাকে চমকে দিয়েছিল সহসা :

'হায় গো অস্তাদ—তুমি!'—

খুব খানিকটা হেসে বলেছিল শেষকালে, 'মোর সোয়ামীর জমিটুকুন দেখতে এসেছিলান—সে তো খুঁজেই পাই না গো অস্তাদ। জলে ডুবে খুঁজবো? কি জানি, হাসি পাচ্ছে মোর অস্তাদ, এত পূজা ঢোল বাদ্যি!'—

সেই সখী। ওস্তাদের মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো তেমনি হাওয়ায় চাবুক মেরে। বললো, 'মোকে একটু আগিয়ে দিতে হবে অস্তাদ—ওদিকে যাওয়ার লোক নাই কেউ। বড় অন্ধকার রাত। চলো।'—

পুবের এমব্যাংকমেন্ট বাঁধ দিয়ে ঘুরে চলে গেল সখী ওস্তাদকে নিয়ে। হাসতে হাসতে বললো, 'যুবতী মেয়ামানুষ, তায় আবার বিধবা—রাত বিরাতে একা একা যাওয়া ভাল নয়।'

একাই কথা বলে সখী। সঙ্গী তার একটা বোবা মানুষ।

কিছুটা গিয়ে সখী বললো আবার, 'মানুষকে মোর ডর নাই—তার সব কথা বুঝি সে যেমনই হোক। ডর বড় মোর ভূতকে অস্তাদ!'

ওস্তাদ হাসছে মৃদু মৃদু।

সখী হেসে বললো, 'আর মোর ডর তোমাকে অস্তাদ। তুমি কথা বলতে পারো না—শুধু চেয়ে থাক মোর দিকে। বুঝতে পারি না তোমাকে আমি। সবাই বলে—হাত তোমার না-কি কথা বলে। কি কথা বলে? কি কথা বলে অস্তাদ—মোর বুকের মধ্যে কি যেন কুরে কুরে খায়!'

ওস্তাদ তাকালো সখীর মুখের দিকে : অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবু কানে এসে লাগে শেষ দিকে হঠাৎ একটা বিষণ্ণ স্বর—

এ যেন সেই মেয়েই নয় যে কথায় কথায় হেসে ওঠে হাওয়া আর এ চরের মানুষগুলোকে চম্‌কে দিয়ে।

সখী বলে যায় বিনিয়ে বিনিয়ে, 'কি জানি, কত কথা যেন মনে পড়ে যায় অস্তাদ তোমার বেহালা শুনে—সে সব কতদিনের কথা যেন ভুলে গেছি।···মোর সোয়ামীর ঘর সংসার, বাপের ঘর, জমি গোরু!—মোর কাঁদতে ইচ্ছে করে অস্তাদ। শুধু মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্‌ খচ্‌ করে—কেউ নাই মোর এ জগতে, কিছু থাকবেওনি।—তবু, কি না ছিল অস্তাদ মোর বল?'

কিছুক্ষণ চুপ করে পথ হাঁটে সে। আবার বলে, আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'চাষীর বৌ আমি—সব তো ছিল মোর। আজ কিছু নাই। মোর কান্না পায় অস্তাদ। আজ আসরে তুমি শুধু মোর দিকে চেয়ে চেয়ে বাজালে, মোকেই যেন কি বললে। কি বললে? কাঁদতে বললে? মাথা কুটে কুটে কাঁদবো আমি সারাজীবন? কেন—কেন?'

একটা উত্তাপ যেন ছিটকে বেরুচ্ছে সখীর চাপা চাপা উত্তেজিত গলা থেকে।

বুকের ভেতরে তোলপাড় করে ওঠে ওস্তাদের। হঠাৎ চলতে চলতে থম্‌কে দাঁড়ায় সে। একটা হাত চেপে ধরে সখীর।

সখী আস্তে আস্তে হাতটা টেনে নিয়ে বললো, 'ওই দেখ—তোমাকে মোর ডর লাগে। চলো'—বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো সে আবার। চম্‌কে দিল অন্ধকারকে। বললো, 'তুমি বাজিওনি আর ওরকম—মোর ভাল লাগে না।'

সখীর হাসির শব্দ শুনে সামনে থেকে কে যেন হাঁক পাড়লো:

'কে আসে গো?'

'লাও অস্তাদ—নিন্দে করুক এখন লোকে।' চাপা চাপা গলায় বললো সখী। তারপর গলা ছেড়ে ডাকলো, 'কে—কাত্তিক নাকি!'

'হাঁ।'

কাত্তিক দাঁড়িয়েছে। ছোকরা চাষী। বছর কুড়ি একুশ বয়স হবে বড় জোর। তবু ছোটই হবে সখীর চেয়ে।

কাত্তিক বললো, 'মোকে তখন ভাগিয়ে দিলে যে! বললে—দেরি হবে!' কথায় ওর ক্ষোভ ফেটে পড়ে।

সখী খিল খিল করে হেসে বললো, 'আ মাগো! তারপর এই যে ছুটতে ছুটতে এসে ধরলম তোমাকে।' ওস্তাদের দিকে ফিরে বললো, 'এবার যাও তুমি অস্তাদ—ঘরের কাছের লোক পেয়ে গেছি। ছোটো তাড়াতাড়ি—দেখ গা, তুলসী দাঁড়িয়ে আছে তোমার জন্যে।'

তারপর ঘুরে চলে গেল সখী কাত্তিকের সঙ্গে। ওস্তাদ দাঁড়িয়ে রইলো থমকে, দাঁড়িয়ে রইলো ঠায় অনেকক্ষণ। ওরা অন্ধকারে হারিয়ে গেল আস্তে আস্তে। অন্ধকারকে মুখর করে তুলেছে গাঙের কলোচ্ছ্বাস। জোয়ার এলো বোধ করি। তবু তাকে চাপা দিয়ে দিয়ে, অন্ধকারকে ভেঙে ভেঙে দূর থেকে চমকে উঠতে লাগলো সখীর ধারালো গলার উছলানো হাসি। কাত্তিকের কোন্ কথায় যে হেসে হেসে উঠছে মেয়েটা কে জানে! খারাপ লাগে ওস্তাদের—ভয়ানক বিশ্রী লাগছে। এগোতে ইচ্ছে করছে—তবু যেতে পারছে না।

তারপর কাত্তিকের হেঁড়ে গলা শোনা গেল দূর থেকে। গান ধরে দিয়েছে :

হা লো মোর সোনামণি
মোকে কেন দাগা দিলু।...

ওস্তাদ অন্যমনে এগোতে লাগলো আসরের দিকে। অসহ্য মনে হচ্ছে। ওদিকে আসর ফাঁকা হয়ে গেছে একেবারে। হয়তো কয়েকটা লোক আছে—দেখা যাচ্ছে না দূর থেকে তাদের। সব মশালই

প্রায় নিভে গেছে। দু-একটা মাত্র জ্বলছে তখনও। দূর থেকে অদ্ভুত লাগছে সবটা—শ্মশানে চিতা জ্বলছে যেন—লাল আগুন পিণ্ড একটা রাঙিয়ে দিয়েছে কিছুটা অন্ধকার। তারপর সে অন্ধকার সমুদ্রের আর শেষ নেই—সীমা নেই। দুরন্ত ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাসে সবটা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। আরণ্যক। এর মাঝখানে তুলসী বলে কোনো একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঁধে বেহালা ঝুলিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে—এ কথা যেন মনেই পড়ে না ওস্তাদের। ঠাণ্ডা ভেজা ভেজা দম্‌কা হাওয়ায় তখনও কানে ছিটকে ছিটকে আসছে শুধু সখীর সেই চাবুক মারা হাসি।

ওস্তাদ অন্যমনে এসে দাঁড়ালো ভাঙা আসরের পাশে।

যে ক'জন আসরের এক কোণে বসে জটলা করছিল তখনো, তারা হাল্লা করে উঠলো :

'বাস—অস্তাদও এসে গেছে মোদের।'

কয়েকজন তুড়ি মেরে উঠে দাঁড়ালো।

'হেই চাবাস্। মোদের সঙ্গে সারারাত আজ জাগতে হবে তুনাকে অস্তাদ। কোনো কথা শুনবোনি।'

'বেহালা বাজাবে তুমি।'—

'আর মদনা লাচবে। হেইও মদ্‌না—উঠ্ শালা।'—

মদনার ঝিমোনি আসছিল, ওদের মধ্যে মোটা-সোটা হাবা-গোবা মানুষ সে—চমকে তাকালো।

সব ক'জনাই ছোকরা, চরের চাষী। বসেছে গোল হয়ে। মশালগুলো নিভিয়ে দিয়েছে সব। পূজা-মণ্ডপে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে শুধু হাঁড়ির ভেতরে। মঙ্গল প্রদীপ। মিনমিনে সেই আলোয় চেনা যায় না সকলের মুখ। উৎসাহে কলরব ক'রে ওঠে সবাই।

সোনা ওস্তাদের হাতে বেহালা তুলে দিয়ে বললো, 'তুলসী তোমার বেহালা রেখে গেছে অস্তাদ।'

বেহালাটা হাতে নিয়ে ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে একটু ওস্তাদের: বেহালাটা সে নিয়ে গেলেই পারতো। কিন্তু এই বেহালাটা রেখে যাওয়ার মধ্যে রেখে গেছে সে তার মনের রাগটুকু। মনে পড়ে যায় আবার সখীর কথা। মুখের ভঙ্গী বদলে যাচ্ছে ওস্তাদের আস্তে আস্তে।

সোনা সেটুকু লক্ষ্য করে হেসে বললো, 'তুলসী দাঁড়িয়েছিল অনেক্ষণ তুমার জন্নে।'

এ হাসির রহস্য হয় তো বুঝলো না ওস্তাদ—বেহালাটা নিয়ে বসে পড়লো ওদের মাঝখানে।

সোনা তেমনি হেসে হেসে বললো, 'এবার বিয়ে-সাদি কর অস্তাদ। চরে লোক বাড়ুক। ঘর বাড়ুক।'

'হাঁ অস্তাদ।' আর একজন সোৎসাহে বলে উঠলো, 'তোমার ঘর তুলে দোবো মোরা।' ব'লে সে তাকালো সকলের দিকে, 'কি হে, বল তোমরা।'—

ভুষণা বললে, 'অস্তাদের মায়ের ভিটা তো পড়েই আছে মোদের পছিম চরে! সেখানে ঘর তুলে দেবো মোরা সবাই মিলে। কদিন লাগবে একটা ঘর!'

'হাঁ, সব তোমার সাজিয়ে গুছিয়ে দেবো মোরা অস্তাদ। বিয়ে সাদি কর এবার তুমি।'

পশ্চিম চরের ছোকরা ভুষণা বললো, 'তুমি মোদের পছিম চরের লোক—চলো পছিমে।'

ওস্তাদ শুধু হাসছে মৃদু মৃদু।

সোনা হাই তুলে বললো, 'দীন দাস বৈরাগী বলছিল তখন তোমার বিয়ে-সাদির কথা। মদনাও শুনেছে। হেইও মদনা!'—

মদনা ঢুলছিল—চমকে উঠে তাকালো ফ্যাল ফ্যাল করে।

'বল্লেনি দীন দাস বৈরাগী ?'

'বলেছিল তো।' মদনা বললো গোবেচারীর মতো।

'শোনো অস্তাদ।'

ওস্তাদের হাসিমুখটা এবার গম্ভীর হয়ে যায় আস্তে আস্তে। বাকী সবাই ব্যাপারটাকে উপভোগ করে হাসি মুখে। গাঁয়ের চেনাশোনা ছেলেমেয়ে—এমন বিয়েতে রস একটু ওরা পাবেই।

মোনা হেসে বললো, 'এবার প্রাণ খুলে একটু বাজাও অস্তাদ—যেন চোখের ঘুম চলে যায়। জেগে থাকতে হবে সারা রাত। যে জায়গা! শালা ঘুমিয়ে পড়লে কখন কাকে টেনে নিয়ে যাবে কুমীরে তার ঠিক নাই।'

'মদনা হুঁসিয়ার! ধড্ড ঘুম তোর।'

মদনা হাই তুলে বললো, 'ভোর হতে কত বাকী বল দিকিন ?'

সবাই হাসে হো-হো ক'রে। রাত দুপুরের অন্ধকার চমকে ওঠে হঠাৎ সে হাল্লায়। তারপর ওস্তাদ বেহালায় ছড় টানতে সুরু করে আস্তে আস্তে। ধীরে ধীরে একটা হিন্দোল যেন নাচতে সুরু করে দেয় দুপুর রাতের অন্ধকার দম্‌কা হাওয়ায়। তালে তালে হাত-তালি দিতে থাকে সব ক'জনা। মাঝে মাঝে হাল্লা। একটা বলিষ্ঠ উল্লাস থেকে থেকে ফেটে পড়ে আচম্‌কা :

'হো-হো—'

মদনা ঝিমোতে ঝিমোতে মাথা ঝিঁকোচ্ছে।

'হেই মদনা—লাচ্‌ শালা, ওঠ। উঠ বে।—'

ক'জন তাকে ঠেলে তুলে দিলো।

'লাচ শালা।—'

হাই তুলে মদনা এবার কোমর বেঁকিয়ে নাচতে সুরু করে নাচার হয়ে।

আবার একটা হাল্লা ফেটে পড়ে :

'চাবাইস—চাবাইস্ মদ্না !'—

একটি ছোকরা চাষী লাফ দিয়ে উঠে ওস্তাদকে জাপটে শূন্যে তুলে ধরে নাচতে শুরু ক'রে দেয় ধেই ধেই ক'রে। হাত তালি দিয়ে সোৎসাহে ফেটে পড়ে সবাই আবার :

'হো-হো'—

এই গভীর অন্ধকারে ভাঙন ধরা নদীচরের জনহীন ভয়াবহতা ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে।

এক সময়ে বেহালা থামলো ওস্তাদের—হাল্লাও থামলো। মদ্না নাচ থামিয়ে ধপাস্ ক'রে শুয়ে পড়লো মাটিতে। কে একজন গাল পাড়লো :

'আজ তোকে টানবে শালা কুমীরে।'

মদনার আর কোনো সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পরেই তার নাক ডাকতে স্থরু করে দেয়।

ওস্তাদ বেহালাটা ঝোলার ভেতরে পুরলো। ওদের জটলা ছেড়ে এগোল নদীতীরের দিকে। পেছন থেকে ভুষণা ডেকে বললো :

'যেয়োনি অস্তাদ ওদিকে। সাঁঝ পহর থেকে আজ ঠাকুরের কুমীর ঘোরাঘুরি করছে। ফি বছর তো যায় এমন দিনে একটা ক'রে !'—

উৎসবের ভীড়ে মেয়েরা, ছেলেপুলেরা ছিটকে পড়ে নদীর ধারের দিকে। ল্যাজের ঝটকায় এক-আধটাকে টেনে নিয়ে যায় কুমীরে স্থযোগ মতো। এ অঘটন ঘটে প্রায় ফি বছরই উৎসবের দিনে। চরের মানুষ একে বলে দেবতার বলি। কুমীর হলো মা গঙ্গার সাক্ষাৎ বাহন। জলে ডোবা সেই বলির দিকে চেয়ে চেয়ে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের রোল তোলে ওরা আর গড় করে মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে :

'হেই মা'…

ওস্তাদ হয়তো শুনতে পেল না সে কুমীরের কথা। এগিয়ে গেল নদী-তীরের দিকে। সরকারী বাঁধ পেরিয়ে গিয়ে উঠলো সেই টিপির ওপরে, জলের কিনারে।

ভাটার সময়। খাড়ি পাড়ের তলা থেকে জল সরে গেছে বেশ কিছুটা দূরে। দূর থেকে ভেসে আসছে জলের হালকা আওয়াজ। আর মাথার ওপরে অন্ধকার বুনো রাত্রির অগণিত নক্ষত্র। মুখের ওপরে ঝাপটা মারছে জলে ভেজা বৈশাখী রাতের দমকা হাওয়া। ভালো লাগছে ওস্তাদের—ভালো লাগছে বড়। এই নিরালায় মনে পড়ে যায় সখীকে—তার কথা, তার উচ্ছ্বলিত হাসির জীবন্ত তীক্ষ্ণতা। সাধ হয় মনে, ঠিক এই সময়ে—এইখানে সে এসে যদি দাঁড়াতো!—এই রকম সীমাহীন অন্ধকারের মাঝখানে ফের গা ঘেঁষে বলতো :

'তোমাকে মোর ডর লাগে অস্তাদ।'

এ কি তার ভয় লাগার কথা?—

মনে মনে শুধোয় বোবা লোকটা। উত্তর পায় না—তবু কেমন একটা হিয়ের সুখে মন যেন ভরে যায়। হঠাৎ বড় ভালো লাগে তার জীবনকে, এই ভয়াবহ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত ভাঙন-ধরা দরিদ্র চরটাকে। প্রলয়ংকরী প্রকৃতির মুখোমুখী বসে তার সমস্ত সত্ত্বায় সে আজ অনুভব করে তার দ্বিতীয় জন্মকে, জীবনকে, বাঁচার তাগিদকে। সে হলো এ বোবা লোকটার হিয়ের ভালো লাগা, তার ভালোবাসা।

প্রহর গড়িয়ে রাত শেষ হয়ে আসছে। দূর থেকে ভেসে আসে শেষ প্রহরের শেয়ালের ডাক। ফিকে রং লাগছে পূবের আকাশে—ভাগীরথীর ওপারের বন[illegible]। শুকতারা উঠেছে। অন্ধকারের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে পা[illegible] ঝিরঝিরে আলো। সামনে এবার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সরকারী বাঁধের এপারে পরিত্যক্ত সহস্র ফাটল ধরা চরটা—

জীর্ণ সর্পিল বাঁধ, ওপারে পুবচর—ঘুপ্‌টি মারা টঙ—কৃষকদের কুটির। হা-হা করছে ফসল ওঠা মাঠ। যেখানে উৎসবের আসর বসেছিল সেখানটায় নীরব নির্জন। যেন কোনো কিছুই হয়নি। এই এর চিরকেলে রূপ—নিঃস্ব উৎসবহীন। জীবনের মলিন এক আলো-অন্ধকারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শুধু বয়ে চলেছে দিগন্তব্যাপী পাণ্ডুর জলধারা। মাঝে মাঝে বহু দূরের হঠাৎ এক একটা জলোচ্ছ্বাস সমস্ত পরিবেশটাকে, সমস্ত জীবনকে যেন কোনো এক দুর্জ্ঞেয় শংকার গভীরতায় পাথর করে দিয়েছে। আশা নেই, আশ্বাস নেই। এ যেন পরিবর্তন করা যায় না, এ যেন পরিবর্তন হওয়ার নয়। একটা ফাটল ধরা পরিত্যক্ত চর ধু-ধু করবে এমনি চিরকাল—মাঝে মাঝে পড়ো ঘরের ঢিপিগুলো বুক চিতিয়ে পড়ে থাকবে সমাধির মতো, মাঝে মাঝে খাপছাড়া ভাবে এক একটা নারকোল গাছ সর্বাঙ্গে অন্ধকার জড়িয়ে দোল খাবে অমনি নিঃশব্দে। ছোট বেলা থেকে এ চরে এই দেখে আসছে ওস্তাদ। মনে পড়ে বহু দিনের পুরানো একটা চর—তার বহু মানুষের মুখ। কোথায় গেল তারা? চরটা আস্তে আস্তে চলে গেছে জলের তলায়—মানুষগুলো ছিটকে গেছে কোথায়!—শৈশবের চেনা অনেকগুলো মুখ—অনেকগুলি লোক! সেই মানুষগুলির সঙ্গে আজকের মানুষগুলিও মিশে একাকার হয়ে যায়—হারিয়ে যায় কোথায় যেন। অব্যক্ত একটা বেদনার মাঝখানে ওস্তাদের মনে রূপ নেয় আর একটা জগত—আর একটা কাল। একটা নিরবশেষ জলোচ্ছ্বাসের তলায় কোথায় তলিয়ে যায় বাকী চরটুকুন—বাকী মানুষের জীবনগুলি। সেদিনও, আকাশের তারাগুলি আজকের মতোই চেয়ে থাকিবে হয়তো ভাগীরথীর অতল জলরাশির দিকে। ঢিপিটার যেখানে সে বসে আছে সেইখান দিয়ে দাঁড় বেয়ে যাবে হয়তো কোনো ধেনো মহাজনী নৌকো অন্ধকারে ছপ ছপ করে। কেউ মনে করবে না সেদিন জলের তলায় ডোবা চরটার কথা। সেদিন

২৭৭

কোনো নতুন গ্রামের পারে তারা গিয়ে ফের নোঙর করবে হৈ-হাল্লা করে :

'ধান বেঁচবে নাকি গো !'

এই জীবন !—

ভালো লাগে না ওস্তাদের। সবটাকে সে রূপ দিতে পারে না, কথা কয়ে উঠতে পারে না। পারে শুধু সে অস্বীকার করতে : এ তার ভালো লাগে না। একটা ভালো জীবন হয়তো আছে। যার রূপবর্ণহীন একটা আবেশে শুধু মন তার প্রশান্তিতে ভরে যায়, তার হিয়ের অস্পষ্ট ভালোবাসার মতো। এর বেশী সে কিছু জানে না।

'অস্তাদ !'—

ডাক শুনে চম্‌কে ফিরে তাকালো ওস্তাদ। সখী !—সখী এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

সখী বললো, 'আমি ঠিক এইটি ভেবেছিলাম অস্তাদ। তুমি আজ ঘরে যাবেনি।' তারপর হাসলো সে নিঃশব্দে। হাসিতে তার নেই সেই উচ্ছ্বসিত শান। বললো, 'তোমাকে তখন অমন করে মাঝপথ থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে মোর আর ঘুম ধরলোনি ওস্তাদ ঘরে যেয়ে। ছটফট করেছি শুধু—তুমি কি-না-কি ভাবলে।'—

হাত বাড়ালো ওস্তাদ—হাত চেপে ধরলো সখীর। আবেগে।

সখী বললো, 'তারপর বেহালা বাজলো তোমার। উঠে বসলাম। ঘুম ধরলোনি আর।—ভাবলম বসে বসে, কতক্ষণে যাব !'

ওস্তাদ এবার হাত ধরে টানলো।

সখী বললো, 'ভোর যে হয়ে এলো অস্তাদ !' বলে সলজ্জ মুখে চেয়ে রইলো ওস্তাদের দিকে। তারপর চম্‌কে উঠে বললো, 'হোই ত্মাখো অস্তাদ—কত বড় কুমীর !'—

শুধু একটা নয়—দুটো। গুঁড়ি মেরে মেরে চলেছে আসরের দিকে। সেখানে ঝিমোতে ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। দমকা হাওয়ায় পরণের কাপড় কার যেন উড়ে উড়ে পড়ছে। কুমীর দুটো চলেছে সেইটে লক্ষ্য করে। থমকে দাঁড়াচ্ছে মাঝে মাঝে।

সখীর হাত ছেড়ে দিয়ে ওস্তাদ ছুটলো পূজা মণ্ডপের দিকে।

মদ্‌নার মতো সবাই প্রায় লুটোচ্ছে মাটিতে। জনা দুই শুধু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঝিমোচ্ছে বসে বসে। ভোর তখনও হয়নি ভালো ক'রে।

কুমীর দুটো থমকে গেছে।

ঘুমন্ত মানুষগুলোর বিভোর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বেহালায় ছড় টানলো ওস্তাদ হাসতে হাসতে। আস্তে আস্তে চোখ খোলে সবাই—আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে জেগে বসলো একে একে। ওস্তাদ বেহালা থামিয়ে ছড়ি তুলে দেখিয়ে দিল কুমীর দুটোকে।

কুমীর দুটো তখনও ঘুপ্‌টি মেরে থমকে আছে মাঠে।

সভয়ে চেয়ে রইলো সবাই সেইদিকে।

মদনা হাত জোড় করে প্রণাম করলো—বিড় বিড় করে কি বললো যেন, বোঝা গেল না। শুধু শোনা গেল, 'হেই মা!'—

ওদের ভয় খাওয়া মুখের দিকে চেয়ে হাসলো ওস্তাদ। ছড়িটা ঘষলো ফের বেহালায়। হঠাৎ বেয়াড়া ভাবে বেহালাটা খাদে ঘাঁউ ঘাঁউ করে উঠলো। কুমীর দুটো কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবার হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত শব্দে। ওস্তাদ হাসতে হাসতে বেহালায় ছড়ি ঘষলো আবার। ভোরের আকাশে ডাক ছেড়ে কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো। কুমীর দুটো এবার অত্যন্ত দ্রুত চরের ফাটল-ধরা গভীর খাতে ঝপাং করে লাফ দিয়ে পড়লো।

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওস্তাদের দিকে।

কুমীর দুটো যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে মদনা হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো আর একবার। বিড়-বিড় করে আবার বললো :

'হেই মা !'—

তারপর ঝপ্ করে ওস্তাদের পা চেপে ধরে বললো, 'তোমাকেও গড় করি অস্তাদ। বাঁচিয়ে দিলে মোদের আজ। ঠাকুরের কুমীর পর্যন্ত ভয় পায় তুমাকে অস্তাদ! তুমি সামান্য লোক নয়। এ আমি বলে দিলম। দেবতার ভর আছে তোমার ওপরে।'

ভুষণা অবাক হয়ে বললো, 'তোমার বেহালা শুনে ঠাকুরের কুমীর পর্যন্ত ভয়ে পালালো অস্তাদ !'

য়োনা বললো, 'মদনা ঠিক বলেছে—ঠাকুরের ভর আছে তোমার ওপরে অস্তাদ।'

'আলবৎ আছে—একশ'বার আছে। স্বচক্ষে দেখলম।' মদনা ওস্তাদের পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল, 'গড় তোমাকে।'—

সামান্য লোক নয় ওস্তাদ। কুমীর তাড়ানোর ব্যাপারটা মদনার কাছ থেকে নানা মুখে সারা চরে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো একটা বেলার মধ্যেই। যে-কুমীরের ল্যাজের ঝটকায় চরের গোরু বাছুর থেকে সুরু ক'রে কাচ্চা-বাচ্চা বৌ-ঝি অনেকগুলি প্রাণ হারিয়েছে, মায় জোয়ান চাষী পর্যন্ত,—দেবতার সেই সাক্ষাৎ বাহন কি-না পালালো ভয় পেয়ে !

'পালালো ?' বুড়োরা ভুরু কুঁচকে কিন্তু জিজ্ঞেস করলে দ্বিতীয়বার। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না তারা।

'পালাবে না !'—মদনা বললো, 'ল্যাজ তুলে পালালো—যেই অস্তাদের বেহালাটা বেজে উঠলো। মোনাকে জিজ্ঞেস করো, আরও পাঁচজন ছিল—জিজ্ঞেস করো। মোদের বাঁচিয়ে দিল অস্তাদ।

নাহলে ফি বছরের মতো এবারেও একটি বলি যেতো কাল। এ-আমি বলে দিলম।'

'হবে। দেবতা কার সহায় হয় কখন—কে বলতে পারে!' চরের জ্ঞানবৃদ্ধ ভৈরব দাস দাড়ি নেড়ে নেড়ে ছড়া কেটে বলেছিল, 'দেবতা সহায় যার—শিলা জলে ভাসে তার।'

বুড়োরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেয় ভয়ে ভয়ে, 'হবে,—নাহলে মুখি রাঁড়ীর ব্যাটার অতো নাম-ডাক হবেই বা কেন! হবে!—দেবতা সহায় হলে সবই হয়।'

'ঠিক কথা। না হলে মুখি রাঁড়ীর ব্যাটাকে মানী লোকেরা খাতিরই বা অত করবে কেন বল! আর বেহালা শুনে কেঁদেই বা উঠে সব কেন বল! ঠিক কথা।'—

'দেব-দেবতার ভাবের কথা—কোথায় কি হয়, কে জানে!'

'হেই মা! অপরাধ নিও না!' বুড়োদের ভেতরে কেউ কেউ গড় করে মনে মনে অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশ্যে, 'যা করেছি—অজ্ঞানে।'

সকলের কথার তোড়ের সামনে মুখ বুজে রইলো শুধু হরি মণ্ডল। চোখ পিট পিট করে শুনে গেল শুধু।

চরের একঘেয়ে জীবনে কদিনের তোলপাড় ওঠে একটা ওস্তাদকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য দেবতার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আবিষ্কার ক'রে চরের লোকগুলো যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এর মধ্যে ছিল না শুধু ওস্তাদের সাঙাৎ পুবচরের বাঁশীওয়ালা নফর মণ্ডল—কদিন কোথায় ঘুরছিল যাত্রার দলের সঙ্গে। সে চরে ফিরে এলো যখন—ওস্তাদ তখন চরের একটা বিশিষ্ট মানুষ—রাজা।

নফরের ফিরে আসার খবর শুনে দেখা করতে এসেছিল ওস্তাদ নিজেই। নফর ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো তাকে, 'চরের রাজা

মোর সাঙাৎ। এত দিনে মনের আশা মিটলো হে। এস এস ভাই—বসো, বসে আজ প্রাণ খুলে সঙ্গত করি।'

ওস্তাদকে ধরে বসালো দাওয়ায় নফর।

নিঃশব্দে হাসছে ওস্তাদ। দাওয়ায় বসে কিন্তু চোখ গিয়ে পড়ছে তার বারে বারে আর একটা কুঁড়ের দিকে—নফরের ঘর থেকে কিছুটা দূরে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নফর হেসে বললো, 'আসবে সাঙাৎ—আসবে। বেহালাটা ধরে দাও একবার।'

দুই সাঙাৎ চোখে চোখে চেয়ে হেসে উঠলো। নফর বেহালাটা ওস্তাদের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'লাও—ধরে দাও জোরসে একখানা।'

ওস্তাদ হাসতে হাসতে ঝোলা থেকে বেহালাটা বের ক'রে কাঁধে তুলে ছড় টানলো আস্তে আস্তে। গুন্‌গুনিয়ে উঠলো বেহালাটা।

নফর মুখ টিপে হেসে বললে চাপা গলায়, 'ওই দ্যাখ সাঙাৎ।'

দূরের কুঁড়ে থেকে সখীর মুখটা উঁকি মেরে সরে গেল পলকের মধ্যে।

নফর বললো, 'দেখলে? মেয়েটাকে তুমি যাদু ক'রে ফেলেছ সাঙাৎ। এ চরের আর সকলের আগে। ওই তোমাকে রাজা করেছে সাঙাৎ সবার আগে।'

ওস্তাদ টিপি টিপি হেসে বেহালায় ছড়ি বুলোতে লাগলো আস্তে আস্তে।

নফর বললো, 'তোমার বেহালা শুনতে শুনতে কতোদিন যে ওর চোখে জল দেখেছি সাঙাৎ। একদিন বলে ফেলেছিলাম—এ চরে তোর কপালে সুখ নাই সখী—ঘর-সংসার সুখ-শান্তি চাস তো পালা অন্ত কোথাও।'—

ওস্তাদ বেহালায় ছড়ি ঘষা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো।

নফর বললো, 'এতদিন সে-সব কথা বলিনি তোমাকে।'

আজ বলে নফর। ওস্তাদ কান খাড়া করে শোনে।

নফরের কথা শুনে সখী নাকি খলখলিয়ে হেসে বলেছিল; 'পালাবো? কার সঙ্গে গো! তোমার সঙ্গে?'

'মোর সঙ্গে কেন?' নফর বলেছিল, 'চরে কি ভালো লোক নাই।'

'আছে বুঝিন!' সখী বলেছিল হেসে কুটিকুটি হয়ে, 'কে সে মরদ গো?'

'কেন, মোর সাঙাৎ। পালা এ চর থেকে। বাঁচবি—সুখে ঘর-সংসার করবি।'

নফর বললো, 'মোর কথা শোনার পরে মুখফোঁড় মেয়েটা হাসলো বটে ফের খলবলিয়ে, কিন্তু দেখতে দেখতে মুখ চোখ তার কেমন হয়ে গেল সাঙাৎ। তারপর থেকে তো দেখছি ওর ভাব-সাব।'—

দু'বন্ধু চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নফর বললো, 'ওকে নিয়ে কোথাও তুমি চলে যাও সাঙাৎ। এ চরে তো ঘর-সংসার করতে পারবেনি তোমরা হরি মণ্ডলের দাপটে। তাই বলি, পালাও বরং।'

দূরের সেই কুড়েটার দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো ওস্তাদ।

নফর বললো, 'এখন একটু বেহালা বাজাও সাঙাৎ। বাঁশীটা আনি আমি থাম। মনের সুখে আজ সঙ্গত করি রাত ভোর।'

তারপর সুরু হয় ওদের সঙ্গত—বেহালা আর কনসার্ট বাঁশী। গোধূলির মরা আলো ধীরে ধীরে অন্ধকার হ'য়ে আসছে। এ-দিকটা পুবচরের একপ্রান্তে। খরস্রোতা ভাগীরথীর একটা ধারা কুমীরের সবল ল্যাজের মতো ঝটকা মেরে চলে গেছে নফরের ঘরের সামনে দিয়ে। তার দু'পারের অন্ধকার চমকে ওঠে হঠাৎ বাঁশী আর বেহালার ঐকতানে।

দেখতে দেখতে সখী এসে বসে নফরের কচি ছেলে একটাকে কোলে নিয়ে—হাঁটু নেড়ে নেড়ে ঘুম পাড়ায় যেন তাকে।

সঙ্গতের শেষে নফর মুখ টিপে একটু হেসে বললো, 'মোর সাঙাতের বেহালা কেমন লাগলো সখী।'—

'মোরা কি বুঝবো নফরদা।' সখী নফরের বৌয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, 'দু-দণ্ড এসে বসি—গপ্প করি। আর তোমার এই ডাকাত ছেলে! সামলাতেই প্রাণ যায়। শুনবো কি বল।'—

'তবে মোদের আসরের কাছে এসে আর বসোনি—বলে দিলম।' নফর রাগ দেখিয়ে বললো, 'আজে বাজে লোককে মোর স্যাঁঙাতের ধারে কাছেও বসতে দিই না। বেহালার রাজা মোর স্যাঙাৎ!'

'মা গো মা! ভালো বাজায় বাপু যাও—মোদের ফাটা চরের রাজা।'—মুখফোঁড় মেয়েটাও রাঙা হয় লজ্জায়।

দুই সাঙাতের সঙ্গত চলে অনেক রাত পর্যন্ত। একে একে পুবচর আর পশ্চিম চরের ছোকরারাও এসে জমে যায় ওদের আড্ডায়। হাততালি পড়ে তালে তালে—হর্‌রা ওঠে হাবা এ চরের নির্জন প্রান্তে। সখী বসে আছে নফরের ঘুমন্ত ছেলেটাকে কোলে করে। নেই শুধু নফরের বউ। শেষ তক্ ভালো লাগে না তার সখীর হাব-ভাব আর নফরের ঢলানো ঢলানো কথা।

তবু, সবটা মিলে সন্ধ্যেটা যেন বুক ভরে দেয় ওস্তাদের। এত আনন্দ—এত সুখ আছে এ চরের গভীরে কোথায়! তবু নফর ছেড়ে যেতে বলে তাকে এ চর।—

চরের ছোকরারা মাতামাতি সুরু করে দেয় ওস্তাদকে নিয়ে। এ চরের গৌরবকে যেন এতদিনে তারা আবিষ্কার করে ফেলেছে

একদিন নফর মণ্ডলের দাওয়ায় পঞ্চায়েৎ বসে গেল পুবচর আর পশ্চিম চরের ছোকরাদের।

ভুষণা বললো, 'মোরা কথা দিয়েছি অস্তাদকে—সবাই হাত লাগিয়ে অস্তাদের মায়ের ভিটায় নতুন ঘর তুলে দেবো।'

পুবচরের ছোকরা মোনা বললো, 'দাও তোমরা ঘর তুলে, মোরাও ডোবা কেটে দেবো একটা। আর ঘর তোলবার জন্যে যা লোকের দরকার হবে—মোরা খেটে দোব।'

এই মাতামাতির মাঝখানে বুড়ো দীন দাস বৈরাগী শুধু কেঁদে ফেলে কথায় কথায়—আনন্দে, সুখে। ওস্তাদের নতুন ঘরের কথা যখন গিয়ে তুললো পুবচর আর পশ্চিম চরের ছোকরারা মিলে—দীন দাস কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললো হা-হা করে :

'কর তোমরা—যা প্রাণ চায় করো। বড় কষ্টে মানুষ করেছিলাম ওকে মোর এই ভাঙা কুঁড়েয়, বড় দুঃখে। আজ যদি তোমরা ঘর-দোর করে দাও তার সবাই মিলে—এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে!'

মোনা বললো, 'ঘর দোর সব করে দিচ্ছি মোরা তোমার জামায়ের, তুমি এবার বিয়ে-সাদির কথা ভাবো বৈরাগী।'

বাপের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল তুলসী—শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ—বিয়ের কথা উঠতে পালালো ঘরের ভেতরে।

সবাই উপভোগ করে ব্যাপারটা—হেসে ওঠে।

ভুষণা বললো, 'পালালো তোমার মেয়া।'

'লাজ পেয়েছে—লাজ পেয়ে গেছে মেয়া মোর। ডাগর হলো যে।'

দীন দাস হাসতে গিয়ে চোখের জল মুছে বললো, 'তোমরা যখন লেগেছ—তোমরাই করে দাও যা করবার। আমি বুড়ো-হাবড়া বৈরাগী মানুষ!'—

ভুষণা বললো, 'ঘর তুলে ডোবা কেটে সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিচ্ছি মোরা এই মাসের মধ্যে। অস্তাদ কোথায়? তাকেও বলে যেতাম কথাটা।'

'এমন দিনে ঘরে পাবে কোথায় তাকে।' দীন দাস হেসে বললো, 'যাত্রার দলের সঙ্গে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষ্যাপার মতো। তোমরাই সব কর যা করবার।'

মুখি রাঁড়ীর পড়ো ভিটের জঙ্গল সাফ হতে থাকলো দিনে দিনে। ছোকরারা হাল্লা করে। তাদের হঠাৎ উচ্ছ্বসিত উৎসাহ যেন ওস্তাদকে রাজাই বানিয়ে ছাড়বে এ চরের।

সরকারী বাঁধের ওপর দিয়ে যেতে আসতে চোখে পড়ে সবটা ওস্তাদের--চেয়ে চেয়ে দেখে, তার মায়ের পড়ো ভিটে সাফ হয়ে এলো। তার জীবন থেকে—এ চরের মাটি থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে কবেকার এক কলংকের কাহিনীও। আগাছা জংগল সাফ করতে করতে পশ্চিম চরের ছোকরারা হাল্লা করে ওঠে ওস্তাদকে দেখে।

'অস্তাদ! এসো এসো—দেখে যাও।'

নতুন ফসল উঠেছে ঘরে এখন—যাত্রা-গানের মরশুম চলছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। ছোকরাদের সঙ্গে মেতে ওঠবার সময় নেই। তবু ভালো লাগে তার।—এতগুলো লোকের বুকের উষ্ণতা নিয়ে মন ভরে ওঠে তার। সেই ভরা মন নিয়ে যাত্রার দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সে কোথায় না কোথায়। যেদিন গ্রামে ফেরে—থম্‌কে দাঁড়ায় সে কখনও কখনও পরিষ্কার ভিটের সামনে: দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে তার হঠাৎ। এ তার মরে যাওয়া কলংকিনী মায়ের ভিটে!

পুবচর ও পশ্চিম চরের ছোকরারা মিলে কদিনেই আগাছা জংগল সাফ করে ঢিপির মাটি কেটে সমতল করে ফেলেছে। ঘর-বন্দের

দড়িও টানা হয়েছে পুব-পশ্চিমে লম্বা করে। এবার দেয়াল উঠবে মাটির।

এর মধ্যে ওস্তাদ একদিন ফিরে এলো চরে—সন্ধ্যের মুখোমুখী। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না কিছু—তবু ওস্তাদ সকৌতূহলে এসে দাঁড়ালো মায়ের ভিটের সামনে। এসে থমকে দাঁড়ালো আর একজনের পেছনে। সেও যেন অদম্য কৌতূহলে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে। ছোকরারা কাজ বন্ধ করে চলে গেছে অনেক আগে। পড়ো জায়গাটা নীরব নির্জন।

ওস্তাদের পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো যে—সে সখী।

ওস্তাদ অবাক হয়ে তাকালো সখীর দিকে—চোখে মুখে তার কেমন ধরা পড়ে যাওয়া ভাব। কিন্তু সে শুধু যেন দু'দণ্ডের জন্তে। তারপরেই মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, 'লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার ঘর দেখতে এসেছিলাম গো অস্তাদ—কি জানি, দিনের বেলা এলে কে আবার কি বলে বসবে। যাই'—বলে এক ঝলক হেসে সে যাওয়ার জন্তে পা বাড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদ হাত বাড়ালো ওকে ঘিরে ধরবার জন্তে। সেই নদীর ধারের পড়ো ভিটের মতো আজও তো জায়গাটা নীরব নির্জন!

সখী দুপা পেছিয়ে এড়িয়ে চলে গেল। চাপা গলায় বলে গেল, 'এই জন্তে তোমাকে মোর ডর লাগে অস্তাদ। যাও—ঘরে যাও।'

ওস্তাদ দাঁড়িয়ে রইলো জবুথবু হয়ে। আজ তো কই সখী গা ঘেঁষে এসে বললো না—'মোর ডর লাগে তোমাকে!' আর এই তো সবে ভর সন্ধ্যে—ভোর হতে তো অনেক দেরী আজ! ভাবতে ভাবতে মুখটা কালো হয়ে ওঠে ওস্তাদের। ভালো লাগে না আর কিছু। ভালো লাগে না হঠাৎ এ পড়ো ভিটেয় নতুন ঘরের আনন্দ।

৫

খালের মোহানার কাছ থেকে হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসছে নফর মণ্ডলের কনসার্ট বাঁশীর আওয়াজ। সূর্য তখন অস্ত গেছে।

'পুবচরের চোঙা বাজলো হে!'—পশ্চিম চরের একটি ছোকরা চাষী মাঠে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে হেঁকে উঠলো।

পাশাপাশি আরও কয়েকজন পশ্চিম চরের চাষী লাঙল ঠেলছিল—হেসে উঠলো তারাও।

চুপ করে আছে পুবচরের চাষীরা—মুখ নিচু করে লাঙল ঠেলে যাচ্ছে। যেন কিচ্ছু বলার নেই তাদের। পুবচরের নফর মণ্ডলের নাম-ডাক নেই চন্দ্র ওস্তাদের মতো, যদিও চন্দ্র ওস্তাদের মতোই নফর বাজিয়ে বেড়ায় যাত্রার দলে। তার কনসার্ট বাঁশীকে বলে ওরা চোঙা।

পুবচরের মোনা বলে উঠলো, 'হেসোনি অত হে। মোদের চোঙার মস্ত সাঙাৎও সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে এবার—শোনোই না। তাছাড়া অস্তাদ মোদের এখনও পুবচরের লোক।'

বেহালাটা বেজে উঠলো কিছুক্ষণ বাদে। সঙ্গত সুরু হয়েছে বেহালা আর কনসার্ট বাঁশীর। যাত্রার গাওনা যেদিন থাকে না সেদিন বিকেল থেকে সুরু হয় দুই সাঙাতের সঙ্গত। আড্ডা বসে নফর মণ্ডলের বাড়ীতেই। অনেক রাত পর্যন্ত সঙ্গত চলে।

সেদিন বাঁশী আর বেহালার সঙ্গতের সঙ্গে দূর থেকে ভেসে ভেসে এলো বাঁয়া তবলার আওয়াজ।

'তবলা আবার বাজায় কে হে!' পশ্চিম চরের একটি ছোকরা চাষী জিজ্ঞেস করলো।

মোনা বললো, 'কোনো লা-লৌকার মহাজন টহাজন হবে। সকালে দেখেছিলাম কি-না—একখানা লৌকা ঢুকলো এসে খালের মুখে।'

'ধানের নৌকা ? এঁ্যা—কটা বললে ?' চাষীদের আগ্রহ ফেটে পড়ে একসঙ্গে।

'একটা।'

'শুধু একটা ? ক' মুঠা ধান বোঝাই করবে তবে হে !'

'মোদের পুবচরের ধানেই বোঝাই হয়ে যাবে অমন দুটা।' মোনা বললো, 'আগে উঠবে মালিকের ধান—তার পর তোমরা শালা বেচতে পারো তো বেচো ঝড়তি পড়তি দামে।'

নতুন ধান এখন মজুদ ঘরে ঘরে। ফসল ওঠার পরে সবে মাস দুই কেটেছে। বাড়তি ধানের মতো মনটাও বাড়তি—উছলে পড়ছে কথায় কথায়। আর দুর থেকে তখন ভেসে আসছে বেহালা আর বাঁশীর ঐকতান। সুরের দোলা লাগছে ওদের মনে। একজন সেই সুরের তালে তালে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে মাথা ঝিকোয় আর গাইতে থাকে :

'দারা দারা দারা দারা গো'—

সুরে সুরে মাথা ঝিঁকোচ্ছে আরও কয়েক জন।

উর্বর পলি মাটিতে লাঙল ধরেছে চেপে ওরা—ফালের মাথায় উগরে উগরে উঠছে ঝুরঝুরে মাটি। এ চরের মাটিতে সোনা ফলে। এ চরের ঘরে ঘরে ধান আছে এখনও। এ চরের আকাশে তাই সুর কাঁপে। আর আছে গান।

নফব মণ্ডলের আড্ডায় পুবচর আর পশ্চিম চরের ছোকরারা এসে জমে যায় সন্ধ্যের পরে। বেহালা, বাঁশী আর হরেকেষ্ট মহাজনের তবলার সঙ্গতে আসর জম-জমাট। এর মাঝখানে এ চরের চৌকিদারও এসে বসে তার ক্রোক-পরোয়ানার ঢ্যাপঢেপে একটা ঢোল নিয়ে।

সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় চরের ছোকরাদের মধ্যে। পালা করে পিটোয় সবাই। নির্জন খালের মুখটা ফেটে পড়ে হর্‌রার দমকে।

একটি ছোকরা চাষী উৎসাহ ভরে বলে উঠলো, 'মোদের খোদ অস্তাদ আছে, নফর মণ্ডল আছে, আছে চৌকিদারের ঢোল। মোরাও একটা যাত্রার দল বাঁধি এসো।'

'আর লাচনদার আছে মোদের মদনা।'

'চাবাস। মদনা লাচবে। হেই ভাই মদনা!'

মদনা সঙ্গে সঙ্গে কোমরে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

হাততালি আর হর্‌রা, হরেকেষ্ট মহাজনের মাথা ঝাঁকানি আর মুখে বাঁশী নিয়ে নফর মণ্ডলের ফণা তোলা সাপের মতো দোল খাওয়া—সবটা মিলে আসর সরগরম। সবাই মশগুল হয়ে গেছে।

চঙমঙ করছে শুধু ওস্তাদের মন—বারে বারে চোখ গিয়ে পড়ছে খালের ধারের সেই একটা নির্জন অন্ধকার কুঁড়ের ওপরে। তাল কেটে যাচ্ছে বারে বারে।

নফর মণ্ডল বুঝেছে। হেসে বললো, 'ওস্তাদের মন নাই আজ আসরে হে।'—

কেমন মন-মরা মরাই দেখাচ্ছে বটে ওস্তাদকে।

নফর তার কানে কানে বললো, 'জোরসে ধরে দাও একখানা—যাতে সে ছটফটিয়ে ছুটে আসে। ধরো।—ভেবোনি সাঙাৎ, এসে পড়বে সে।'—

নফর জোর করে ওস্তাদের কাঁধে বেহালা তুলে দিল।

শেষ পর্যন্ত সে এলো।

সখী এসে উঁকি মেরে বললো, 'মা গো মা—আমি ভাবলম বুঝি ডাকাত পড়েছে আজ নফর মণ্ডলের ঘরে!' বলে সে হাসলো অন্ধকার চমকানো সেই তার শানিত হাসি।

চোখ জ্বলে উঠেছে ওস্তাদের। মনে মনে এতক্ষণ এই মেয়েটিরই প্রতীক্ষা করছিল সে: এই দুই সাঙাতের মজলিশে উকি মেরে যায় নি, এমন হয়নি কোনোদিন।

ওস্তাদের চোখে চোখে চেয়ে মুখ টিপে হাসলো নফর। সোৎসাহে বলে উঠলো:

'বসো বসো সখী। সখীকে তোমার সেই নতুন সুরখানা শুনিয়ে দাও সাঙাৎ।'

'আমি শুনবো!' সখী হেসে উঠল তেমনি করে। বললো, 'হায় শুনো গা, তোমার বৌ কি রকম করছে।'—

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে নফর মণ্ডলের বৌ সখীকে দেখেই। সন্দেহ ওর জমাট বেঁধেছে এতদিনে। দু' চোখ পেড়ে দেখতে পারে না আর সে সখীকে—ব্যাটা ছেলের এই আসরে। মেয়েটা তবু আসবেই মজলিস বসবে যেদিন।

সখী চাবুকের মতো শন্ শন্ করে হেসে বললো, 'মোর শুনতে মানা যে গো।—বিধবা মানুষ না আমি! গাওন-বাজন, সাধ-আহ্লাদ তোমরা কর নফর ভাই।'

'দেখলে—দেখলে! রাত দুপুরে ঝগড়া করতে এলো মাগী বাড়ী বয়ে।' তেড়ে এলো নফরের বৌ, 'বলেছি কিছু আমি—বলেছি! হারামজাদী'—

'নাও এবার তুমরা, গাওন বাজন শোনো বসে বসে। আমি এসেছিলাম একটু কাজে—তা আর হলোনি।'—বলে যেমন হাসতে হাসতে এসেছিল তেমনি করেই চলে গেল সখী।

'আহা, শুনে যাও—শুনে যাও।' পেছন থেকে ডাকলো নফর সাঙাতের হঠাৎ কালশিটে-মারা মুখটার দিকে চেয়ে। চটে যায় সে নিজের বৌয়ের ওপরেই।

মোনা সভয়ে বললো, 'যেতে দাও ওকে—ফের ঘুরে এসে মুখ খুললে চোদ্দপুরুষ সাফ করে দিয়ে যাবে একেবারে। তার চেয়ে ধরো অস্তাদ আর একখানা।'—

আর কিন্তু ধরার উৎসাহ থাকে না। ওস্তাদ বেহালাটা নামিয়ে রাখলো।

সাঙাতের মুখের দিকে চেয়ে নফরকেও কেমন যেন মার খাওয়া মনে হয়। সে-ও বাঁশী গুটিয়ে রাখে আস্তে আস্তে। মজলিশ আর জমে না।

ওস্তাদ মুখ নীচু করে বসে থাকে চুপ করে।

নফরের বৌ ওদিকে সমানে গাল পাড়ছে, 'পোড়া কপালী, রাঁড়ী, পুরুষের গন্ধ শুঁকতে এসেছে। হারামজাদী—শতেক খোয়ারী'—

এমতো গাল খেয়েও সখী কিন্তু আর ফেরে না।

মোনা বললো, 'ই তো বড় তাজ্জব। সখী যে বড় চুপ!'

এক কথায় যে দশ কথা শুনিয়ে যায় সে চলে গেল কেমন হাসতে হাসতে! এমনটা শোনেনি কেউ এ চরের।

হরেকেষ্ট মহাজন ঘুপটি মেরে বসেছিল এতক্ষণ। শেষ পর্যন্ত সে-ও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'উটি কে হলেন?'

'মোদের চরের এক চাষীর বৌ। স্বামী মরে গেল আজ দু'সন।'—মোনা বললো।

'আহা!' হরেকেষ্ট জিভে চুক চুক ক'রে বললো, 'অনাথা?'

'অনাথা বৈ কি মহাজন।' মোনা বললো, 'জমি ভূমি সব চলে গেল গাঙের তলায়। এ সনে আর কিছু নাই ওর।'

হরেকেষ্ট আবার বললো, 'আ হা! তা হলে ওর চলে কি করে গো?'

'চলে না মহাজন। আর কারই বা চলে ভালো করে যে ওর মুখের দিকে চাইবে বলো।' মোনা বললো, 'যাক সে কথা—এখন মোদের ধানের কথা বলো মহাজন।'

সবাই পড়ে তারপর হরেকেষ্ট মহাজনকে নিয়ে :

'কবে থেকে মোদের ধান তুলবে লৌকায় বলো মহাজন। সেবার মোদের দু-টাকা ক'রে ঠকিয়ে লিয়ে গেছ তুমি। ধানের দাম বাজারে তখন না-কি দু-টাকা চড়া ছিল।'

এত বড় একটা অভিযোগের সামনে মহাজনের তোবড়া বুড়ো মুখটা নির্বিকার মনে হয়। লোকটার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কালশিটে মারা চোয়াড়ে চেহারা। ভাগীরথীর ওপারে সুন্দরবনে তার জমিজায়গা আছে—আর আছে পাঁচশ'মণী এই নৌকোখানি। নৌকো ভাসিয়ে সে এই সময়টায় আসে সুন্দরবনের এ পারে, ধান কেনে। বছরে প্রায় দু-ক্ষেপ যাওয়া-আসা করে।

মহাজনের গর্তে ঢোকা চোখ দুটো কেমন নেশাখোরের মতো ঝিমোনো মনে হয় চাষীদের অভিযোগের সামনে। নির্বিকার ভাবে চোখ বুজে সে বললো, 'মোকে তবে ধান দিয়ো না।'

'ধান দেবো না—তবে বেচবো কার কাছে বলো !' মোনা বললো।

'আমি যে ঠকিয়েছি বলছো !'—

'ঠকিয়েছ বলেছি ! এ্যাঁ, তুমরা তো শুনলে সবাই—বলেছি !' মোনার কথার সুর বদলে গেল এক লহমায়, 'আমি শুধু বললাম যে, ধানের দাম নাকি চড়া ছিল। শুধু জিগ্যেস করলাম কথাটা। কি গো, বলো না তোমরা ?' সকলের মুখের দিকে তাকালো মোনা সমর্থনের জন্যে।

'কিন্তু তুমি ঠকাবার কথা বললে। বেশ, ভালো। ধান বেচো না মোকে।'

'আহা হা, রাগ করলে মিছেমিছি মহাজন। ধান তোমাকেই বেচবো মোরা—চর শুদ্ধ। আর বেচবো কার কাছে ?' মোনা কেমন ফাঁপরে পড়ে যায়।

'আরও তো মহাজন আসবে।'

'আসবে বটে। সে-ও তো ঠকাতে পারে। না-কি বলো?'

মহাজনকে হঠাৎ খচিয়ে দিয়েছে মোনা—বরং বিরক্ত হয় সবাই। আবার কবে আসবে কোন মহাজন তার ঠিক নেই। ধান বেচার দরকার সকলেরই। ধান বেচলে টাকা আসবে। সে টাকা হাতে এলে তখন সংসারের আর পাঁচটা জিনিস কেনা হবে। খরচ চলবে। একজন তকরার কথা-কাটাকাটির মাঝখানে অধৈর্য হয়ে উঠলো:

'বাজে কথা বাদ দাও মহাজন। ধান মোরা তোমাকেই বেচবো। বাস্।'

সুযোগ বুঝে মহাজন বললো,, 'এ সন ধানের দাম তো আরও কম—আরও দু-টাকা। তা বললে এখুনি তুমরা বলে বসবে—এই ত্থাখো, মহাজন চার টাকা ঠকিয়ে দিল।'

'আরও কম!'

গুম হয়ে বসে থাকে সবাই। পিট পিট ক'রে বোকার মতো চায় মহাজনের মুখের দিকে। কিন্তু সে মুখটা নির্বিকার, ভাব-অভি-ব্যক্তিহীন। মহাজন তার ঝুলে পড়া চোখের পাতার আড়ালে ঝিমোচ্ছে না মিটমিটিয়ে দেখছে সকলের মুখের ভাব—বোঝা যাচ্ছে না।

আড্ডা ভেঙে গেল বেতর মেজাজে।

বাইরে এসে পথে নেমে খচে যায় সবাই মোনার ওপরে:

'তুই সদ্দারি করতে গেলি কেনে?'

'আমি হক্ কথা তো বললম। শালা তো ঠকিয়েছিল!'

'শালা বুড়া গিধ্‌খোড় তো ঠকায়ই।' স্বীকার করে সবাই।

মদনা বললো, 'সব শালা চোর।'

'তবে?'

'তবে করবেটা কি? কার কাছে বেচবে ধান?'

কেউ আর কোনো কথা বলে না। মাঠের গভীর অন্ধকারে এতগুলো মানুষের কোলাহল, তাদের হক্‌ কথার উষ্ণতা আর তক্‌রার—সব যেন বোবা মেরে যায়, হারিয়ে যায় একান্ত অসহায়তায়।

ওরা চলে গেল দল বেঁধে ভেড়ি বাঁধের ওপর দিয়ে। তাদের চোখে পড়লো না—কে একজন বসে আছে খালের ধারে বাঁধের ওপরে—যেন রাগ করে, ঘর-দোর ছেড়ে বসে আছে এসে এই অজায়গায়।

ধড়মড় করে সে উঠে দাঁড়ালো ওস্তাদকে আসতে দেখে।

ওস্তাদও থমকে দাঁড়ালো ভেড়ি বাঁধের ওপরে।

সামনে সখী।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো ওস্তাদ। তারপর আবেগে উষ্ণ কম্পিত হাত ছুটো বাড়ালো সে সখার দিকে।

সখী ছু-পা পেছিয়ে গেল। হঠাৎ হাসিতে পড়লো তার শান এবার। বলে উঠলো, 'থামো অস্তাদ—থামো। মাহাজন এসে পড়বে এখুনি এই পথে। ছুটো টাকা ধার চাইবো বলে বসে আছি কখন থেকে। সকলের সামনে চাইলে আবার কে না কি ভাববে—তাই তখন যেয়ে ঘুরে এলম নফর মণ্ডলের ঘরথেকে।—ভীড় দেখে চাইতে লাজ হলো।'

টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল তবে সখী, অন্যান্য দিনের মতো উ কি মেরে একবার দেখতে যায়নি ওস্তাদকে! এখানেও বসে আছে সে অন্ধকারে—একা, টাকা ধার চাইবে বলে! বসে নেই ওস্তাদের জন্যে? মুখটা আস্তে আস্তে ভার হয়ে ওঠে ওস্তাদের। ট্যাকে গণ্ডা কয়েক পয়সা ছিল—সেইটে বের করে সে দিতে গেল সখীকে।

সখী হেসে উঠলো আবার, 'হায় গো অস্তাদ, করো কি! ও পয়সা রাখ তোমার—ঘর উঠছে লতুন। আরও খরচ আছে কত ছু-এক মাস পরে। যাও এখন—পথ ছাড়। মাহাজনকে ধরি যেয়ে।'

সখী পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দ্রুত মিশে গেল অন্ধকারে। যে অন্ধ আবেগ একটা মাথা ঠেলে উঠেছিল এই বোবা লোকটার বুকের মধ্যে—একটা প্রচণ্ড আঘাতে যেন পাথর হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ—তারপর একটা ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেল অন্তমনস্ক পা ফেলে ফেলে।

সখী কিন্তু থম্‌কে দাঁড়ালো কিছুটা গিয়েই। ঘুরে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারের দিকে চেয়ে: কেউ ফিরে আবার আসছে কি?

কেউ আসছে না। বৈশাখী রাতের অসংখ্য তারায় প্রশান্ত উজ্জ্বল এক উচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাসের তলায় আর সীমাহীন মিনমিনে অন্ধকারে হঠাৎ মেয়েটা কাঁদতে বসলো ভেড়ি বাঁধের ওপরে বসে। গাল পাড়লো নিজেকে, 'মুখটা তোর অমন কেন! মর তুই—মর অভাগী, সামনেই তো গাঙ।'...

এমন সময় বুড়ো বুড়ো পা ফেলে এসে থমকে দাঁড়ালো হরেকেষ্ট মহাজন সখীর সামনে।

ধোঁয়াটে বুড়ো দৃষ্টি তুলে বললো, 'কাঁদছে কে গো! এ্যাঁ!'

সখী উঠে দাঁড়ালো। চোখ মুছে বললো, 'আমি গো মাহাজন।'

'আহা—সখী! কাঁদছিলে কেন গো?'

'কাঁদতে নাই না-কি মাহাজন!'

জিভে একটু চুক্‌চুক্ করে শব্দ করলো বুড়ো। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আর বছর দেখে গেলাম—স্বামী ঘর সংসার নিয়ে দিব্যি সুখে আছ—এবার এসে দেখি বসে আছ সব খুইয়ে। কপাল—সব কপাল!—তা এখন চলছে কেমন করে গো তোমার?'

'গতরটা আছে মাহাজন। তাই খাটাতে চাই। কিন্তু মেয়ে মানুষকে খাটায় কে? জমি মোকে কোন মাহাজন ভাগে দেয় বল?'

'তবে ?'

আর ভালো লাগছিল না বুড়োর কথা। সখী বিরক্ত হয়ে বললো, 'তুমি যাও মাহাজন তোমার কাজে। যাই আমি।'

'শোন শোন গো মেয়ে।'

'কি বল।' সখী ঘুরে দাঁড়ালো।

'আমি একটা কথা ভাবছিলাম। তোমার অবস্থার কথা সব শুনেছি তোমাদের চরের লোকের কাছে। তা যাক—সে সব কপাল!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে মহাজন, 'তাই ভাবছিলাম।'—

'বল মাহাজন।'

'ক-দিন তো থাকতে হবে চরে। তা বুড়া মানুষ, নৌকায় জলে ভেসে থাকতে পারবোনি।'

'তাই থাকবে তুমি মোর ঘরে ?' সখীর কথায় ফিরে এলো আবার শানিত ধার। বললো, 'ওসব বদ বুদ্ধি ছাড় মাহাজন!'

'বদ বুদ্ধি! আমি বুড়া লোক সখী, তিন কাল গিয়ে আমার এক কালে ঠেকেছে। এবার মরতে পারলে বাঁচি। আমার কথায় বদ বুদ্ধির কি দেখলে গো—এ্যাঁ ?'

সখী কেমন থতোমতো খেয়ে যেন চুপ করে গেল।

হরেকেষ্ট আবার বললো, 'তোমার ভালর জন্মেই বলছিলাম সখী কথাটা। যে কদিন চরে থাকি, তবু একটা অনাথার উপকার করে যাই —যদি পারি। তাই ভাবছিলাম। টাকা দেব আমি—খরচ-খরচা দিয়ে থাকব।'

'মোর ঘরে থাকলে তোমার বদনাম হয়ে যাবে মাহাজন। বুড়া লোক তুমি। বাপের মতো।'—

'কত লোক কত কথাই তো বলে গো মেয়ে।'

বুড়ো কর্কশ গলাটা নরম নরম লাগে।

সখী, বললো, 'মোর বদনামের ভয় নাই মাহাজন ! সে সবের মোর তো আর সীমা নাই। বেশ, থাকবে তুমি।' ঝট করে স্বীকার হয়ে গেল সখী।

সেই রাতেই দাঁড়ি-মাঝিরা নৌকা থেকে হরেকেষ্ট মহাজনের বিছানা পত্র তুলে দিয়ে গেল সখীর ঘরে।

হরেকেষ্ট বিগলিত হয়ে হাসতে হাসতে বললো, 'আজ রাতেই চলে এলাম সখী। এই গরম ঘর ছেড়ে লা-নৌকায় পড়ে থাকতে আর মন চাইলোনি। বুড়া লোক।'—

৬

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাতিল চরের সেই টিপির ওপরে বসে রইলো ওস্তাদ ভুতের মতো। তারার আলোয় ভরা বৈশাখী রাত। মুখে এসে লাগছে গাঙের জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা। মন ঠাণ্ডা হয় না তবু ওস্তাদের। কেবলি মনে পড়ে—একদিন এই টিপির ওপরে গা-ঘেঁষে বলেছিল সখী, তোমাকে মোর ডর লাগে ওস্তাদ।···

আরও কত কথা মনে পড়ে আজ। সখী তাকে বড় দাগা দিয়েছে আজ—দূরে সরে যাচ্ছে যেন। অথচ আজ সে অনেক কথা মনে করে গিয়েছিল স্যাঙাতের বাড়ী—অনেক দিন ভেবে ভেবে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল মনে মনে। সঙ্গতের আসর বসবে—সখী আসবে ছুটে। তারপর আসরের শেষে সখী যখন বাড়ী ফিরবে তার সঙ্গে নির্জন অন্ধকারে খালের ধারে ধারে—হিয়ের কথাটা বলবে তখন সে। মুখ তার ফুটবে না ঠিক, বোবা মানুষ। কিন্তু বুকে আছে তার অনেক দিনের জমানো হিয়ের আবেগ। সেইখানে সে চেপে ধরবে—বুকের কথা বলবে বুক দিয়ে। কিন্তু সব কেমন ভেস্তে গেল। নতুন ঘর উঠছে তার মায়ের পড়ো ভিটেয়—সেই খোঁচা মেরে গেল সখী।

টিপির ওপরে চুপ করে বসে রইলো সে ভুতের মতো। ফিরে ফিরে কেবলই মনে পড়ছে যতো রাজ্যের পুরানো কথা। সেই কবে একদিন সঙ্গতের আসরের ব্যাপার—প্রথম যেদিন সখীর কথা শোনে সে। তাদের এ আসর বহুদিনের। বাঁশী আর বেহালা নিয়ে দুই সাঙাৎ বসে যেত সন্ধ্যের পরে। কর্মক্লান্ত সারা দিনের পর সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিম মেরে যেন মরে যেত এ চাষীর গাঁ। তখন আসতো না আর কেউ।

হঠাৎ নফর বলেছিল একদিন, 'যাত্রার দলের উড়নচণ্ডে লোক মোরা। এ চরের তোমাকেও কেউ পোঁছে না, মোকেও না। কিন্তু তুমি একটা মানুষকে যাদু করে ফেলেছ গো সাঙাৎ।'

কে সে! ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল ওস্তাদ।

নফর বলেছিল, 'তোমার চোখ নাই—দেখতে পাও না। বেহালা ধরো—দেখতে পাবে।'

দেখেছিল ওস্তাদ : সে সখী।

সখীর দিকে চেয়ে নফর হেসে বলেছিল, 'বসো বসো সখী। ভালো করে একখানা ওকে শুনিয়ে দাও ওস্তাদ।'

সখী হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'সাঁঝ পহরের পর একলা ঘরে দুয়ার বন্ধ করে বসে থাকি ভুতের ভয়ে। তাই পালিয়ে এলম।'

'ভুত! ভুত কোথায় সখী?'

'ই চরে তোমাদের বড় ভুত নফর দা—সব চ্যাংড়া ভুত। তুমি জান না, তোমার বৌকে জিজ্ঞেস করো।'

নফরের বৌও এসে বসতো তখন এদের দুই সাঙাতের আসরে।

ওস্তাদের দিকে চেয়ে নফর চোখে চোখে হেসে বলতো, 'ভালো করে বেহালা শোনাও সাঙাৎ।'

বেহালা বাজাতো ওস্তাদ—প্রাণে মনে এসে লাগতো যেন নতুন ছোঁয়া। বড় ভালো লাগতো সন্ধ্যের সেই আসরগুলো। নতুন কি একটা বেদনার সুর লাগতো যেন বেহালায়—যা বলতে পারবে না সে মুখ ফুটে কোনদিন, বলা হবে না এ জীবনে।

বলা হলোও না। ···বোবা অন্ধকারের দিকে বোবা চোখ তুলে মনে পড়ে ওস্তাদের আজ সাঙাৎ নফর মণ্ডলের কথা।

নফর মণ্ডল বলেছিল, 'পালাও তোমরা কোথাও এ চর ছেড়ে, ঘর সংসার কর—সুখে শান্তিতে থাক সাঙাৎ। এ চরে তোমাদের সুখ নাই।'

কিন্তু কোথায় যাবে সে এ চর ছেড়ে! অন্ধকারে দেখা যায় না সবটা—তবু চোখ মেলে চেয়ে থাকে ওস্তাদ। এ চরের সব মানুষ মেতে উঠেছে এতদিন পরে তাকে নিয়ে—শুধু এই মোহে নয়, এ চরে তার মায়ের পড়ো ভিটেয় নতুন ঘরের দেয়াল উঠছে একটু একটু করে। এ চর ছেড়ে কোথায় সে পাড়ি জমাবে গাঙের ওপারে অজানা সুন্দরবনের নতুন আবাদে! কেমন একটা মায়া জাগে যে এ চরের মাটির জন্যে—ঘরের জন্যে তার!

মনে মনে ক্ষেপে ওঠে সে: কেন সুখ নেই এ চরে, কেন শান্তি নেই! কেন সখী খোঁচা মারে তার নতুন ঘরের—কেন এড়িয়ে যায় সে! দেবে না এড়াতে। এই চরে ঘর গড়বে সে। এইখানেই আছে তার অনেক দিনের আনন্দ আর সুখ। হরি মণ্ডলের মাতব্বরীকে সে পরোয়া করে না।

উঠে দাঁড়ালো ওস্তাদ। চোখে তার বোবা মানুষের চাপা কথার দীপ্তি। টিপি থেকে নেমে পায় পায় এগিয়ে চললো সে সরকারী বাঁধ ধরে সখীর ঘরের দিকে। সখীকে সে এড়াতে দেবে না। বুকের গভীরে হিয়ের যে কথাটা ছটফট করেও মুক্তি পায়নি এতদিন—তাই বলবে সে আজ।

রাত তখন দুপুর—নিঝুম। চর ঘুমন্ত। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওস্তাদ এসে দাঁড়ালো সখীর কুঁড়ের সামনে। তারপর বাঁশের দরোজাটা ঠেলতে লাগলো সজোরে—ধাক্কা দিতে লাগলো আবেগে।

দম চাপা গলায় ভেতর থেকে সখী বলে উঠলো, 'কে !'

'অঁ অঁ।' জন্তুর কাৎরানির মতো শোনায় বোবা মানুষটার গলা।

সখী দরোজা খুলে দাঁড়ালো। বুক হঠাৎ ঢিপ ঢিপ করে উঠেছে তার। দম চেপে ফিস ফিস করে বললো, 'এ কি—অস্তাদ !'

ওস্তাদ তার একটা হাত চেপে ধরলো আবেগে। তারপর তাকে ঠেলে নিয়ে ঢুকতে চাইল ঘরের ভেতরে।

দরোজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলো সখী।

'মাথা গরম কোরোনি অস্তাদ।' সখী তেমনি দম চেপে চেপে বললো, 'ঘরে মোর লোক আছে।'

লোক ! থমকে দাঁড়ালো ওস্তাদ।

সখী বললো, 'মহাজন আছে।'

সেই হরেকেষ্ট মহাজন ! আবেগে উষ্ণ, অধৈর্যে শক্ত মুঠোতে ধরা সখীর হাতটা ঝপ্‌ করে খসে পড়লো ওস্তাদের হাত থেকে।

সখী চেপে চেপে বললো, 'যাও অস্তাদ, গোলমাল কোরোনি। বুড়া মানুষ—জেগে উঠবে ! যাও—ঘরে যাও।'

সখীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ওস্তাদ। চেয়ে চেয়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করলো—বোঝার চেষ্টা করলো সে।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে চলতে সুরু করলো সোজা। ক্লান্ত অবসন্ন পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললো সে। শরীরের সমস্ত গাঁটগুলো কেমন টনটন করছে—ঝিমিয়ে আসছে মাথা। এই

অবস্থায় যেখানে এসে সে থমকে দাঁড়ালো সে হলো তার মায়ের পড়ো ভিটে। এ ক-দিনে দেয়াল উঠেছে এক বুক। চালা নেই। তবু চোখে ভেসে উঠলো তার, কে যেন ঝুলছে চাল থেকে গলায় দড়ি দিয়ে। সে তার মা। সে যেন সখীও।

এই এ চরের গরীব চাষীর কাঁচা বয়সী বিধবাদের ভাগ্য। ...

এ কাহিনী এ চরে নতুন নয়। বিধবা বৌগুলো কাঁদে কিছুদিন, তারপর গাল পাড়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে পোড়া ভাগ্যের জন্ম। তারপর বাঁচার উপায় খোঁজে। তখন ঘরে ঢোকে কোনো বিদেশী ধানী নৌকোর মহাজন অথবা এ চরের তশীলদারেরা।

অজান্তে হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে ওঠে ওস্তাদের আর বুকের মধ্যে কিলবিল করে ঘৃণা। ভেঙে চুরমার করে দিতে ইচ্ছে করে তার এ চরের চিরকেলে ঘৃণিত ভাগ্যের ছকটাকে।

মাথার শিরটা টনটন করছে। ক্লান্ত শরীরটা টেনে টেনে ফিরে চললো ওস্তাদ পুবচরের দিকে। দূর থেকে চোখে পড়ে নফর মণ্ডলের ঘরটা। মনে মনে বলে—সন্ধ্যের পরে সঙ্গতের আসরে আর কোনোদিন বেহালায় তার লাগবে না প্রাণের সুর।

৭

পরের দিন থেকে হরেকেষ্ট মহাজনের নৌকোয় ধান উঠতে সুরু করে। আগে ওঠে পশ্চিম চরের ধান। তারা নাকি পুবচরের চেয়ে আরও দু-আনা দাম ফেলে দিয়েছে।

মোনা বললো, 'দেখলে কাণ্ডটা! কাল অত কথার পর পছিম চর কি কাণ্ডটা করে বসলো ছাখো।'

ধান বেচার জন্যে পুব পশ্চিম কোনো চরের আগ্রহ কম নয়। একটি মাত্র নৌকো এসে ঢুকেছে খালে। আবার কবে নৌকো আসবে তার

কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ধান বেচে হাতে দু-পয়সা করতে চায় সবাই। হাজার প্রয়োজন হাঁ-করে আছে।

খালের মুখে ধান মাপের ডাক উঠছে :

'রামে রাম—রামে দুই—দুবে দুই—তিনে তিন।' একটানা হাঁক চলছে হরেকেষ্ট মহাজনের। দমকা হাওয়ায় সে হাঁক ছড়িয়ে পড়ছে চরময়।

পুবচরের লোক সে ডাক শুনে শুনে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'দেবে আর দু-আনা দাম ফেলে ?'

'তা হলে থাকবে কি আর। অতো ঝড় জল মাথায় করে, সাপ আর কুমীরের মুখে চাষ-আবাদ করে পাবো কটা পয়সা ? বলো ?'

ওদিকে কলধ্বনি ওঠে পশ্চিম চরের আকাশে : কে ডাকে কার নাম ধরে। মাথায় মাথায় চলেছে ধানের বস্তা পশ্চিম চরের মাঠ-ঘাট ভেঙে। হৈ-হাল্লায় খালের পাড় সরগরম।

'…কুশা কুশ—একুইশা কুশ—কুশা বাইশ'—

হৈ-হৈ করে উঠলো ভাকু দাস, 'গোল করে দিলে মহাজন। একুশ পাল্লা দু-বার হাঁকলে, মাপলে বাইশ পাল্লা কিন্তুক।'

পাঁচ সেরি পাল্লাটা থামিয়ে হরেকেষ্ট থমকে গেল। ভাকু দাসের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখলো যেন। তারপর বললে, 'তুলে নাও তোমার ধান। পাতো বস্তা।'

ভাকু দাস দমে গিয়ে বললো, 'আহা, ধান তো বেচবো গো। বলি তা বলে এক পাল্লা গোলমাল করে ঠকিয়ে লেবে! পাঁচ পাঁচ সের ধান! মোদের—রক্ত জল করা'

'ঠকিয়ে দিলাম!'

'ঠকালে তো!'

'হেঁকে যাচ্ছি—শুনচিস তো দাঁড়িয়ে। আর সবাই তো শুনচে—নাকি ?'

কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। একটি মাত্র নৌকো শুধু ঢুকেছে খালে।

হরেকেষ্ট বললো, 'পাঁচ সের ধান তোর কাছ থেকে ঠকিয়ে নিয়ে বড় লোক হয়ে যাবো আমি—এ্যাঁ ? বলি, আমি কি চোর ?'

কিছুক্ষণের জন্তে গোলমাল হয় একটু। হরেকেষ্ট মহাজনের দাব-ড়ানির কাছে শেষ পর্যন্ত থেমে যায় ভাকু দাস। তবু গুম্‌রে গুম্‌রে বললো :

'তুমি পষ্ট পষ্ট হাঁক দাও মহাজন—জড়িয়ে জড়িয়ে এমন তড়বড়িয়ে হাঁকো যে বুঝতে পারি না।'

'হাঁ—তোর জন্তে আমি হেঁকে হেঁকে মরি সারা দিনরাত।'

ধানের মাপ চলে আবার। তড়বড়িয়ে হাঁকে, তড়বড়িয়ে মাপে মহাজন—হাত আর মুখ চলে সমানে। তারই মাঝখানে দু-এক পাল্লা অদ্ভুত কৌশলে আবার গোলমাল করে দেয় অবলীলায়। চাষীরা সতর্ক হয়েও ধরতে পারে না। পাণ্টা শোধ নেয় ধানে ধুলো মিশিয়ে।

'দে শালাকে গেদে গেদে ধুলো।'

ঘরে বস্তায় ধান ভরবার আগে ছেলেমেয়ে সবাই মিলে ধানের সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি চরের নোনা ধুলো এনে মেশায়। মাপতে মাপতে ধুলো ওড়ে—পলিমাটির সূক্ষ্ম নোনা ধুলো। সে ধুলোয় চোখ মুখ মাথা ভরে যায় হরেকেষ্ট মহাজনের। কেমন অদ্ভুত মূর্তি দেখায় তাকে কাজের শেষে। চাষীরা হাসে মুখ টিপে। দুপুর গড়িয়ে গেলে বন্ধ হলো সেদিনের মতো ধান তোলার কাজ।

বিকেলের দিকে হাঁক পাড়ে মহাজন নফর মণ্ডলকে, 'সন্ধ্যের পরে আজ সজত বসবে নাকি গো ?'

মহাজনের উৎসাহ দেখে নফর বললো, 'বেশ তো, সাঙাৎকে তা হলে খবর দিই।'

সন্ধ্যের পরে আজ সঙ্গত বসে সখীর ঘরের দাওয়ায়। হরেকেষ্ট মহাজন তবলা টেনে বসলো। পুবচর পশ্চিম চরের দু-চার জন ছোকরাও জুটে গেল এসে। চৌকিদার নিয়ে আসে তার ঢোলটা। সন্ধ্যে উৎরে রাত হলো। সবাই কিন্তু বসে থাকে একটা লোকের জন্তে। সে ওস্তাদ।

হরেকেষ্ট বললো, 'আসবে না নাকি?'

'বলে তো এসেছি সাঙাৎকে—সখীর বাড়ীতে আজ হরেকেষ্ট মহাজন আসর বসাবে।' নফর বললো।

'তবে?'

'কেন এলো না কি জানি।'

নফর নিজেও অবাক হয়। তাকায় সখীর মুখের দিকে—কিছু যেন বোঝবার চেষ্টা করে। চেয়ে চেয়ে শুধু এইটুকু বোঝে—মুখের ভাবটা কেমন যেন অন্ততর। সখীর বাড়ীতে আসর জেনেও সাঙাৎ এলো না—নফর অবাক হয় শুধু। কাল রাতের ঘটনা কিছুই জানে না সে। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে—হরেকেষ্ট মহাজনের জন্তে সখী রাঁধতে ভারী ব্যস্ত। এটা করছে—ওটা করছে—ঘুরে ঘুরে থাকছে নফরের সারাক্ষণ।

হরেকেষ্ট হাই তুলে বললো, 'তুমি বাঁশী ধরো নফর। না আসুক তোমাদের ওস্তাদ।'—

বেহালা ছাড়াও জমে যায় সঙ্গতের আসর। হরেকেষ্ট মহাজন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মাথা দুলিয়ে তবলা বাজায়। চৌকিদারের ঢোল নিয়ে টানাটানি করে কয়েকজন। হররা ফেটে পড়ে খালের ধারের অন্ধকারকে চমকে দিয়ে। শুধু নেই একটা লোক। এবং তার অভাব বোঝাও যায় না একটু কোথাও। কিন্তু যার বোঝার সে হয়তো বোঝে ঠিকই।

এর মাঝখানে সখী হঠাৎ এসে দাঁড়ালো মারমুখো হয়ে। বলে উঠলো, 'না মাহাজন—ই চলবেনি। বুড়ো মানুষ থাকতে চেয়েছিলে, থাক। ই-সব চলবেনি মোর এখেনে। পষ্ট কথা মোর—চলে যাও তোমরা।'—

কিছু একটা হয়েছে। হয়েছে নিশ্চয়ই। নফর অন্যমনে আস্তে আস্তে বাঁশী গুটিয়ে রাখলো বাক্সে।

এর পরে আর আসর জমার কথা নয়। কেমন ঘাবড়ে যায় হঠাৎ সবাই। আসর ভেঙে চলে যায় একে একে। সখীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা শুধোতে সাহস হয় না নফরেরও। হঠাৎ কেমন একটা বিদঘুটে কাণ্ড ঘটে যায়।

আবার তর্জনী তুলে শাসালো সখ সবাইকে, 'চলে যাও তোমরা—যাও মোর ঘর থেকে।'

সবাই চলে যায় ভয়ে ভয়ে। হরেকেষ্ট তবলা দূরে ঠেলে দিয়ে মাথা নীচু করে ঝিমিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কোনো কথা বলে না। হঠাৎ একটা মাথা চাড়া দেওয়া উত্তেজনাকে শূন্য নীরবতার মাঝখানে থিতিয়ে মরে যেতে সময় দিচ্ছে যেন সে বুদ্ধিমানের মতো।

কথা কইলো সে অনেকক্ষণ পরে। নিজের মনের সুখ-দুঃখের কথা। গলাটা বিষণ্ণ।

'সারা দিনের কাজের পর মনটা ঝিমিয়ে পড়ে সখী—বয়স হলো তো। তারপর এই বিদেশ-বিভুঁই। সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।'

এর উত্তরে সখী একটা কথাও বলে না।

হরেকেষ্ট আবার বললো, 'বুড়ো মানুষের ওপরে রাগ কোরোনি সখী।'

'রাগ আমি করিনি মাহাজন, মোর ঘরে হাঙ্গাম হুজ্জুৎ ভালো লাগে না।' সখী বললো।

'আগে বললে এসব আমি এখানে করতাম না সখী।'

সেটা সখারই দোষ। সঙ্গতের আসর বসবে, আসর পাতা হয়েছে দাওয়ায়। নফরকে হাঁকডাক করে আরও আগে বলা হয়েছে সঙ্গতের আসরের কথা। তখন সখী কিছুই বলেনি। তারপর হঠাৎ জ্বলে উঠলো দপ্ করে।

সখী আর কোনো কথা বলে না। তার মুখটা শুধু থম্থমে দেখায়।

হরেকেষ্ট ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে নরম নরম কথা বলে—তার বুড়ো জীবনের নানান দুঃখের কথা। বিদেশে বিভুঁয়ে পড়ে পড়ে নানান দুর্দশার কাহিনী :

'একবার এই রকম চালান নিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় হাফ কলেরা ধরে গেল।'

সখী নীরব।

হরেকেষ্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'কত যে বিপদ ঘাটে অঘাটায়। এই বয়সে এ সব কি আর মানায় ?'

সখী শুধু শোনে।

'অথচ বলো—কিসের অভাব আমার ? গোয়াল ভরা গোরু, জমির ধান—সব আছে। তবু ছাখ দুর্ভাগ্য।'

সখী এবার কাটা কাটা ভাবে বললো, 'তবে নৌকা ভাসিয়ে এ বয়সে গাঙ পাড়ি দাও কেন মহাজন ! ঘরে যেয়ে এবার বোসো।'

'বসবো ! কারবার দেখবে কে তা হলে !' হরেকেষ্ট বললো, 'বলো ?'

'ছেলেরা তো বড়।'

'বড় তো—কিন্তু কারবার ছেড়ে দিলে সব চুরি করে সাবড়ে দেবে।' হরেকেষ্ট বললো, 'নইলে এই বয়সে আমি ওই দুরন্ত গাঙ চুঁড়ে চুঁড়ে মরি সখী !'

সখী চুপ। হরেকেষ্ট একাই কথা বলে তারপর টেনে টেনে :

'ঘরেও মন টেকে না সখী। সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কে আর আছে বলো নিজের বলতে। ছেলেরা সব স্বার্থপর—যে যারটা নিয়েই আছে। কেউ তাকায় না বুড়ো মানুষের দিকে। কথায় সেই যে বলে—ছেলের মা মরা না বুড়ো মানুষের বৌ মরা—সে বড় কষ্ট সখী। কেউ তোমার দিকে চাইবে না।'

হরেকেষ্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়।

ঘরের গোটা আবহাওয়াটা কেমন ভারী ভারী লাগে। আফশোষ হয় এতক্ষণে সখীর—আহা, এই রকম একটা বুড়ো মানুষের আমোদ-আহ্লাদে বাধা দিয়ে ভালো করেনি সে। বললো:

'ছেলেরা তোমার কেমন গো মাহাজন!'

'তাই তো বলি, ঘর নয় আমার—শ্মশান। সব থেকেও কিছু নাই আমার।' হরেকেষ্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'তার চেয়ে এই যে তুমি রেঁধে বেড়ে দিচ্ছ, দুটো কথা শুধাচ্ছো—এতে বুক আমার ভরে যাচ্ছে সখী। এ ছেড়ে ঘরে আবার ফিরে যেতে হবে—মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায়।'

দু-জনেই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর হরেকেষ্ট বললো, 'একটা জিনিস ভাবছি আমি—তোমার ঘরে এসে দেখে শুনে ভাবছি।—এবার ফিরে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবোই।'

সেটা যে কি—তা আর বলে না হরেকেষ্ট। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সখীর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থেমে যায়।

পরের দিন সকালে হরেকেষ্ট মহাজনের বেরুবার সময় সখী ডেকে বললো, 'তোমার সঙ্গতের আড্ডার লোকজনকে আজ ডেকে এনো গো মাহাজন—আসতে বোলো সন্ধ্যে বেলা।'

হরেকেষ্ট হেসে বললো, 'এক রাত্তিরেই রাগ পড়ে গেল ?'

'রাগ আবার কার ওপরে করবো মাহাজন !'

'কেন আমার ওপরে ?'

'তোমার ওপরে !' বলে হাসতে লাগলো সখী খিল খিল করে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। সে হাসি আর যেন থামে না।

সে হাসির সামনে হরেকেষ্ট দাঁড়িয়ে রইলো বিব্রত হয়ে। বুঝতে পারলো না, কি এমন একটা মহা হাসির কথা বলে ফেলেছে সে।

সখী হাসতে হাসতে বললো, 'তুমি যাও মাহাজন তোমার কাজে। ধানের বস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোক জন।'

তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে খালের ধারে। খালের উঁচু পাড়ে জমা হয়েছে অনেকগুলো বস্তা। তাকে ঘিরে কড়া তামাকের ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। ধান বেচছে পশ্চিম চর—তবু পুব চরের চাষাভূষোরাও মিশে গেছে এসে সে ভিড়ের সঙ্গে। তারা ধানের মোট বইবে পাড়ের ওপর থেকে নৌকোয়—মণ প্রতি চার পয়সা মজুরি। গ্রামের অলস কুকুর কয়েকটা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে চারপাশে। ভিড়ের মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে এক একটা হর্‌রা পাকিয়ে ফেটে পড়ে অকস্মাৎ। তারপর সেটা হারিয়ে যায় ফসল-তোলা ফাঁকা মাঠের শূন্যতায়। চাষীর ঘরে ধান-বেচা পয়সার দু-দিনের আনন্দের মতো।

এই জটলার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে কলিমদ্দি শেখ। কে একজন বললো, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন হে কলিমদ্দি—বসে পড়ো। সখীর ঘরে এখনো রাত ভোর হয়নি মহাজনের।'

আবার একটা হাসির হর্‌রা ওঠে।

কাত্তিক মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য করলো, 'মোদের সখী শেষ কালে শালা বুড়া গিধ্‌ধোড়কে ঘরে ঢোকালো।'

'কেন—তোকে ঢোকায়নি বলে রাগ হলো না কি ?'

'না না—তা বলছি না।'

'আছে তোর লাটে পাঁচ শ' বিঘা জমি ? আছে তোর ধান বেচা কাঁচা টাকা ? শালা ন্যাংটা ফকিরের যৈবন রে !'

'আমি কি তাই বলছি ?'

'চুপ কর শালা ন্যাংটা ফকির। তুই যাবি রাতের বেলা তাকে জাপটে ধরতে—তো লাথ খাবি।'

'আহা—গেছলো নাকি। কবে হে কাত্তিক ? এ্যাঁ—কবে ?'

ভিড় আবার কল্ কল্ ক'রে ওঠে। এমন বসা বৈঠকের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে শুধু কলিমদ্দি। ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠলো, 'আরে কলিমদ্দি—বসে যাও হে। রসের কথা বসে শোনো।'

মোনা হেসে চোখ টিপে বললো, 'কলিমদ্দির বসার কি আর জো আছে। দেখছো না আল্লার কৃপায় দাঁড়িয়ে আছে কোনো রকমে। বসলে যে বে-আব্রু।' বলে ইঙ্গিত করলো কলিমদ্দির পরণের এক ফালি ন্যাকড়ার দিকে।

'তবে ওকে জোর ক'রে বসিয়ে দে।'

হাল্লা ফেটে পড়লো আবার। কলিমদ্দি সরু এক ফালি ন্যাকড়ার মতো কোমরে জড়িয়ে এসেছে কোন রকমে—ধানের মোট বইবে বলে। ছোকরাদের হাত থেকে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টায় দু'পায়ের ফাঁকে হাত চাপা দিয়ে কোনো রকমে রোখবার চেষ্টা করে সে। কয়েক জন তাকে ধরা-ধরি ক'রে একেবারে জটলার মাঝখানে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিল। তার পর হাসিতে ফেটে পড়ে আবার সবাই।

'আসছে—শালা মহাজন আসছে।' ভাকু দাস বললো, 'ওঠ সব এবার হে।'

মহাজনকে দেখা যায় দূরে। আসছে। ভিড় ভাগ হ'য়ে যায় এবার দু-ভাগে। যারা বইবে তারা মাথায় গামছা জড়াতে থাকে, আর পশ্চিম চরের চাষীরা গিয়ে দাঁড়ায় যে যার ধানের বস্তার কাছে।

হরেকেষ্টর মুখের দিকে চেয়ে আছে সকলে। বুড়ো মুখটাকে আজ ভয়ানক তাজা মনে হয়। হরেকেষ্ট বললো, 'তোদের এই ক' বস্তা ধান!'

'মেপে তোলো না গো মহাজন', একটি চাষী বললো, 'আরও এসে পড়বে। ধানে তোমাকে পুঁতে ফেলাবো—মালিকের ধান তোলার আর জায়গা পাবে না।' বলে সে হাসলো হি-হি ক'রে।

হরেকেষ্ট কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে বললো, 'ধর তবে।' হেঁকে বললো, 'দে আজ নৌকা বোঝাই করে সারা দিনে। মালিকের ধানটাও টেনে দে সবাই মিলে। সন্ধ্যে বেলা গায়ের ব্যথা মরার মাল দেবো।'

কয়েকজন ছোকরা উল্লসিত হয়ে ওঠে।

'কি দেবে মহাজন—এঁ্যা? তাড়ি খাওয়াবে?'

'আছে আছে, ভালো ওষুধ আছে—দেবো। নৌকাটা বোঝাই ক'রে দে দিকিন আজ।' মহাজন চেপে চেপে হেসে বললে, 'খেয়ে ভুলতে পারবিনি সে জিনিস।'

সেদিন সন্ধ্যের দিকে পুবচর আর পশ্চিম চরের ছোকরারা জুটে গেল অনেকে। সারা দিনের ধানের মোট বওয়া ধুলিধুসর শরীর গুলোকে ধুয়ে মুছে ফিটফাট হয়ে বসলো এসে মহাজনের আড্ডায়।

মদনা ফিস ফিস ক'রে ভয়ে ভয়ে বললো, 'হাঁ মহাজন—আজ ফের সখী তাড়িয়ে দেবে না তো মোদের?'

হরেকেষ্ট রহস্যময় হাসি হেসে বললো, 'না রে না—সখীর রাগ পড়ে গেছে আজ। নে বানা ভালো ক'রে।' বলে এক জনের হাতে খানিকটা গাঁজা গুঁজে দিল।

'গ্যাঁজা ?'

'হ্যাঁ রে বাওয়া, বড় তামাক। মৌজ করে খা সব। গায়ের ব্যথা মরে যাবে।'

মদনা বলে উঠলো, 'আমি কিন্তু খাবনি মহাজন। মোর ঘুম পেয়ে যাবে। মোকে একটু বরং তামাক দাও খাই।'

মহাজন রসিয়ে রসিয়ে বললো, 'বড় তামাক খেলে ঘুম তোর পালাবে। খেয়ে ছাখ তো একবার।'—

কয়েকজন ছোকরা মহা উৎসাহে লেগে গেল গাঁজার পেছনে।

মদনা ফিস ফিস করে মোনাকে বললো, 'শালা মহাজন একের নম্বর ছ্যাঁচড় বটে কিন্তু মন আছে হে। শালা ভারি ফুর্তিবাজ—বুড়ো হলে কি হবে।'

গাঁজার ধোঁয়ায় তারপর জমে যায় আড্ডা। নফর এলো তার বাঁশী নিয়ে, চৌকিদার এলো তার ঢোল নিয়ে। তবু বসে রইল সবাই হাত গুটিয়ে—গত কালেরই মতো। ওস্তাদ এলেই গান বাজনা সুরু হবে বলে। কিন্তু সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হলো। ওস্তাদের দেখা নেই আজও।

'আসবে না সে ?' মহাজন জিজ্ঞেস করলো নফরকে।

নফর বললো, 'বলে তো এসেছি।' কিন্তু তবু তার সন্দেহ হয়—হয়তো আসবে না। সখীর ঘরেই বসেছে মজলিস—তবু আসেনি ওস্তাদ কাল। কোথায় কি একটা ঘটে গেছে—যা সে জানে না। কাল সখীর হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া মূর্তিটার কথা মনে পড়ে তার বার বার।

সখী কিন্তু আজ নফরের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এগিয়ে এসে হেসে উঠলো খিল খিল করে। বললো, 'কি গো, সবাই সেজে গুজে বসেই রইলে যে!'

মদনা বললো, 'মোদের ওস্তাদই আসেনি এখনও।'

'তাই তোমরা হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে আছ? গাওন-বাজন তোমরা জাননি কেউ?'

হরেকেষ্ট মহা উৎসাহে বলে উঠলো, 'ঠিক। সে না আসে—না আসুক। ধরো নফর'—বলে তবলা টেনে নিয়ে চাঁটি মারলো।

নফর বাঁশী ধরে—নিরুৎসাহে। কয়েকজন ছোকরা কাড়াকাড়ি করে চৌকিদারের ঢোল নিয়ে। তারপর বাঁশী আর তবলার ঐকতান খালের ধারের নির্জন অন্ধকারকে মুখর করে তোলে। গাঁজার নেশার দমে বেতাড়া পেটানো ঢোলের বেপরোয়া আওয়াজটা ছাপিয়ে ওঠে সমস্ত কিছুকে। চৌকিদার হাঁ-হাঁ করে উঠলো শেষ পর্যন্ত:

'অতো জোরে না—অতো জোরে না,—দিলে ফাঁসিয়ে! মোর কোরোক-পরোয়ানার ঢোল—সরকারী জিনিস!'

তারপর সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে এলোমেলো হর্রা। ঐকতান চাপা পড়ে যায় কোথায়। শোনা যায় শুধু মাতাল ঢোলটাই।

সখী হেসে গড়িয়ে পড়ে বললো, 'হ্‌ তোমাদের কি গাওন-বাজন গো।'

হরেকেষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ধমকে দিল সকলকে, 'এইও'—

মদনা বললো, 'দূরো। অস্তাদ থাকলে গা-গতর মোদের নাচিয়ে দিত। এ ঠিক জুৎ হচ্ছে না গো।'

হ্যাঁ, নাচিয়ে দিত। লোকগুলো দুলতো তালে তালে, হাত-তালি পড়তো দোলার ছন্দে, হরেকেষ্ট মাথা ঝিঁকোতো চোখ বুজে, নফরও দুলতো ফণা-তোলা সাপের মতো মুখে বাঁশী নিয়ে। কিন্তু আজকের এলো-মেলো এই হাল্লার মাঝখানে সে ছন্দ নেই। এ একটা নেশাখোর আড্ডার ভুতুড়ে হাল্লা। তবু সখী আজ এগিয়ে এসে যোগ দিয়েছে এই হাল্লার সঙ্গে! গড়িয়ে পড়ছে হেসে! নফর বাঁশী নামিয়ে তার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন বোঝবার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা।

সখী বললো, 'তার চেয়ে তোমরা গান গাও বাপু একটা।'

হরেকেষ্ট উৎসাহিত হয়ে বললো, 'তাই ধরো কেউ।'

নফর তার বাঁশী গুছোতে গুছোতে বললে, 'সেই ভালো—গান গাও কেউ। সাঙাৎ নাই, বাঁশী মোর বাজাতেও ভালো লাগছে না।'

'মোদের গাইতে বলছো?' মদনা জিজ্ঞেস করলো।

'তবে আর গাইবে কে? মহাজন গাইবে?' নফর বললো।

হরেকেষ্ট বলে উঠলো, 'না না—তোমরা কেউ গাও।'

মদনা বললো, 'ভুষণ ভাই—ধরে দাও মোদের ষষ্ঠি মঙ্গল।'

গোলমালের মধ্যে গান সুরু হলো। ভুষণা গান ধরে নাকী গলায়—আর সবাই দোয়ার ধরে দেয়।

দারা দারা দারা দারা গো দারা দারা দারা।
যার কোলে পুত্র নাইগো জীয়ন্তে সে মরা।
আকাশেতে চন্দ্র নাই গো কি করিবে তারা।
দারা দারা দারা—

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে সখী। শুনতে শুনতে মুখটা কেমন যেন থমথমে হয়ে আসে আস্তে আস্তে। বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে।

নফরের চোখে পড়ে ব্যাপারটা। গানে আর গাঁজার নেশায় সবাই মশগুল। মহাজন চোখ বুজে তবলায় চাঁটি মারছে। নফর আস্তে আস্তে তার বাঁশীটা নিয়ে আড্ডা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে চোখ তার খোঁজে সখীকে।

'গান শুনতে শুনতে চলে এলে যে!' নফর বলে উঠলো সখীর পেছন থেকে।

দাওয়ায় অন্ধকারে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে ছিল সখী—নফরের কথায় চমকে ফিরে তাকালো। একটু হেসে বললো, 'শুনতে ভাল লাগলোনি।'

তবু তারা গাইছে। একটানা বিষণ্ণ সুর একটা ছড়িয়ে পড়ছে ঘর থেকে বাইরে—হা-হা করা মাঠের শূন্যতায়—অন্ধকারে :

দারা দারা দারা দারা গো।
যার কোলে পুত্র নাই গো জীয়ন্তে সে মরা ॥
দারা দারা ...

নফর চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ সখীর দিকে—অন্ধকারে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'মোর সাঙাতের কি হলো বলো দিকিন—এলোনি কেন ?'

'কি জানি।'—

'তুমি জানো না ?'

'না।'

'মোকে বলবেনি ?'

হাসতে লাগলো এবার সখী—তার সেই ক্ষ্যাপা হাসি। বললো, 'কি বলবো ?'

'কবে যাবে তোমরা এ চর ছেড়ে—সেই কথাটা জানতে চাই। বলো মোকে ?'

'হায় গো, জানি না হয় চাষের জমিন নাই—কিন্তু মোর স্বামীর ভিটাটা তো আছে এখনো ! কোথায় যাবো ফেলে ?'

'ও তা'—বলে নফর চুপ করে গেল।

সখী বললো, 'এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। মাহাজন তো আছে কদিন ধরে—টাকা-পয়সা দিচ্ছে।— সাহস দিয়ে বলেছে—ভয় নাই সখী, যতদিন আমি আছি।'—

'ওঃ'—বলে থেমে যায় হঠাৎ নফর। তারপর আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সখী দাঁড়িয়ে রইলো তেমনি অন্ধকারে। ভাগীরথীর জলে ভেজা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া হু-হু করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার স্তব্ধ মূর্তিটার ওপরে। আর ক্লান্ত বিষণ্ণ সুর একটা সেই হাওয়ায় ছড়িয়ে ছত্রখান হয়ে যায় সখীর চোখের সামনের আদিগন্ত অন্ধকারে, মাঠে—আকাশে :

দারা দারা দারা দারা গো ...

সখী দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে। মন তার কেমন করছে। পুত্র নাই—জমি নাই। আরও একজন নাই—সে একটা যেন রূপবর্ণহীন পুরুষ। হঠাৎ এই মুহূর্তে চোখের সামনে বিশ্বসংসারটাকে কেমন শুধু 'নাই নাই' মনে হয়। সবটা যেন দূর থেকে ভেসে আসা ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাসের মতোই—ফাঁকা, অস্তিত্বহীন—ঠাণ্ডা।

গান থামলো বেশ রাত করে। আড্ডা ভেঙে গেল তারপর। চলে গেল একে একে। সখী বসে রইলো এক ভাবে স্তব্ধ হয়ে। হরেকেষ্ট পেছনে থেকে ডেকে বলে দিল সকলকে :

'কাল ফের এসো সব।'

সখী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

হরেকেষ্ট মেজাজে আছে। বসে বসে গল্প করে সে আজ খোস মেজাজে। সখীকে উদ্দেশ করে বললে, 'নাঃ, ইচ্ছে করে না আর ঘরে ফিরে যেতে সখী। সাধ হয়—থেকে যাই তোমাদের এই চরে চিরটা কাল—তোমার এই ঘরে।'

সখী কোন কথা বললে না।

হরেকেষ্ট একাই কথা বলে। বলে তার সাধ-আহ্লাদের কথা। তারপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে :

'ঘর আমার তো সেই শ্মশান!'

'তবু তো ঘর মাহাজন।' সখী বললো শেষ পর্যন্ত।' 'জমি, গোরু, লোক-জন—ঘর ভর্তি সংসার তোমার। বরং শ্মশান হলো মোর ঘর।'

'তা বটে। তোমার সব ফাঁকা, আর আমার সব থাকতেও কিছু নাই। তাই ভাবি'—কি ভাবে মহাজন, তা আর বলে না, থেমে যায় হঠাৎ গতকালের মতোই। সখীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে কি যেন। তারপর কথা বলে আপনিই—আস্তে আস্তে, আক্ষেপোক্তির মতো :

'এমন লোক যদি একটি কারুকে পেতম—বুড়া বয়সটায় দেখতো শুনতো আমাকে।' আবেগে বলে হরেকেষ্ট, 'সব দিতম তাকে—আমার জমি-জায়গা, গোরু—যা আছে।'

সখী মুখ টিপে হেসে বললো, 'তোমার ছেলেরা কি ভেসে যাবে মাহাজন ?'

অন্ধ আবেগে হরেকেষ্ট বললো, 'ত্যাগ ক'রে দিতম ব্যাটাদের।'

'দিতে ?'

'নিশ্চয়ই দিতম। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি সখী, এই তোমার গা ছুঁয়ে'—বলতে বলতে হরেকেষ্ট উঠে গিয়ে সখীর একটা হাত চেপে ধরলো আবেগে।

সখীর সেই পাগলা হাসি ফেটে পড়লো এবার। হাসতে হাসতে বললো, 'কি করবে না-করবে—তা মোকে অতো করে বলছো কেন মাহাজন! মোকে নিয়ে যাবে নাকি গো ?'

'চল সখী—সুখে রাখবো।' হরেকেষ্ট মনের তাতানো কথাগুলি বলে যায় পাগলের মতো, 'সব দেবো—যা আছে মোর। আমি সব লিখে দিয়ে যাবো। খুব ভালো করে চিন্তা বিবেচনা ক'রে দেখেছি আমি, চল আমার সঙ্গে। ঘর-সংসার, জমি-জায়গা, গোরু-বাছুর সব তোরই হবে।'

'হায় গো মা'—

হাসতে হাসতে সখীর দম বন্ধ হয়ে যাবে বুঝি। কোথায় ঘর-সংসার, জমি-জায়গা, গোরু-বাছুর—পাগলা হাসির তোড়ে সব ভেসে গেল কোথায়। এ যেন সেই উচ্ছ্বসিত ভাগীরথীর খর ধারা।

তার সামনে বুড়ো হরেকেষ্ট তার স্থাবর অস্থাবর ঐশ্বর্য আর অন্ধ আবেগ নিয়ে যেন থৈ পায় না—দাঁড়াতে পারে না কোথাও।

৮

পরের দিন বিকেলের দিকেই হরকেষ্ট মহাজনের পাঁচ শ' মণি কিস্তি বোঝাই শেষ হয়ে গেল।

হরেকেষ্ট গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সকলকে ডেকে বললো, 'সন্ধ্যের দিকে এসো সবাই হে—প্রাণ খুলে আজ গাওন-বাজন করা যাবে।'

মদনা বললো, 'আজ আর হলোনি মহাজন। মোরা কেউ আসতে পারবো নি।'

'কেন?'

'মোদের অস্তাদ আজ নূতন ঘরে যাবে যে! গাওন বাজন সেখানেও হবে জোর, আবার খাওন-দাওনও আছে। করকরে পাঁচ গণ্ডা টাকা বেঁধে মোনা গেছে রাজার হাট।'

মোনা গেছে হাট-বাজার করতে। ওস্তাদ কুড়িটি টাকা তুলে দিয়েছে হেসে তার হাতে—খাও দাও ফুর্তি করো। পুবচর আর পশ্চিম চরের ছোকরারা—যারা মাটির সঙ্গে মেশা মুখি রাঁড়ীর পড়ো ভিটের ওপরে খাড়া করেছে নতুন ঘর, তাদের সবাই গিয়ে আজ যোগ দেবে ওস্তাদের নতুন গৃহপ্রবেশের উৎসবে।

মহাজন একটু মুষড়ে পড়ে বললো, 'ভেবেছিলম শেষ দিনটা একটু আমোদ আহ্লাদ করে যাব হে—তা আর হলো না।'

'কখন যাবে মহাজন ?'

'ভোর রাতেই জোয়ারের মুখে নৌকা ছেড়ে দেবো ভাবছি।'

'ফের কবে আসবে ?'

'বর্ষা নামার আগেই আসবো আর এক ক্ষেপ।'

'আবার এসো—তখন হবে গাওন-বাজন আবার। আজ ওস্তাদের ঘরে মোরা সবাই বাঁধা।'

মোনা ভার নিয়েছে হাট-বাজারের, ভুষণা রসুইয়ের। জোগাড়-যন্ত্রে হাত লাগাবে আর সবাই। ওরা চলে গেল হাঁক-ডাক ক'রে। ওদের কলরব মিলিয়ে গেল দূরে। খালের ধারটা থম্‌থম্ করে নির্জন স্তব্ধতায়। শুধু সোঁ-সোঁ হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসে ভাগীরথীর একটানা কলোচ্ছ্বাস।

বুড়ো হরেকেষ্ট মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে মন্থর পায়ে এগোল সখীর কুঁড়ের দিকে। কেমন যেন ভয় করে আজ ওই কুঁড়েটাকে। কে জানে—তার মন-মরা মুষড়ে পড়া ভাব দেখে ওই প্রাণোচ্ছল মেয়েটা কালকের মতো খলবল ক'রে হেসে বলে বসবে হয়তো :

'ঘরে ফিরে যাচ্ছ মাহাজন—তা অমন মুখপোড়ার মতো মুখ ক'রে আছ কেন গো ?'

কি জানি, সখীকে আজ কেমন তার ভয় করে।

সন্ধ্যে নেমে আসছে মাঠ-প্রান্তর জুড়ে। দিনের আলো ফিকে হতে হতে ঘোলাটে হয়ে আসছে অন্ধকারে।

মাঠের ওপারে পশ্চিম চরের একপ্রান্ত থেকে অনেকগুলি মানুষের জড়ানো কলকণ্ঠের শব্দ থেকে থেকে ভেসে ভেসে আসে দম্‌কা হাওয়ায় সন্ধ্যার নিঃসাড় স্তব্ধতার মাঝখানে। ওস্তাদের গৃহপ্রবেশের আনন্দ কোলাহল। সেইদিকে চেয়ে একটু থম্‌কে দাঁড়ায় হরেকেষ্ট। সামনে ধু-ধু করছে বৈশাখী সন্ধ্যার মাঠ। হাওয়া উঠেছে—মাঠের ওপর

দিয়ে বয়ে চলেছে একটানা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে সব কিছু। দিগন্ত জোড়া কেমন একটা পরিব্যাপ্ত শূন্যতা। এর মাঝখানে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হাবার মতো দাঁড়িয়ে রইলো হরেকেষ্ট। এই চরে—আজকের এই সন্ধ্যাটা তার সমস্ত গুরুভার গুমোট নিয়ে যেন সবলে চেপে ধরেছে বুড়ো হরেকেষ্টকে।

…না—সখী যাবে না তার সঙ্গে। সে হেসে উঠলো।…

মাঠের ওপারে ওস্তাদের নতুন ঘরের দাওয়ায় তখন পুবচর আর পশ্চিম চরের ছোকরাদের সবল কণ্ঠ ফেটে পড়ছে থেকে থেকে : চরে একটা নতুন ঘর খাড়া করেছে তারা—হরি মণ্ডল আর তার সাঙ্গপাঙ্গ বুড়ো লোকগুলোর নাকের ওপরে।

তুলসী সারাদিন ধরে ঘষে মেজে নিকিয়ে ঝকঝকে তকতকে ক'রে তুলেছে নতুন ঘরের দেয়াল আর মেঝে। দীন দাসের ঘর থেকে ওস্তাদের পোটলা পুঁটলি বয়ে আনছে মদ্না। কিছু কাপড়-চোপড়, একটা তোরঙ্গ, বেহালাটা, এই রকম কয়েকটা জিনিস—ওস্তাদের সম্পত্তি। এক ক্ষেপেই সব চলে এসেছে।

'গন্ধমাদন আনলম গো। কোথায় গেল দীন দাসের ঝি—গুছিয়ে তোলো সব।' —মদনা উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লো।

জিনিস-পত্র গুছিয়ে তুলতে লাগলো তুলসী। একটি মাত্র ঘর—তার ভেতরে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগলো সব। কোনোটা হয়তো এক-বারে পছন্দ হয়নি—টেনেটুনে রেখেছে আবার।

'মা গো মা, তুই কি আজ থেকেই এই ঘরে শুবি না-কি লো!' পড়শী মেয়ে মাত্‌নি এসেছিল তুলসীকে সাহায্য করতে—ঠাট্টা করে বললো।, 'অবাক করলি তুই।'

'মুখে আগুন তোর।' তুলসী গাল পেড়ে গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, 'এই যে করে দিয়ে গেলম, তারপর কাল এসে দেখে যাস—সব ছড়িয়ে ছত্রখান।'

তোরঙ্গটা এক কোণ থেকে আর এক কোণে নিয়ে রাখলো তুলসী। তারপর একটা পুঁটলি খুলে কাপড় চোপড় গুছিয়েছে দড়ি টানিয়ে। পুঁটলি থেকে মাত্‌নি টেনে বের করলো কতকগুলো শুকনো ফুলের মালা।

মাত্‌নি বললো, 'শুকনো মালাগুলো টেনে এনেছিস কেন লো? ফেলে দিই?'

হাঁ-হাঁ করে উঠলো তুলসী। বললো, 'ফেলিসনি। গুছিয়ে রাখছি আমি সব।'

'কি হবে শুকনো মালা?'

'থাক। দিয়েছিল লোকে একদিন বেহালা শুনে আদর করে।' তুলসী মালাগুলো এক এক করে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বলতে লাগলো, 'এই মালাটা দিয়েছিল নন্দিগ্রামে, এই মালাটা এনেছিল বড় চক থেকে, এই মালাটা কমলপুরের।'

'বাস্‌রে! মনে করে রেখেচিস সব!'—

তুলসী হাসলো।

মাত্‌নি জিজ্ঞেস করলো, 'তোদের কবে হবে ভাই?'

তুলসী অন্যমনে বললো, 'কি হবে?'

মাত্‌নি বললো, 'মর ছুঁড়ি—কি আবার! মালা বদল লো?'

'দে না বদল করে—মালা তো তোর হাতেই আছে।'

'আমার সঙ্গে নয় লো—সেই আর এক জনের সঙ্গে।' মাত্‌নি বললে, 'আচ্ছা—একটা সত্যি কথা বল্‌বি?'

'বল্‌?'

মাত্‌নি অদম্য কৌতূহলে বললে, 'এক ঘরে তো ছিলি এতদিন। বিয়ে-সাদি হবে তোদের—এ যেমন তোরাও জানিস্‌ মনে মনে, তেমন গাঁয়ের আর পাঁচ জনেও জানে। তা কোনো দিন ফাঁকে ফুঁকে আদর-সাদর করে নি তোকে অস্তাদ এক-আধটুকুন?'

তুলসী লালচে মুখে বললে, 'বরং মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে।'

'তুই কি করেচিস?'

'কি করবো?'

'মর ছুঁড়ি!' মাত্‌নি একটা মেয়েলী রসিকতা করে তুলসীর গাল টিপে দিল। বললো, 'তোদের বিছানাটা কিন্তু ভাই ওদিকে না পেড়ে এদিকে পাড়লে ভালো হতো।'

'আমি কি আজই শোবো নাকি?' চটেনি তুলসী—হেসেছে। লজ্জায় আর শ্রীতে বৈরাগী ফকিরের ঘরের একটি মেয়েও যে কতখানি অপরূপ হয়ে উঠে—মাত্‌নির গেঁয়ো চোখেও তা হঠাৎ ঝল্‌কে ওঠে। চেয়ে চেয়ে সে বলেছে:

'একটা কথা বলবো?'

'কি?'

'তুই সুখী হবি ভাই?'

তুলসী অন্য কথা পেড়ে বললো, 'এখন বেহালার ঝোলাটা ঝুলিয়ে রাখতে হবে মোর ওস্তাদের।'

'ওই তো যেখেনে কাপড় রেখেচিস—রাখ্‌ না ওইখেনে।'

'ওখেনে বিচ্ছিরি—এক-গাদা কাপড় চোপড়ের মধ্যে ঢাকা পড়ে যাবে।'

'ভারি তো বৈরাগীর মতো এক ঝোলা।'

'বৈরাগী মানুষের ওই তো সম্পত্তি ভাই।'

'তবে রাখ কোথায় রাখবি।'

'এইখেনে সামনে রাখি।'—

নতুন পেরেক পুঁততে লাগলো তুলসী। হঠাৎ কোথায় বেতালা লেগে গেল—অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো একটা :

'উঃ।'

'কি লো, লাগলো ?'

কেমন করে বাড়ি একটা পড়েছে কব্জিতেই। ভেঙে গেছে কাঁচের চুড়ি এক গাছি। কাঁচের ভাঙা টুকরো লেগে কেটে গেল হাতটা। রক্ত চুইয়ে পড়ছে কাটা মুখ দিয়ে। কিছুটা রক্ত গিয়ে লেগেছে দেয়ালে। ভাঙা চুড়িটা পেরেকের মাথায় গলিয়ে দিয়ে তুলসী বললো, 'দে এবার বেহালার ঝোলাটা ঝুলিয়ে।'

মাত্‌নি বললো, 'আজকের দিনটাতেই রক্তপাত করলি !'

'কি হবে ভাই !' কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকালো তুলসী।

মাত্‌নি ভারিক্কি স্বরে বললো, 'ভালো নয়। এ ঘর-দোর তো তোরই—আজ না হলেও দু-দিন বাদে হবে। সেই ঘরে তোর অস্তাদ আজ সবে ঢুকছে—লতুন। এমন দিনে রক্তপাতটা ভালো নয়।'

'কি হবে !' আবার জিজ্ঞেস করলো তুলসী—চোখে তার নির্বোধ ভয়, অমঙ্গলের ছায়া।

মাত্‌নি ছেলে-পুলের মা, প্রবোধ দেয় পাকা বয়সীর মতো। তবু কেমন একটা ফাঁকা জায়গা থেকে যায় দূর ভবিষ্যতের দুর্জ্ঞেয় গর্ভে। সেখানে নানান অমঙ্গল যেন কিলবিল করছে তুলসীর ফাঁকা চোখের সামনে। তারপর সবটা চাপা পড়ে যায় কোথায়—নতুন ঘর সাজানোর আনন্দের মাঝখানে। গ্রামের অত্যন্ত সরল একটি কুমারীর ভালোবাসা—ছোট্ট একটু জগতের মাঝখানে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে যেন হদিস পায় না। একটি লোককে সে মনে মনে ভালবাসে—যে এসে থাকবে এই ঘরে, যে লোকটি এ গ্রামের সবার

প্রিয় মানুষ, আরও অনেক গ্রামে যার ছড়ানো সুখ্যাতি, আর তারই এই ঘরে একদিন পাতবে সে ঘর-সংসার। এ সমস্তটার মাঝখানে সে আজ মশ্‌গুল। তার জেগে ওঠা মনের অসংখ্য ছোটখাটো কল্পনার তোড়ে কোথায় ভেসে যায় দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কা। তার ছোট্ট জগতটুকুর মাঝখানে অনাগত ভাবীকাল যেন উছলে উছলে উঠছে অফুরন্ত প্রেমে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে আর আনন্দের অসীমতায়।

'কোথায় গেলে দীন দাসের ঝি—হাট-বাজার তোলো।' মোনা ফিরে এসেছে বিরাট এক ঝাঁকা ভরে হাট-বাজার করে।

জিনিস পত্র ঘরে তোলবার জন্যে বেরিয়ে এলো তুলসী—এ ঘরের বউটির মতোই। এ তারই ঘর, তার সংসার—তার ভালোবাসা।

সন্ধ্যের মুখোমুখি চরের ছোকরারা এসে পড়ে সবাই। নতুন দাওয়ায় আড্ডা জমে যায় জম্‌জমাট হয়ে। হাতে-কাটা তামাকের কড়া ধোঁয়ায় হাল্লা করে ছোকরারা।

ভুষণা বললো, 'ঘর বসতের দিনে মোদের একটু বেহালা শুনিয়ে দাও অস্তাদ।'

'ঠিক।'

সমর্থন আসে সব দিক থেকে।

নফর বললো, 'আমি ভাই আগাম বাঁশী নিয়ে এসেছি।'

মদনা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আমি আনতে গেলম চৌকিদারের ঢোল। সঙ্গত আরম্ভ করে দাও তুমরা।'

কিছুক্ষণ বাদেই ফিরে এলো মদনা ঢোল নিয়ে। বললো, 'জোর করে কেড়ে আনলম শালার ঢোল।'—

পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে চৌকিদার। বললো, 'ফাঁসিয়ে দেবে—ফাঁসিয়ে দেবে তুমরা মোর সরকারী ঢোলটাকে! মোর কোরোক-পরোয়ানার ঢোল'—

'রাখ তোর কোরোক পরোয়ানা। এ ঢোল আর ভিটে কোরোকে বাজাতে হবেনি, এ বাজবে ঘর বসতে। শালার শুদ্ধ করে। দিই।'

চৌকিদারকে ধরে বসিয়ে দিল সবাই। তারপর হাল্লা ফেটে পড়লো একটা।

সুরু হয় সঙ্গত। বাঁশী, বেহালা আর ঢোলের ঐকতানে মাঠের দেশের পরিব্যাপ্ত অন্ধকার মুখরিত হয়ে ওঠে সহসা। বেহালার তারের ওপরে ছড়ির টান পড়ে হিন্দোলিত ছন্দে। তার দোলায় দোলায় নফর ফণা তোলা সাপের মতো দোল খায় মুখে বাঁশী নিয়ে, দোল খায় অনেকগুলি দেহ—আর একটি ঘরের কোণে কুমারী মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ। সেই তালে তালে হঠাৎ মদনা ঢোল ফেলে নাচতে সুরু করে দেয় কোমরে দু-হাত দিয়ে। ফেটে পড়ে হাসির হর্রা।

মদনা বলে উঠলো, 'ই না হলে গাওন-বাজন! গা-গতর মোদের লাচিয়ে দিলে গো অস্তাদ! আর মহাজনের আখড়ায় দুদিন গ্যাঁজা খেয়ে খেয়ে গা গরম করেছি মোরা!'

পশ্চিম চরের হিন্দোলিত ঐকতান আর থেকে থেকে ফেটে পড়া হর্রা দম্‌কা বাতাস ঠেলে হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়ে পুবচরের একটা থমথমে কুঁড়ের ভেতরে—সখীর ঘরে। বেকার বসে আছে হরেকেষ্ট—হাঁটুর ভাঁজে মুখ গুঁজে বসে আছে গুটিসুটি মেরে ডানা গুটোনো চামচিকের মতো।

সখী খিল খিল করে হেসে উঠলো একবার তার দিকে চেয়ে।

হরেকেষ্ট ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো, 'হাসলে যে!'

সখী বললো, 'আজ এখেনে আখড়া নেই—মন মেজাজ তোমার খারাপ মাহাজন। তাই হাসছি।'

মহাজন চুপ ক'রে রইলো।

সখী বললো, 'ওদের নতুন ঘর-বসতের আনন্দ!'—

'হ্যাঁ।' বলে একট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো হরেকেষ্ট।

সখী ফের হেসে উঠলো। বললো, 'ঘরের কথা খুব মনে পড়ছে তোমার—না মাহাজন?'

'আমার আবার ঘর!' বলে একটা হাই তুললো হরেকেষ্ট ও প্রসঙ্গ চালিয়ে আর তার বেইজ্জত হওয়ার ইচ্ছে নেই এতটুকু। চুপ করে রইলো।

সখী কিন্তু খোঁচা মেরে বললে, 'তবে যাওয়ার জন্যে অতো তাড়াহুড়ো কিসের? আজ রাতে না গেলেও তো চলে।'

'নৌকার মাল খালাস করতে হবে তো! কখন আবার দাম পড়ে যাবে ধানের—ঠিক কি।'

সখী বললো, 'এবার ঘরে গিয়ে চুপচাপ ক'রে বসো মাহাজন। জলের ওপর ভাসবে আর কেন বলো? তোমার অভাব কি?'

মহাজন চুপ ক'রে রইলো, ভয় হয় তার কথা বলতে। কি বলবে —আর সখী হয়তো হেসে উঠবে ফের খিল খিল করে।

সখী জিজ্ঞেস করলো, 'গাই-গোরু বলদ তোমার ক'টি আছে মাহাজন?'

'চল্লিশটি।'

'ছাগল?'

'তা হবে গোটা পঁচিশ।'

'বাপরে! এর ওপর জায়গা-জমিনও অনেক। বুদ্ধি শোনো মোর—ঘরে গিয়ে এবার চুপচাপ বসে থাকো মাহাজন।'

'ঘর যেন গিলতে আসে আমাকে। তাই তো ঘুরে বেড়াই বাইরে বাইরে।'

'ঘরে টেকে না মন—না ?' সখী জিজ্ঞেস করলো নিচের ঠোঁট কামড়ে।

তার মুখের দিকে চেয়ে হরেকেষ্ট ভয়ে ভয়ে বললো, 'তোমাকে তো সব বলেছি একদিন সখী। আমার সে দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না গো।'

সখী বললো, 'মনের মতো লোক যদি পাও সেবা যত্ন করবার, তবে কি করো ?'

সুরু থেকেই মেয়েটা যেন খেলার ছলে খুঁচিয়ে কথা বাড়াচ্ছে শুধু। রাগ হয় হরেকেষ্টর—কিন্তু সখীর সেই বেমক্কা পাগলা হাসির ভয়ে চুপ ক'রে থাকে। কথা ঘুরিয়ে অত্যন্ত উদাস ভাবে বললো, 'কোথায় পাবো তেমন লোক বলো ?'

'ধরো—আমিই যদি যাই।'

'তুমি তো যাবে না।'

'তোমার অতো গোরু ছাগল ধন দৌলত—জমি জায়গা—এ সব সত্যি সত্যি পেলে যেতে পারি।' বলেই হাসতে লাগলো সখী।

মহাজন বলে ফেললে, 'তোমার ওই হাসিকে আমার ভয় লাগে। ভয় লাগে তোমাকে বাপু।'

'তাই তো ঠিক করেছি গো মাহাজন—যাবো তোমার সঙ্গে। রাত হলো—এখন ওঠো। খেয়ে লাও। নৌকা তো ছাড়বে শেষ রাতে ?'

'হুঁ। প্রথম জোয়ারে।'

'তবে খাওয়া সেরে ঘুমোও।'

হরেকেষ্ট ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো সখীর মুখের দিকে। অনেক কথা হলো—সেই সবগুলো যেন এখনও বোঝবার চেষ্টা করছে

হরেকেষ্ট সখীর মুখের ভাবভঙ্গী দেখে। মনে হলো তার—এ রহস্যময় মুখে মেশানো আছে বেপরোয়া শাণিত হাসি—আছে কিছুটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী গাম্ভীর্য। এর ভেতর থেকে কোনো কিছুই সে যেন বুঝতে পারলো না।

আর একটি কথাও বললো না সে। সখীও চুপচাপ। খাওয়া দাওয়া সেরে মহাজন গিয়ে শুয়ে পড়লো তার বিছানায়। ঘুমোবার চেষ্টা করলো জোর করে চোখ বুজে। কে জানে—জেগে থাকতে দেখলে সখী হয়তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেড়ে বসবে আবার সেই পুরোনো প্রসঙ্গ খেলার ছলে।

আলো নিভলো। সখী শুয়ে পড়েছে তার বিছানায় গিয়ে। রাতও হয়েছে বেশ। রাতের অন্ধকারকে তখনও মুখর করে রেখেছে বেহালা আর বাঁশীর ঐকতান। সুরের সে এক ছন্দ হিল্লোলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে দমকা হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসা ভাগীরথীর নিরবচ্ছিন্ন কলোচ্ছ্বাস। সবটা কেমন অদ্ভুত আর করুণ লাগছে হরেকেষ্টর। সখীর একটা ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কেঁপে উঠলো অন্ধকারে। মনে হলো, সে যেন বিছানায় পাশ ফিরে শুলো। ঘুমোবার চেষ্টা করলো হরেকেষ্ট। জোয়ার এসে লাগলেই দাঁড়ি মাঝিরা ডাকতে আসবে তাকে। ঘুমোতে হবে। সুরটা কাঁপছে তখনো। সখী আবার যেন পাশ ফিরলো। ঘরটা গরম লাগছে বেশ। অন্ধকারে চোখ মেললো হরেকেষ্ট। মনে হলো তার—সখী যেন আবার পাশ ফিরলো। শোনা গেল আবার একটা ভারী নিঃশ্বাস। গৃহপ্রবেশের উৎসব-প্রাঙ্গন থেকে তখনো ভেসে ভেসে আসছে কম্প্র সুর একটা।···সখী কি ঘুমোয়নি? তারও ঘুম ধরছে না। তবু মড়ার মতো পড়ে রইলো হরেকেষ্ট। কে জানে—সে জেগে আছে জানলে সখী হেসে উঠবে হয়তো আবার।

জোয়ার এলো শেষ রাতের দিকে। দাঁড়ি মাঝিদের একজন ডাকতে এলো হরেকেষ্টকে। ঘুম ভেঙে হরেকেষ্ট দেখলো, ঘরে আলো জ্বলছে। সখী উঠেছে আগেই। তার পোঁটলা পুঁটলি গুছিয়ে বেঁধে রেখেছে একপাশে।

হরেকেষ্ট ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো।

সখী বললো, 'পোঁটলা পুঁটলি সব নৌকায় নিয়ে যেতে বলে দাও মাহাজন।'

'হ্যাঁ। এই'—হরেকেষ্ট ডাকলো দাঁড়িটাকে।

কিন্তু হরেকেষ্টর দুটো বুঁচকির ওপরে নতুন বোঁচকা একটা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো মহাজন, 'ওটা কার দিলে?'

'আমার।' বলে সখী দাঁড়িকে বোঁচকা তুলে দিয়ে বিদায় করে দিল।

হরেকেষ্টর বিস্ময় যেন তখনো কাটেনি। বললো, 'তোমার?'

সখী হেসে বললো, 'তোমার সঙ্গেই যাব মাহাজন। এখেনে আমার আর কি আছে বলো।'

'সত্যি তুমি যাবে?'

'তবে? দেখবো তোমার ঘর-সংসার। তোমার কথা মতো সে সব তো আমারই।' সখী হাসলো।

'হ্যাঁ তোমার, তোমার ছেলেপুলে হলে সে সব তাদেরই। এই সত্যি ক'রে বললাম শেষ রাত্তির বেলা।' হঠাৎ বিচলিত হয়ে বলে ফেললে বুড়ো লোকটা।

'ঠিক?'

'ঠিক সখী।'

ওরা বেরুলো ঘর থেকে দু-জন। সখী জীর্ণ বাঁশের দরোজায় বাইরে থেকে শেকলটা তুলে দিয়ে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্ত—স্তব্ধ হয়ে। সামনে প্রান্তর আর আকাশ জোড়া অথৈ অন্ধকার।

হরেকেষ্ট মৃদু কণ্ঠে বললো, 'চলো।'

সখী হঠাৎ ঘুরে টিপ করে একটা গড় করলো তার কুঁড়ের দাওয়ায়। বললো, 'মোর সোয়ামীর ভিটে—একটা গড় করে যাই মাহাজন।'

সেই অস্ফুট কথা একটু উড়িয়ে নিয়ে গেল ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাসে ভেজা দমকা বাতাসে। আর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। এতটুকু চিহ্ন নেই চেনার। গাঢ় অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে এ চরের সমস্ত চেনা চিহ্নগুলি। এ চরে বউ হয়ে এসে ঢুকেছিল সখী—সে কবে? সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যেন। সেই নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকারে কোথায় কখন শেষ হয়ে গেছে সন্ধ্যের দোল খাওয়া সেই সুরের একতান! খালের উচু পাড়ের তলায় ছল্ ছল্ করছে শুধু খরবেগ ভাগীরথীর স্রোতধারা।

পরের দিন সারা চরে ছড়িয়ে পড়লো সখীর পালানোর খবর। নফর ছিল সখীর পড়শী—তাই তারই দাওয়ায় সকাল থেকে প্রায় ভিড় লেগে গেল কৌতুহলী চরের মেয়ে-মরদের। চরের বেকার দিন—এই সময়ে সাধারণত কাজকর্ম কম। আগামী ফসলের জন্যে লাঙল-বলদ নিয়ে তখনো চাষীরা মাঠে নামেনি ভালো করে।

এক কথাই সবাই শুধোয় এসে :

'এ্যাঁ—পালালো?'

সবাইকে একই জবাব দিয়েছে নফর, 'তাই তো দেখছি।'

'মহাজনের সঙ্গে?'

'তা কেমন করে জানবো বল?'

'কখন গেল?'

শেষ পর্যন্ত চটে গেছে নফর, 'মোকে বলে গেছে নাকি!'—

কিন্তু তার এ চটে ওঠাকে গ্রাহ্য করে কে! কৌতূহলে টইটম্বুর হয়ে আছে সবাই—তাদের অসংখ্য প্রশ্ন, হাজারো রকমের অনুসন্ধিৎসা। বিকেলের দিকে আবার এলো চরের বুড়ো বুড়ো কজন—হাতে প্রায় সকলেরই একটি করে হুঁকো, এলো দল বেঁধে জটলা পাকিয়ে। মায় বৈরাগী দীন দাস পর্যন্ত। তারা এসে জাঁকিয়ে বসলো নফরের দাওয়ায়। সকালের দিকে যারা খোঁজ নিয়ে গেছে একবার—তাদের মধ্যে থেকেও আবার এলো কেউ কেউ নতুন খবরের লোভে। এলো চৌকিদার ক্ষুদিরাম দাস। সন্ধ্যে নাগাৎ একটা রীতিমতো পঞ্চায়েত বসে গেল নফরের দাওয়ায়। সবার শেষে এসে দাঁড়ালো ওস্তাদ, সন্ধ্যের অন্ধকারে এসে হঠাৎ যেন ঘাবড়ে গেল অতগুলো লোককে বসে থাকতে দেখে। একলা পাবে নফরকে—এই আশা করে এসেছিল সে। হঠাৎ অতগুলো লোককে দেখে ফিরে যাবে কিনা ভাবছিল—এমন সময় নফর বসালো ডেকে:

'বসো সাঙাৎ।'

কয়েক মুহূর্তের জন্মে কেরোসিনের ম্লান আলোয় চোখে চোখ রাখলো দুই সাঙাৎ। একজনের চোখে প্রশ্ন—আর একজনের চোখে তার উত্তর: স্তব্ধ—থম্ থমে। এ শুধু বুঝলো ওরাই দুজন। একটা কোণ ঘেঁষে অস্তাদ তারপর বসে পড়লো ধপ করে।

ওস্তাদকে দেখেই যেন বুড়ো হরি মণ্ডলের মনে পড়ে গেল সখীর পালানোর একেবারে আদি কারণটা। বললে:

'সেই যে গাওন বাজনের ধুম পড়ে গেল কদিন এখেনে—চরের ছোঁড়ারাও জুটে গেল সব,' তখনই বুঝেছি, এই রকম একটা কাণ্ড ঘটে যাবে একদিন।'

'ঠিক।' পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ভৈরব দাস কথাটার সমর্থন করলো।

মুহুর্তের জন্যে চোখে চোখে চাইল আবার নফর আর ওস্তাদ। বোবা লোকের কথা নেই—কিন্তু নফর চটে যায়। বললে :

'তার মানে ?'

হরি মণ্ডল তার এই চটে ওঠাকে যেন গ্রাহ্য না করেই বলে চললো, 'বউ-ঝিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গো ! শালা যেন হাট বসে গেল চরে।'

ভৈরব দাস সঙ্গে সঙ্গে শোলোক কেটে বললে, 'সেই যে কথায় বলে—লৌকা নষ্ট ঘাটে, নারী নষ্ট হাটে।'

'বুঝে লাও তবে কথাটা।' হরি মণ্ডল তেরছা ভাবে বললো।

যে কজন ছোকরা এসেছিল, তারা সবাই চুপ করে আছে। এরা সবাই প্রায় আসতো সঙ্গতের আড্ডায়। সকলের মুখের দিকে একবার কটমটিয়ে চাইলো নফর—তারপর ফেটে পডলো রাগে :

'মোরা সব চরের বউ-ঝিদের নিয়ে রঙ্ তামাসা করতাম নাকি !'

'তা করোনি।' হরি মণ্ডল আস্তে আস্তে বললো, 'কিন্তু কেমন সব উদোম হয়ে ছুটলো যেন। এই তো দেখলম। বল, সত্যি কি-না ?'

সবাই চুপ করে আছে। হরি মণ্ডলের সত্যি কথাটা মনে মনে যেন সবাই যাচাই ক'রে দেখছে,—বিশেষ ক'রে সঙ্গতের আখড়ায় এসে যারা যোগ দিত। সন্ধ্যের জন্যে মনটা উসখুস করতো ঠিকই। বেরুতো একে একে। বউ-ঝিরা বলতো :

'চললে আখড়ায় ?'

'যাই একটুন।'

'অস্তাদ আসবে ?'

'আসবে।'

'মোরাও যাব একদিন। রোজ যাবে তোমরা—মোরা এক আধ দিন যাবনি কেন বলো ?'

'সঙ্গতের কি বুঝবি তোরা মেয়ে মানুষ ?'

এই জবাব পেয়েছে হয়তো সবাই। হয়তো কিছু বুঝতো না তারা। তবু বলতো। ইচ্ছে হতো হয়তো। ওস্তাদের বেহালা হঠাৎ এই চরের মেয়ে মরদের মনে ক'দিনের জন্যে যেন বাঁধন-ছেঁড়া একটা সুরের মাতলামী ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চাষাভুসোর সামান্য জীবন—মেয়েমানুষের একঘেয়ে ঘরকন্না-গেরস্থালী আর পুরুষের মেঠো কাজের দিন। এর মাঝখানে গান আছে, সুর আছে, আনন্দ আছে—এ তারা জানতো না কোনো দিন। হঠাৎ সেই গঙ্গা-পুজোর আসর থেকে ওস্তাদের বেহালাকে কেন্দ্র ক'রে সুরু হয়ে গেল যেন চরের নতুনতর একটা জীবন-ধারা। মন কাঁপানো গতর নাচানো কতকগুলো বিচিত্র সুর এতগুলো মেয়ে মরদের মন নিয়ে যেন খেলা সুরু করে দিল। কি যে বলে একটা বোবা মানুষের বোবা সুর—কান পেতে শুনেছে মেয়েরা, নাচন-কুঁদন করেছে মরদেরা। সবটা মিলে হঠাৎ জেগে ওঠা একটা আনন্দের হুল্লোড় বয়ে গেছে সারা চরের ওপর দিয়ে।

হরি মণ্ডল চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'ই সব ব্যাপারে এই রকমই হয় বাপা। একটা কেলেংকারী—পীরিতের কাণ্ড কারখানা !'—

নফর চটে বললো, 'কেন ?'

'কেন জানি না।' হরি মণ্ডল বললো, 'তবে এই রকম হয়। ক'দিন দেখলাম তো বউ-ঝি গুলানকে।'

হ্যাঁ। বুড়ো অভিজ্ঞ চোখে হরি মণ্ডল ঠিকই দেখেছে বটে—এ চরের মেয়েগুলো পীরিতের মন নিয়ে জেগে উঠেছিল যেন হঠাৎ। কোন এক অতর্কিত আনন্দের অস্বাভাবিক জীবনই একটা এসে উঁকি দিয়েছিল এদের জীবনে।

হরি মণ্ডল বললে, 'ওই তো ভুষণ দাসের ঘরে ঝগড়া লেগে যেত শ্বাশুড়ী-বউয়ের এই ব্যাপারে। কতদিন শুনেছি। বলুক না ও— সত্যি না মিথ্যা !'

ভুষণা মুখ নীচু করে বসে রইলো। মনে পড়ছে তার পুরাণো কথা।

ভুষণ দাসের বৌ বলেছিল একদিন, 'অস্তাদ না হয় বেহালা বাজায়। তোমরা করো কি ?'

'কেন, মোরা গান গাঁই—ঢোল বাজাই।'

'গান গাও তুমি !'

ভুষণা চটে বলেছিল, 'তবে ?'

'কোনোদিন শুনিনি তো তোমার মুখে !'

'গাইব একদিন—শুনবি। ষষ্ঠি মঙ্গলের গান জানি।'

কিন্তু তার শোনাবার আগে ভুষণার বউই গেয়ে শুনিয়ে দিল সে গান তখন-তখনি। বছর দুয়ের ঘুমন্ত ছেলেটা কেঁদে উঠেছিল হঠাৎ। তাকে আদর করে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে, দোল দিতে দিতে গুন্ গুন্ করে গেয়ে উঠেছিল ভুষণার বউ :

যার কোলে পুত্র নাই গো জীয়ন্তে সে মরা।
আকাশেতে চন্দ্র নাই গো কি করিবে তারা॥

ভুষণা ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, 'পাশের ঘরে মা ঘুমায়—শুনতে পাবে।'

বউটা ফুট কেটে শ্বাশুড়ি-বউয়ের উপাখ্যান গেয়ে উঠেছিল :

বউর হৈল কাঞ্চন থালা ব্যঞ্জন সারি সারি।
বুড়ির হৈল ভাঙা পাথরটি পান্তা গুটি চারি গো॥
দারা দারা ...

হ্যাঁ, গানের মাতলামী ঢুকেছিল চরে—ঘরে ঘরে, বউ-ঝিদের গুন্‌গুনানিতে।

হরি মণ্ডল বললে, 'আরও অকাট প্রমাণ ছাখো না—সখীর কাণ্ড!'

নফর বললো, 'ই চর ছেড়ে যেন আর কোনো মেয়ে মানুষ পালায়নি কখনো। ওই তো শশীর বোন পালালো গেল বছর!—তোমারই তো জ্ঞাতি।'—

হরি মণ্ডল সে কথা চাপা দিয়ে চৌকিদারের দিকে চেয়ে বললে, 'এখন কি করা যায় বল দিকিন চৌকিদার?'

'বলো তো আমি ধরে আনতে পারি সাত দিনের মধ্যে।' চৌকিদার বললে, 'দাও মোকে দুটো ট্যাকা।'

হরি মণ্ডল টাকার কথায় খুব উৎসাহ দেখালো না।

অগত্যা চৌকিদার ঝপ ক'রে নেমে এলো তার চড়া রেট থেকে—বললে, 'আচ্ছা একটা ট্যাকাই দাও। হরেকেষ্ট মহাজনের সঙ্গেই গেছে সে নিশ্চয়। ধরে এনে হাজির ক'রে দিতে পারি তোমাদের সামনে।'

'তারপর?' নফর খোঁচা মেরে বললো, 'খেতে দেবে তোমরা তাকে? দেবে তাকে ঘর-সংসার, ছেলেপুলের আনন্দ? দেবে?'

হরি মণ্ডলেরা চুপ।

'বলো না—দেবে?' নফর চটে বললো, 'বেশ করেছে সে গেছে। কি ছিল তার এখেনে? কেন সে পড়ে থাকবে? কিসের জন্মে বলো? যার এখেনে আর কিছুই থাকে না—সেই পালায়। শশীর বোনও পালিয়েছে বিধবা হওয়ার পর। ওই ভৈরব দাসের মেয়েও তো গেছে একদিন। তখন তো মোদের সঙ্গতের আখড়া ছিল না!'

হরি মণ্ডল বললো, 'তা বটে। তবু তো স্বামীর ভিটে। যে-ই হোক, ছেড়ে চলে যাবে কোথায় না কোথায় সে ভিটে ছেড়ে?'

'ভিটেয় ঘুঘু চরলে—খাবে কি?'

সবাই চুপ ক'রে আছে।

নফর বললো, 'সখীর অবস্থায় পড়লে এ চরের সব কটা বউ-ঝিকেই কারুর না কারুর সঙ্গে পালাবার পথ খুঁজতে হবে। বালক কাল থেকে তো এই রকমই দেখছি।—বলো সত্যি কি-না? তুমি তো এ চরের পুরোনো লোক মণ্ডল, জানো সব।'

হরি মণ্ডল কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বললো, 'ভাগ্য—চরের মানুষের ভাগ্য এই। গাঙের ধারে বাস—সেই যে কি বলে শোলোকে—হাঁ গো ভৈরব?'

সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব দাস দাড়ি নেড়ে ছড়া কেটে বললে, 'গাঙের ধারে বাস—ভাবনা বারো মাস।'

হরি মণ্ডল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

সবাই চুপ করে আছে। বোবা চোখে চেয়ে চেয়ে হয়তো কিছু ভাবছে—হয়তো কিছু দেখছে, পড়ছে এই চরের সেই নির্মম ভাগ্যের কথাটা। ভাগ্য—এই এ চরের ভাগ্য! মাতব্বর হরি মণ্ডলও আর কোনো কথা বলতে পারে না যেন বুদ্ধি-বিবেচনা করে। চুপ করে যায়।

'ভাগ্য!' নফর বললো, 'তবে মোদের গাওন বাজনের দোষ দাও কেন?'

নির্মম এই ভাগ্যের মাঝখানে তবু কেন যে হঠাৎ কয়েকটা আনন্দের দিন এসেছিল সঙ্গতের আখড়াকে কেন্দ্র ক'রে!

হরি মণ্ডল বললো, 'এই ছাখ না মুখি রাঁড়ীর ভাগ্য!'

ভাগ্য!—সমস্তটা কেমন অসহ্য মনে হয় ওস্তাদের মায়ের কথা উঠতে। আর সে বসে থাকতে পারে না—উঠে দাঁড়ায়, বেরিয়ে আসে অন্ধকারে। নফরের কথা—মাতব্বর হরি মণ্ডলের কথা খোঁচা মারতে থাকে মনে: এই এ চরের ভাগ্য ··· কবে এ চরের সমস্ত বউ-ঝিগুলো হয়তো পালাবে সখীর মতো অন্য কারুর সঙ্গে! ···

আর সবাই তেমনি বসে থাকে নফরের দাওয়ায়—চুপচাপ। হরি মণ্ডল পুরোনো কথা তোলে :

'সন্ধি বরের কথা মনে পড়ে হে ভৈরব ?'

'মনে পড়ে বৈ কি।' ভৈরব দাস বললো, 'চর যখন হাঁসিল হচ্ছে তখন এসেছিল সে। মোদের পরের দলের লোক।'

'না, পরের দলে নয়—এসেছিল সে একলা।' হরি মণ্ডল চোখের সামনে তার কাহিনীটা তুলে ধরে যেন পড়ে যায় নির্ভুল ভাবে, 'একদিন হুট ক'রে সে এসে পড়লো কোথা থেকে। এক বগলে ছোট একটা পুঁটলি আর এক কাঁধে একটা জাল।'...

সে ছিল জেলে। হরি মণ্ডলকে এসে বলেছিল, 'একটু টঙ বেঁধে থাকবো মণ্ডলের পো।'

একজন লোক বাড়বে তবু—আনন্দের কথা। তখন এ চর আবাদ করছে মাত্র জনা পাঁচেক চাষী। হরি মণ্ডল খুশি হয়ে বলেছিল, 'বাঁধো কোথায় বাঁধবে টঙ।'

'মালিক ?'

'চরে লোক বাড়লে মালিক খুশি হবে গো।'

'মোর কিন্তু মাছ ধরা কাজ। খালের মুখে বোধহয় খুব মাছ হবে ?'

'মাছের কথা জানি না। ধাড়ী ধাড়ী কুমীর শুয়ে থাকে খালের মুখে দেখেছি।'

'মেছো কুমীর ?'

'কি জানি! মানুষ পেলেও খায় বোধ হয়—হালের বলদ তো টেনে নিয়ে গেছে মাঠ থেকে।'

'তবে ?' সন্ধি কি যেন ভেবেছিল থমকে।

'তোমার ঘর কোথায় ?'

'ঘর নাই।'

'কোথায় ছিলে এতদিন ?'

সিধে উত্তরে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'হলুদির চরে। সে চর ডুবে গেছে। তাই এ চরের কথা শুনে এলাম।'

'ছাখ মোদের চরের হাল। এখন যা ভাল বোঝ কর।' হরি মণ্ডল নিজেদের চর দেখিয়ে বলেছিল।

পলিমাটির নতুন ভরাট অনাবাদী চর একটা—হোগলা জঙ্গলে ভরা উঁচু নীচু খাদ আর ঢিপি। খালের মুখের নিস্তরঙ্গ বাঁকে কুমীরের আড়ৎ—রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে থাকে সারাদিন। আর ডাঙার ওপরে কিলবিল করে কাঁকড়া। নোনা মাটির পচা জলায় কেমন একটা আঁসটে গন্ধের গুমোট। দুর্বা ঘাসগুলো কেমন চিড়চিড়ে মেরে গেছে 'কহর' নোনায়—পায়ে ফোটে তামার পাতের কুচির মতো। নুন ফুটে বেরিয়েছে চিকন মাটির গায়ে—কে যেন খড়িমাটির পোঁচ টেনে গেছে চারদিকে।

'এই নোনায় চাষ হবে ?' সন্ধি বলেছিল।

'গতর থাকলে সোনা ফলবে।'

'আমি তবে রইলম মণ্ডলের পো।'

'খালের মুখ থেকে কুমীর ধরে ধরে বেচবে নাকি ?'

'চাষ করবো।'

'করো—পড়ে আছে জমি। যতো আবাদ করবে—মালিক খুশি হবে ততো।'

লোকটা কদিন হরি মণ্ডলের টঙে মাথা গুঁজে বানিয়ে ফেললো নিজের টঙ। লেগে গেল আবাদের কাজে। বছর দুয়ের মধ্যে চেহারা বদলে গেল চরের, ঝুপড়ি টঙ ভেঙে তখন এসেছে ঘর তোলার কাল। কপাল ফিরছে চরের চাষীদের। হঠাৎ একবার সন্ধি ধান কাটা শেষ করে চলে গেল কোথায় যেন।

গেল তো গেল। ধানের গাদা সাজিয়ে চলে গেল লোকটা। ফিরে এলো দিন পনেরো পরে। সঙ্গে একটা মেয়েমানুষ—গাঁট্টা গোট্টা।

'ইটি কে গো সন্ধি?' সবাই শুধালো অবাক হয়ে।

সন্ধি জবাব দিল, 'মোর বউ?'

মেয়ের বয়স কচি কাঁচা নয়—বেশ জোয়ান। কোথা থেকে এমন ধাড়ী একটা কাজের বউ আনলে সন্ধি—কারুর জানার উপায় নেই। সন্ধি শুধু বলতো :

'মোর বউ।'

'ওর বাপের ঘর কোথায় হে?'

'বাপ-মা নাই।'

এর বেশী আর কিছু বলতো না সন্ধি। চরে তখনো কেউ ঘর-সংসার পেতে বসেনি বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। তারা থাকে গ্রাম-দেশে—কজন চাষী শুধু থাকে একলা একলা—টঙ বেঁধে। বর্ষার সময় কয়েক মাস লোকজন এনে খেটে খুটে চাষ আবাদ করে চরে। এদের মধ্যে সন্ধি কোথা থেকে একটা বউ জুটিয়ে এনে পথ দেখালো সকলকে। ঘর-সংসার সুরু হলো এ চরে।

টঙ ভেঙে ছোটখাট একটা ঘর তুললো সন্ধি—মাটির দেয়াল দিল সে আর তার বউ। সন্ধি মাটি বয়ে এনে দেয়—বউ সেই মাটির চাপড়ি দিয়ে গেঁথে ফেললো দেওয়াল। তারপর নতুন খড় উঠলো চালে। ছোট মতো একটা ডোবা কাটা হয়ে গেল তার ঘরের সামনে। বর্ষা নামার আগে সন্ধি সব কাজ শেষ করে ফেললো বউয়ের সঙ্গে মিলে একেবারে পাকা চাষীর মতো।

শেষ পর্যন্ত মারা পড়লো সে মাছের লোভে। মাছ ধরতে গিয়ে একদিন সন্ধ্যে বেলা ফিরে এলো সে রক্তাক্ত হাত নিয়ে।

বউ বললো, 'হায় গো, একি হলো!'

'কাঁকড়া কাঁমড়েছে বোধ হয়। চুণ হলুদ লাগিয়ে দে একটুন।'

কাঁকড়া নয়, সাপে কামড়েছিল সন্ধিকে। সেই রাতেই শেষ হয়ে গেল সে। এই প্রথম লোক মারা গেল চরে। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে পালালো এ চরের প্রথম বউ—সন্ধির বিধবা। চাষ-আবাদ খতম হয়ে গেল, জমিদার কেড়ে নিল জমি। গতর খেটে সাজানো ঘর-সংসার তার তছনছ্ হয়ে গেল সব।...

সন্ধির কাহিনী শেষ করে বিষণ্ণ গলায় আস্তে আস্তে বলো হরি মণ্ডল, 'মোদের প্রথম দলের একজনের সঙ্গে চর ছেড়ে পালালো একদিন সন্ধির বউটা। অমন জোয়ান মরদ স্বামী, মরে গেল অপঘাতে, চর ঘর ছেড়ে মাগীটা পালালো কোথায় না কোথায়। সেই পাপ লেগে গেল চরে।' একটু থেমে শেষ কালে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ভাগ্য।'—

কেউ কোনো কথা বলে না। হতবাক হয়ে চুপচাপ বসে থাকে যেন সবাই ভাগ্যের মর্মান্তিক বিদ্রূপের সামনে। তারপর আড্ডা ভেঙে যায়। একে একে নেমে পড়ে পথে—অন্ধকারে। তখনো কথা বলে না কেউ। একটা নিষ্ঠুর ভাগ্য তখনো যেন গলা চেপে ধরে আছে তাদের। দিগন্ত জোড়া অন্ধকারে দূর থেকে ভেসে আসছে শুধু ভাগীরথীর একটানা জলকল্লোল। তার মাঝখানে এতগুলো লোকের নিঃশব্দ পদক্ষেপ কেমন যেন ভুতুড়ে ভুতুড়ে মনে হয়।

কে একজন বললো, 'এবারে জোয়ারে কি জল বাড়বে?'

'বাড়লে আর দেখতে হবে না। সরকারী বাঁধ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।'

'তা হলে শেষ হয়ে গেল পুবচর!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো কে একজন—হয়তো পুবচরের কেউ।

হরি মণ্ডল শুধু বললো, 'ভাগ্য!'

একটা দুর্জ্ঞেয় ভয়াবহতা এদের চোখের সামনের সমস্ত অন্ধকারটা জুড়ে যেন বিরাজ করছে—সে যেন চরের সেই আদি কালের সন্ধি চরের ভাগ্য—তার ঘর ভাঙার প্রথম পাপ, সখীর ভাগ্যও। এই এতগুলো লোক—সবাই ভাবছে মনে মনে, তারা মরে গেলে কোথায় চলে যাবে কার সঙ্গে তাদের বউ-ঝিরা এ চর ছেড়ে!—

হরি মণ্ডলই কথা বলে একা। দীন দাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'বেটির বিয়ে-সাদি কবে দিচ্ছ বৈরাগী?'

'ভাবছি এই মাসের শেষ দিকে, ভালো দিন আছে। মোদের পুবচরের ছোকরারাই সব ঠিক করেছে। ওরাই করছে যা করার। আমি আর কি ভাই।'—দীন দাস সবিনয়ে বললো।

'সেরে ফেল চটপট।' হরি মণ্ডল এগোতে এগোতে বললো, 'আবার একটা অঘটন না ঘটে যায়।'—

আবার চুপ ক'রে যায় সবাই। একটা জমাট স্তব্ধতার ভেতরে হঠাৎ এ বিয়ের প্রসঙ্গ—ঘর গড়ার কথা, কেমন যেন তুচ্ছ মনে হয় সকলের। চোখের সামনে জমাট বেঁধে আছে শুধু আদিগন্ত-ছোঁয়া ওদের সেই ভাগ্য!—

হরি মণ্ডল আত্মগত ভাবে শুধালো, 'পুবচরের চ্যাঁড়ারাই তা হলে সব করছে?'

'হ্যাঁ ভাই, তাছাড়া তোমাদের চরের ছোকরারাও আছে।'

হরি মণ্ডল শুধু বললো, 'হুম্। চুকিয়ে ফেল।'

দলটি পথ চলছে অন্ধকারে—গাঙ ঘেঁষা উঁচু ভেড়ি বাঁধের ওপর দিয়ে। হঠাৎ কানে এসে বাজে যন্ত্রণাকাতর একটা আর্তনাদ। ওস্তাদের বেহালাটা এই দিগন্তজোড়া অন্ধকারের কোথায় যেন একটা বোবা পশুর মতো আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। সেই আর্তনাদটা এসে কেমন করে যেন ঢুকে পড়লো এই স্তব্ধ মানুষগুলির বুকের ভেতরে।

হরি মণ্ডল একাই কথার ধারা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—সে-ও চুপ করে যায়। অনতিদূর থেকে ভেসে আসা জোয়ারে ফেঁপে ওঠা ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিশে যায় বোবা বেহালাটার বুক-নিংড়ানো গোঙানি। পরিব্যাপ্ত অন্ধকার আকাশের তলায় সব মিলে যেন রূপ নেয় এই চরের মর্মান্তিক সেই ভাগ্য। দুরন্ত কল্লোলোচ্ছ্বাস আর এই বোবা কান্না—এইটেই যেন এ চরের, এতগুলি মানুষের অপরিবর্তনীয় ছক্‌কাটা কপাল।

যেতে যেতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় সন্ধি বরের ভিটের কথা—হরি মণ্ডল বুড়ো চোখ মেলে তাকায় একবার গাঙের দিকে : ওইখানে তলিয়ে গেছে সেটা কোথায় কবে! গাঙের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে যেন ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠলো :

'বাপ!'—

'কি হলো মণ্ডল?'

'জোয়ারের জল যে খুব ফেঁপেছে গো!'

হ্যাঁ, দুরন্ত নদীর জোয়ারই ফেঁপেছে। অগাধ জলরাশি ঝলোমল করছে অন্ধকারেও, দুলছে বুনো হাতীর মতো—তারপর অন্ধকার দিগন্তে কোথায় মিশে গেছে তার বিস্তীর্ণ জলধারা। হরি মণ্ডলের চোখ অনুসরণ করে সকলে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গাঙের দিকে।

'টিকবেনি সরকারী বাঁধ এ অমাবস্যায়।' কে বললো রুদ্ধশ্বাস ভয়ে।

'গেল পুবচর!'—

বেহালাটা ইনিয়ে বিনিয়ে গোঙিয়ে মরছে তখনো। সে যেন ভুতুড়ে একটা সুর—এ চরের মর্মান্তিক ভাগ্য নামক বস্তুটার অশরীরী আত্মা। এ চরের প্রতিটি মানুষের পেছু নিয়েছে—তার জন্মকাল থেকে। এই জীবন!…

মাসের শেষের দিকে ছিল ওস্তাদের বিয়ের তারিখ। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল—কোথায় সে উধাও হয়ে গেছে। শুধু একটি ছোট তালা ঝুলছে তার নতুন ঘরের দরোজায়। পার হয়ে গেল বিয়ের দিন।

৯

চরের আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল ওস্তাদের।

পূর্ণিমা আসছে। দিনে দিনে উচ্ছ্বসিত জোয়ারে ফেঁপে উঠছে গাঙ, পুবচর আর পশ্চিম চরের সমস্ত চোখগুলো ঘুরে গেছে সেইদিকে। চেয়ে আছে আর শংকায় কালো হয়ে উঠছে থেকে থেকে। প্রত্যেকটি মুখ পাণ্ডুর। তার সাঙাৎ নফর বলেছিল একদিন, 'আজ মরে যাই মোরা, —কাল দেখবে, সখীর মতো মোদের বউ-ঝি গুলোও ওই রকম পালাবার পথ খুঁজছে।' ক্ষণে ক্ষণে খোঁচা মারতো সেই কথাটা। খোঁচা মারতো তার মায়ের পড়ো টিপির ওপরে তোলা নতুন ঘরটা—আর মায়ের কথা, এ চরের মুখি রাঁড়ীর কথা। তার পড়ো ভিটেতে নতুন ঘর যতোই উঠুক —তার কলংকিনী মায়ের কাহিনী যেন ভোলবার নয়। এ চরের আরও অনেক মেয়ের মতো সখী তারই অনুসরণ করেছে। খোঁচা মারতো এই কথাটাও—হরি মণ্ডল যাকে বলে—এ চরের ভাগ্য, এ চরের পাপ! সমস্তটা বিশ্রী লাগতো তার। ছটফট করতো দম-চাপা হয়ে : নির্মম ভাগ্যকে সে বদলাতে পারে না! তারপর একদিন সে বেরিয়ে পড়েছিল নিরুদ্দেশ ভাবে—রাত তখন গভীর। সারা চর ঘুমে ঘোর। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে দিক দিগন্ত। সেই মৃত্যুর মতো বিষাদঘন আলোয় হা-হা করা মাঠের শূন্যতা যতো দূর দৃষ্টি যায়—সবটা জুড়ে যেন রহস্যময় নির্মম এক ভাগ্যের মতোই জুড়ে আছে। কাঁধে বেহালার ঝোলা, অন্যমনে থমকে দাঁড়িয়েছিল এসে সখীর নিঝুম শূন্য কুঁড়েটার সামনে। মনে হয়েছিল হঠাৎ : বিষাদঘন এই সমস্ত আবহাওয়াটাকে

শাণিত হাসিতে ভেঙে খান খান ক'রে দেবার মতো কেউ নেই আর এই চরে। জীবন মৃত্যু জুড়ে শুধু নিষ্ঠুর ভাগ্যই জমাট বেঁধে রইলো যেন এখানে চিরকালের জন্য। এখানে তার আর সুখ নেই—আনন্দ নেই।

ভূতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঢুকে পড়েছিল সে কুঁড়ের ভেতরে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—তবু যেন সে প্রাণপণে কিছু দেখবার চেষ্টা করেছিল। তারপর বেরিয়ে এসে হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। চোখ পড়েছিল—জোয়ারে ফুলে ওঠা গাঙের দিকে—বিস্তীর্ণ জলরাশি দুলছে নির্মম ভাগ্যের মূর্ত প্রতীকের মতো। ফিরে তাকিয়ে ছিল পশ্চিম চরের এক প্রান্তের দিকে—যেখানে ফিকে জ্যোৎস্নায় তার নতুন ঘরের চালা ঝকোমক ক'রছে, নতুন ছাওয়া খড়ের ওপরে ঠিকরে পড়ছে জ্যোৎস্না—বিদ্রেূপর হাসির মতো। তারপর হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ে গিয়েছিল একটি শান্ত ভীরু মেয়ের মুখ—সে তুলসী। তারপর আর এক মুহূর্তও সে দাঁড়ায়নি। হন হন ক'রে ছেড়ে চলেছিল গ্রাম। ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে একদিন চেপে বসছিলো গিয়ে সুন্দরবনগামী খেয়া নৌকোয়।

১০

'দেখছো—গোরুগুলো গাঙের দিকে মুখ ক'রে কি যেন শুঁকছে কদিন ধরে।' ভাকু দাস বললো, 'কেন বলো দিকিন মণ্ডল?'

হরি মণ্ডল হাঁড়ির মতো মুখ ক'রে বললো, 'ভারি খারাপ লক্ষণ।'

মদনা ভয়ে ভয়ে বললো, 'খারাপ বলছো মণ্ডল?'

হরি মণ্ডল বললো, 'ঘোর অমঙ্গল।'

'ভেসে যাবে সরকারী বাঁধ?' মোটাসোটা হাবাগোবা মদনা কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো এ চরের পুরাণো লোকটির দিকে।

'ভাগ্য!' হরি মণ্ডল শুধু বললো।

মদনা হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'হেই মা গঙ্গা!'

হরি মণ্ডল গাঙের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, 'সজাগ থাক—কখন বাঁধ কেটে ঢুকে যাবে জল। যা অবস্থা বাঁধের!'

সহস্র ফাটল ধরা সর্পিল সরকারী এমব্যাংকমেণ্ট বাঁধটার দিকে হতাশ চোখে চেয়ে থাকে সবাই।

ভাকু দাস বললো, 'এখন উপায় কি বলো! ভেসে যাবে সব?'

মোনা বললো, 'ঘুষ দিলে হয়তো মাটি পড়ে বাঁধে।—কি বলো?'

ভৈরব দাস দাড়ি নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কেটে উঠলো, 'যে জানে টাকার ফন্দি, সে যায় পোলবন্দী। সরকারী ক্যান্টেদ্দার (কনট্রাকটার), উপরসী (ওভারসিয়ার) বাবুদের ভালো রকম গু (ঘুষ) খাওয়াও—কাজ হবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হলো। ঘুষের টাকা উঠলো পুকচর থেকে চাঁদা তুলে—জ্বালাটা বেশী তাদেরই। কারণ, সরকারী বাঁধ কেটে জল

ঢুকবে এসে আগে পুবচরেই। তারপরেই আছে জমিদারের উঁচু ঘেরি-বাঁধ। পশ্চিম চরের ভাসার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু, ওভারসিয়ারের তদন্তে আসার আগেই পূর্ণিমার কেঁপে ফুলে ওঠা গাঙ ধাক্কা মারলো এসে জীর্ণ সরকারী বাঁধে একদিন। দেখতে দেখতে বাঁধ কেটে গেল দু-তিন জায়গায়। নোনা পলিমাটির বাঁধ, স্রোতের খরবেগে হু-হু করে বেড়ে গেল হানা। একটা আতংকিত আর্তনাদের মহাপিণ্ড পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগলো জ্যোৎস্না-ধোয়া আকাশের দিকে। পুবচরের মরদেরা অকারণ কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করতে লাগলো বাঁধের ওপরে। পলিমাটি মেশা ঘোলা জল হু-হু করে ঢুকছে এসে মহাবন্যার ঢলের মতো। জলের তোড়ে হানা বেড়ে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। রাত গভীর। ভয় পাওয়া মানুষগুলো বাঁধ ছেড়ে, জোয়ারের জল ঠেলে ছুটলো ঘরের দিকে: গোরু-ছাগল মানুষ বাঁচাতে হবে।

ভয়ার্ত হাঁক ডাকে তুলসী ভয় পেয়ে ডাকলো দীন দাসকে, 'বাবা!'

'কি রে?' বুড়ো দীন দাস ঘুম ভেঙে উঠে বসলো আচমকা। জেগেছিল বহুক্ষণ, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল বুড়ো মানুষ।

তুলসী বললো, 'বাঁধ ভেঙে গেছে বাবা!'—

'এ্যাঁ! তা হলে—ওরে, তা হলে—ও চন্দ্র!'··· ভুল করে ডেকে বসে ওস্তাদের নাম ধরে দীন দাস। কাঁপতে কাঁপতে চারদিকে হাতড়ায় বুড়ো—রাতে দেখতে পায় না একেবারে।

তুলসী হাত ধরলো বাপের, 'চলো বাবা।'—

বাইরে তখন গোরু-ছাগল, ছেলেমেয়ে, মরদের হাঁক ডাক আর্তনাদের পাকানো একটা কোলাহল চরের আকাশকে মুখর করে তুলেছে।

'মা গো—অ মা!'—একটি কচি গলায় আর্তনাদ।

'হেই মদ্‌না!'—

'বাবা !'—

'বাঁধে চলে যাও সবাই—পশ্চিম চরের ভেড়ি বাঁধে।'

'রইলো সব—হে মা ··· হে মা গঙ্গা! মোদের দুখের সংসার ঘর-দোর মা !'—

নানা কণ্ঠের অসহায় ভীত আর্তনাদ—প্রার্থনা। এ সব কিছুকে চাপা দিয়ে ঠেলে ওঠে ভেড়া-ছাগল গোরুর ভয় পাওয়া কাৎরানি।

'চলো বাবা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে। সবাই চলে গেল যে!' তুলসী অসহায় ভাবে হাত ধরে টান মারলো দীন দাসের।

'এই যে মা। হায় কপাল—হায় !'

ভাঙা সরকারী বাঁধের একাংশ দিয়ে পিল পিল করে ছুটেছে সবাই পশ্চিম চরের ভেড়ি বাঁধের দিকে। এটা বাঁধের দক্ষিণ অংশ। উত্তর ভেসে গেছে। আদিগন্ত বিস্তীর্ণ জলরাশির ঢল এসে ঢুকছে সেই দিক দিয়ে—ভরে যাচ্ছে মাঠ ঘাট। রাতকানা দীন দাসকে নিয়ে এগোতে পারছে না তুলসী। আর সবাই ইতিমধ্যে সরকারী বাঁধের বিপজ্জনক এলাকা ছাড়িয়ে চলে গেছে পশ্চিম চরে।

তুলসী আর্তনাদ করে উঠলো, 'হায় বাবা, সামনে হানা পড়ে গেল যে!'

এবার বাঁধের দক্ষিণ অংশ কাটতে সুরু করেছে। কানা দীন দাস শুধু বললো, 'তবে !'

তুলসী বললো, 'মাঠে নেমে যাই চলো বাবা।'

'মাঠে তো জল ঢুকছে—নাকি ?'

'জল এখনো বেশী নয়। হানার মুখে কিন্তু তোড় বেশী যে!'

'হায় গোবিন্দ !'

'চলো বাবা।'

ওরা বাঁধ থেকে মাঠে নামলো।

মদনা দেখতে পেয়েছে ওদের। চীৎকার করে উঠলো, 'খবর্দার! কে নামছে মাঠে? কুমীর উঠে এসেছে—কুমীর!'—

'হায় গোবিন্দ! তুলসী, ধর মোকে শক্ত করে। বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। হায় রাধানাথ!—' দীন দাস বসে পড়লো মাঠে।

এদিকে প্রতি মুহূর্তে মাঠে জল বাড়ছে হু-হু করে। গাঙের দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো তুলসী—ভয় পেয়ে গেল। দিগন্তলীন বিশাল জলরাশি দুলতে দুলতে ছুটে আসছে যেন চারিদিক প্লাবিত করে। হঠাৎ সে চোখে দুহাত ঢেকে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো।

সাহস করে মাঠের মধ্যে ছুটে এলো মদনা। তুলসীর ওপরে খেঁকরে উঠলো, 'মাঠে নামলে কেন—এ্যাঁ? মরবে?' দীন দাসকে ঝাঁকানি দিল একটা। ডাকলো, 'বৈরাগী—চল?'

দীন দাস হাঁটুতে মুখ গুঁজে দম নিচ্ছে যেন তখনও।

তুলসী কেঁদে বললো, 'বাপ্ যে মোর কেমন শক্ত হয়ে গেল গো!'—

'বুড়ো মানুষ—ভয়ে মুচ্ছা-টুচ্ছা গেছে বোধ হয়। লাও চলো তাড়াতাড়ি এখন। কুমীর এসে পড়বে। মাঠে জল বাড়ছে।' মদনা বুড়ো দীন দাসকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগোতে লাগলো।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাঁধের ওপরে এসে উঠলো ওরা। মদনা কাঁধ থেকে নামালো দীন দাসকে। কিন্তু বুড়োকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বাঁধের ওপর বসাতে যেতেই ঢলে পড়লো মাটিতে।

'কি হলো হে!'

কয়েকজন ঘিরে এলো বাঁধের ওপরে।

মদনা বললো, 'মুচ্ছা-টুচ্ছা হয়ে গেছে বোধ হয়।'

তুলসী বাপের মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকলো, 'বাবা!—অ বাবা!'

'চোখে মুখে জলের ছিটা দাও।'

কে একজন মাঠ থেকে আঁজলা ভরে জল এনে ছিটে দিতে লাগলো বুড়োর মুখেচোখে। কিন্তু বুড়ো শরীরটা শক্ত হয়ে আছে একভাবে।

ভাকু দাস বললো, 'ছাখ দিকিন ভালো করে।'

'বৈরাগী—অ বৈরাগী!'—

'মরে গেছে।'

'মরে গেছে?'

'নিঃশ্বাস তো বন্ধ।'

'গেল যাঃ!'—

'বাবা—অ বাবা!—বাবা!'—তুলসী ডাকতে ডাকতে কেঁদে উঠলো। মাথা কুটতে লাগলো বুড়ো কাঠ মেরে যাওয়া বুকটার ওপরে।

জোয়ারের জল নামার অপেক্ষায় বসে আছে সবাই বাঁধের ওপরে। পুবদিকে যতোদূর চোখ যায়, শুধু থৈ-থৈ করছে খরধার জলরাশি—জ্যোৎস্নার ঠাণ্ডা আলোয় যার আদি অন্ত বোঝা যায় না। শুধু উঁচু ডাঙার ওপরে জনশূন্য কুঁড়েগুলো মাথা তুলে আছে! উঁচু উঁচু দাওয়া—বান-ভাসির দিকে চোখ রেখেই তৈরী করা। সেই ঘরগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে জোড়া জোড়া চোখে দীর্ঘশ্বাস যেন জমাট বেঁধে গেছে। কথা কইছে না আর কেউ—সমস্ত কথা যেন থিতিয়ে মরে গেছে। ছেলেমেয়েগুলো আর কাঁদছে না ভয়ে। মেয়েদের চোখ উদাস। কান্না কখন থেমে গেছে তুলসীরও। বাঁধের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বৈরাগী দীন দাসের মড়া। ভয়াবহ দুর্বার এই প্রকৃতির মাঝখানে সব সাড়া-শব্দ থেমে গেছে যেন। পশু, মানুষ, জীবন, মৃত্যু—সব কিছু যেন থমকে গেছে নির্মম এই ভয়াবহতার সামনে।

জোয়ারে ভাসা এই জলার ভেতর থেকে কে ডাক পেড়ে বললো এমন সময়ে, 'জল নামছে হে।'—

বাঁধের ওপরের লোকগুলো সচকিত হয়ে উঠলো। এমন জলার মধ্যে থেকে ডাক পাড়ে কে?

মোনা হেঁকে বললো, 'কলিমদ্দি না কি?'

'হাঁ গো।'

'তুমি কোথায় হে?'

'চালের মটকায়।'

'ছেলে?'

'মোর কাছে।'

'কি কাণ্ড!'

কলিমদ্দি হেঁকে বললো, 'ভোরের আগেই জল নেমে যাবে হে।'

মদনা বললো, 'মোরা সবাই চলে এলাম, আর তুমি থেকে গেলে!'

'ও রকম জোয়ার মোর ঢের দেখা আছে গো।' কলিমদ্দি জবাব দিল।

রাখাল দাস বললো, 'ও ওই রকম। চিরদিন দেখে আসছি। ওই রকম করে করে ও পুবচরে এসে ঠেকেছে।'

পুরাণো কথা এসে পড়ে। কবে বহুদিন আগের চরের শেষ সীমা, গাঙের ধারে ছিল মুসলমান পাড়া, তার চিহ্ন পর্যন্ত আজ নেই। গাঙের তলে তলিয়ে গেছে। মুসলমানরা চলে গেছে কে কোথায়। শুধু থেকে গেছে একা কলিমদ্দি। হটতে হটতে এসে ঠেকেছে পুবচরে। এর মধ্যে বউ মরে গেছে অপঘাতে। কবে সে গরু চরাতে গিয়েছিল গাঙের ধারে, কুমীর এসে ল্যাজের ঝটকা মেরে টেনে নিয়ে চলে গেল একদিন গাঙে। শুধু একটা ছেলে রেখে গেছে সে বছর পাঁচেকের। তার হাত ধরে এখনও টিকে আছে কলিমদ্দি এ চরে।

সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কলিমদ্দির কাহিনী, আর শুনছে চর থেকে জল নামার ঝর্ ঝর্ শব্দ, যেন জলপ্রপাত। অপেক্ষা করে আছে

ভোরের জন্তে। ভাবছে নিজেদের ভাগ্যের কথা। এ চরের ভাগ্য, তার জীবন কথা।...

মদনা হাঁক পেড়ে শুধালো, 'কলিমদ্দি, জল নামলো হে?'

'নামছে গো।' কলিমদ্দি হেঁকে বললে, 'কি মাছ গো দাদা! সব কিলবিল করছে চারদিকে।'

'ওর এখন মাছের চিন্তা।' কে বললো বিরক্ত হয়ে।

'ধরবে তো এসো।' কলিমদ্দি এমন ভাবে বললে যেন কিছুই হয়নি।

মোনা হেঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি চাল থেকে নেমেছ?'

'অনেকক্ষণ।' কলিমদ্দি জবাব দিল, 'জল একটু যা আছে এখন মাঠে।'

জোয়ার এসেছিল, চলে গেল। ভোরের দিকে মাঠঘাট থেকে সরে গেল জল। শুধু গতকালের জোয়ারে উত্তরের কিছুটা চর ধসে গাঙে নেমে গেছে। তবে ঘর-দোর সব ঠিক আছে।

কলিমদ্দি ছেলের হাত ধরে এলো বাঁধে। বললে, 'ভয় নাই, আজ জোয়ারের জল কম হবে।' বহু জোয়ার খাওয়া মানুষ সে, সবাইকে যেন সাহস দিলে।

মোনা বললো, 'আর কি হবে ভাই সেখ! মাঠে নোনা জোয়ারের ঢেউ খেলে গেল, এবারে চাষের দফা শেষ।'

কলিমদ্দি বললো, 'বর্ষার জলে সব ঠিক হয়ে যাবে গো। মেঘের মিঠা পানিতে নোনা মরে।'

'তা না হয় হলো গো, কিন্তু বর্ষার ভরা নদীর জোয়ারে এ চর আর টিকবে?' মোনা তাকালো হতাশ চোখে সবার দিকে।

সে হতাশা সবারই চোখে। সবাই চুপ করে আছে। শুধু কলিমদ্দির চোখে মুখে ও বস্তুটার চিহ্ন নেই। রোগা লিকলিকে লোকটা সব কিছু

থুইয়ে থুইয়ে যেন বেপরোয়া হয়ে গেছে। বললো, 'বর্ষার জোয়ারকে এখনও ঢের বাকী হে।'

'গাঙের চেহারাটা একবার চোখ দিয়ে দেখ মিঞা।'

'ওকে ঢের দিন থেকে চিনি গো।' হাসলো কলিমদ্দি। বেপরোয়া হাসি। ওই গাঙের সঙ্গে লড়াই করে আজও টিকে আছে সে, জমি গেছে, আগের ঘর-দোর, গোরু-বাছুর সব গেছে একে একে, বউও গেছে। সব যাওয়ার পর লোকটার ভয়-ডর নেই আর। কলিমদ্দি বললো যেন বিদ্রূপ করেই :

'ভাবো তোমরা বসে বসে, ফন্দি বার করো।'

কলিমদ্দি চলে গেল—যেন তাচ্ছিল্য করে কিছুটা। সবে একটা জোয়ার খাওয়া এই লোকগুলোর ভয়ভাবনা তার ভালো লাগেনি।

পশ্চিম চরের লোকজনও জুটেছে এসে বাঁধের ওপরে রাত থেকেই। ভোরের দিকে এলো হরি মণ্ডল স্বয়ং। এই বুড়ো লোকটার চৌকস চেহারা, পেশল কাঠামোর দিকে তাকালো সবাই, আশায় আশ্বাসে। চরের সব চেয়ে পুরানো লোক। এরা বলে 'মুড়া-কাটি।' বন-বাদা কেটে আবাদ-যোগ্য করেছে জমি।

ভাকু দাস বললো, 'এখন উপায় কি বল মণ্ডল ?'

'দীন দাস মরে গেল ?' হরি মণ্ডল জিজ্ঞেস করলো।

'ওই যে লাস।'

বাঁধের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে দীন দাস। তার মাথার কাছে বসে আছে তুলসী। কেঁদেছিল কখন, চোখের তলায় জলের শুকনো দাগ। বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। হয়তো দুর্জ্ঞেয় তার নির্মম ভাগ্যের সামনে।

হরি মণ্ডল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'মোদের আর একটা পুরাতন লোক চলে গেল।'

কিন্তু একটা বুড়ো লোকের মৃত্যুকে ছাপিয়ে উঠেছে তখন সারা পুবচরের দুর্ভাগ্য। দীন দাসের চেয়ে সেই কথাটাই হয়ে উঠেছে বড়। মদনা বললে সোজাসুজি, 'যে গেল সে তো এখন নিশ্চিন্ত গো মণ্ডল—মোদের কি হবে বল।'

'উপরশীকে খবর দাও—না কি।' হরি মণ্ডল চৌকিদারের দিকে চেয়ে বললে, 'কি বল হে চৌকিদার?'

ক্ষুদিরাম চৌকিদার বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললো, 'ল্যায্য কথা।'

হরি মণ্ডল বললো, 'খবর দাও, আসুক—সচক্ষে দেখুক মোদের অবস্থা বাবুরা। পুবচর গেলে পছিম চর আর ক'দিন!'

'ল্যায্য কথা।' চৌকিদার চোখ পিটু পিট ক'রে বললে, 'মোকে দুটো ট্যাকা দাও—খবর দিয়ে আসি।'

'এর জন্যে আবার দু ট্যাকা!' মদনা বলে উঠলো, 'অবাক করলে চৌকিদার!'

চৌকিদার যথারীতি ঝপ ক'রে রেট নামিয়ে বললে, 'বেশ—একটা ট্যাকাই দাও।'

হরি মণ্ডল মিটমাট ক'রে দিয়ে বললে, 'ওদের বিপদ এখন, আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে যাও চৌকিদার।'

মদনা বললো, 'খবর তো মোরা আগেই দিয়েছি গো, ও-ও তো খেয়েছে ক' টাকা।'

'আবার যাও।' হরি মণ্ডল বললো, 'আর এখানে বৈরাগীর ব্যবস্থা করো ক-জন।'

'আর দীন দাসের ঝি—তার কি হবে? ই সময়টায় মোদের অস্তাদ যে চলে গেল কোথায়?' মদনা বললো।

হরি মণ্ডল বললো, 'সে গেছে সেই লাট—সুন্দরবন, সখীর পাছু পাছু।'

নফর চমকে উঠলো যেন কথাটা শুনে। বললো, 'তুমি কি করে জানলে মণ্ডল ?'

'চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করো।'

কিন্তু কেউ কিছু আর জিজ্ঞেস করে না। বুঝতে পারে সবাই—চৌকিদারকে লাগিয়ে হরি মণ্ডল নিশ্চয়ই খবর নিয়েছে।

তুলসী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে—শুনছে, বোঝবার চেষ্টা করছে যেন কথাটা।

মোনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললো, 'দীন দাসের ঝির তা হলে কি হবে!'

'সে তোমাদের ভাবতে হবে না।' হরি মণ্ডল বললো, 'দীন দাস মরেছে—আমি তো মরিনি। তুলসী থাকবে মোর ঘরে। মোর আর কে আছে। না কি বল তোমরা ?'

'সে তো কপাল তুলসীর—ভাগ্যের কথা মণ্ডল।' মোনা বললো আস্তে আস্তে।

হরি মণ্ডল জোর করে মুখে হাসি এনে তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'কিছু ভাবতে হবেনি গো বৈরাগীর ঝি, আমি এখনও মরিনি।' তারপর হরি মণ্ডল সকলের দিকে ফিরে বললো, 'লাও যা বলি সব করো এখন।'

হরি মণ্ডলের কথা আশ্বাস ফিরিয়ে আনে সকলের।

যতোই হোক তারা ভরসা করে চরের আদি আমলের এই লোকটিকে, বিপদে আপদে এখনো তাকায় এই লোকটির দিকে। মাথার চুলগুলো সব পেকে গেছে কিন্তু শরীরে জরা দেখা দেয়নি এখনো। পেশল দেহে আছে কর্ম ক্ষমতার আভাষ। মোটা কর্কশ আঙুল গুলোয় এ চরের আবাদের ইতিহাস পড়া যায় যেন। সবটা মিলিয়ে এই চৌকো চেহারার লোকটি যেন সগর্বে বহন করছে সাপ আর

কুমীরের মুখে দুরন্ত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রে এ চরে ফসল ফলানোর ইতিহাসের কথা। তার সমস্ত বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও প্রাধান্য নিয়ে আজ দুর্বিপাকের দিনে এগিয়ে এসেছে হরি মণ্ডল। ছোকরাদের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললে :

'সুখের দিনে আবার সঙ্গতের আখড়া নিয়ে মেতে উঠো বাবারা, তখন হরি মণ্ডলকে দূর করে দিও। এখন যা বলি—শোনো।'

ছোকরারা আঘাতটা চুপ করেই আজ হজম করে। তারা জানে না—ওস্তাদ কোথায় গেছে। তুলসীর জন্যে মাথা খুঁড়ে ভাববারও সময় নেই আজ তাদের। তাদের সমস্ত চেতনা জুড়ে আছে এখন শুধু একটা সর্বনাশের সম্ভাবনা। তার ভ্রূকুটির সামনে আজ তারা স্তব্ধ—বিভ্রান্ত।

সবাই চুপ করে আছে।

হরি মণ্ডল একাই কথা বলে। বললো, 'তোমাদের অস্তাদ এসে কাকে উদ্ধার করবে কি করবে সে তোমরাই জানো। এখন হাজির আছে এই বুড়া লোকটা। কি বলো চৌকিদার?' বলে তাকালো চৌকিদারের দিকে।

চৌকিদার বললো, 'ন্যায্য কথা।'

'এখন যাও—ঘরে যাও সব।' হরি মণ্ডল বললো, 'আজ আর জোয়ারের জল বাড়বেনি তেমন, ভয় নাই।'

১১

পরের দিন জোয়ারের জল তেমন আর বাড়লো না বটে কিন্তু ভাঙা বাঁধের হানা দিয়ে নোনা জল হু-হু ক'রে এসে ঢুকে পুবচরের সমস্ত মাঠ ভাসিয়ে দিলে। ভরা জোয়ারের সময় মনে হলো—এ চর যেন গাঙেরই সামিল। পুবচরের চাষীরা হতাশ হয়ে চেয়ে রইলো মাঠের দিকে। জোয়ারের জলের সঙ্গে সঙ্গে কুমীর উঠে এসেছিল মাঠে—ন্যাজের

ঝটকায় মাঠের জল তোলপাড় ক'রে ছাগল-গরু-বাছুর টেনে নিয়ে গেল কয়েকটা। শুধু বোকা বোকা চোখে চেয়ে সমস্ত ক্ষয় ক্ষতির হিসেব করলো পুবচরের চাষীরা। এই এ চরের ভাগ্যের লেখন। প্রকৃতি নির্মম। তার সেই নির্মম লেখাটাই যেন স্তব্ধ চোখে চুপ ক'রে পড়ে শুধু পুবচরের চাষীরা। তার ওপরে, তার বিরুদ্ধে যেন এদের আর কিছুই করার নেই।

মেয়েদেরও মন লাগে না ঘর-গেরস্থালীর কাজে। রাতের জোয়ারে ভেসে আসা নোংরা জঞ্জাল পড়ে আছে এখানে ওখানে। পরিষ্কার নিকানো সংসারের সীমানায় এসে কেমন একটা নোংরা বন্যতা যেন চেয়ে আছে মলিন চোখে। তাকে সাফসুফ ক'রে তুলতে আর গা আসে না যেন মেয়েদের।

কলিমদ্দি হেসে বললো, 'একটা জোয়ারেই সব ঘাবড়ে গেলে মেয়েগুলান! নোংরা জঞ্জাল সব সাফ করো।'

'ফের তো নোংরা হবে জোয়ারে মিঞা!'

'তা হবে।' কলিমদ্দি হেসে বললো, 'ওই সাফসুফ ক'রে আবার ঘর সংসার করতে হবে। কথায় বলে—গাঙের ধারে বাস, তার ভাবনা বারো মাস।'

কলিমদ্দি তার ছোট ছেলেটাকে নিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লেগে যায়। বহু জোয়ার-খাওয়া মানুষ সে। তাকে কোনো দুর্দৈব যেন স্পর্শই করে না। আর-সবাই কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। এক রাতের বাঁধ-ভাঙা জোয়ার যেন এ চরের জীবন-ভিত্তিটাকে শিথিল ক'রে দিয়ে গেছে। এ চরের মেয়ে মরদ আর কোনো কিছুতেই যেন প্রেরণা বা উৎসাহ পাচ্ছে না।

জটলা করে চাষীরা—আলোচনা করে। খেই পায় না কোনো কিছুর।

দিন কয়েক পরে সদলবলে সরকারী ওভারসিয়ার এলো বাঁধ পরিদর্শনে। খাকি হাফপ্যান্ট হাফসার্ট পরা সাহেব, মাথায় তেলচিটে লাগা সোলার টুপি। বেঁটে খাট লোকটি, জুতোর চামড়ার মতো গায়ের রং, রোদে জলে পোড়া পাকানো চেহারা। সদলবলে এসে সরকারী এমব্যাংকমেন্ট বাঁধের ওপরে থমকে দাঁড়ালো। তাদের ঘিরে উপচিয়ে এলো পুবচর আর পশ্চিম চরের চাষীরা।

ওভারসিয়ার জুতোর ঠোক্কর দিয়ে যেন সরকারী বাঁধের ধক্ পরীক্ষা করলো কয়েক জায়গায়, কয়েকবার তাকালো সর্বনাশা বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে। সাহেবের আমিন কুলি চেন টানাটানি ক'রে কি সব মাপজোখ করলো এদিক ওদিক। সব শেষে ওভারসিয়ার সাহেব গাঙের দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো।

মাতব্বর হরি মণ্ডল এগিয়ে গিয়ে বললো, 'কি হবে গো বাবু! মোরা যে সব ভেসে গেলম।'

ওভারসিয়ার মাথা নেড়ে বললো, 'কিছুই করবার নেই।'

মদনা হাউমাউ ক'রে উঠলো, 'মোদের ঘর-সংসার জমি-জায়গা সব ভেসে যাবে বাবু!'

'আমি কি করবো বলো।' ওভারসিয়ার বললো, 'এখন না হয় বাঁধে মাটি দিলাম—কিন্তু বর্ষায় টিকবে না। নদী আর ক'হাত তফাতে?'

হরি মণ্ডল সুযোগ বুঝে একটা চোখের খোঁচানি দিল মোনাকে। সেই খোঁচায় মুখ চাওয়া চাউয়ি করলো একবার পুবচরের চাষীরা। টাকা পয়সা জোগাড়ই ছিল আগে থেকে—হরি মণ্ডলের পরামর্শ মতো। মোনা এগিয়ে গিয়ে ওভারসিয়ারের হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে সকাতরে বললো :

'মোদের বাঁচাও বাবু—বেটা-বেটি নিয়ে ঘর করি। এই চরের মাটিই মোদের সব। ভেসে গেলে খাব কি, যাবো কোথায় বলো?'

পাঁচটি টাকা পকেটে রাখতে রাখতে ওভারসিয়ার যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমি চেষ্টার কম কিছু করবো না। আমি আজই গিয়ে সদরে রিপোর্ট পাঠাবো। তার জবাব এলেই বাঁধে মাটি পড়বে।'

হরি মণ্ডল চোখ কুঁচকে বললো, 'আর যদি বাঁধে মাটি ফেলার কোন অর্ডার না আসে বাবু?' বলে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত মাথা নেড়ে হেঁ-হেঁ করে হাসলো।

পুবচরের সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধায় চেয়ে আছে হরি মণ্ডলের দিকে। মাতব্বর একটা জোর ফাঁকি ধরে ফেলেছে হাতে হাতে।

হরি মণ্ডল ফের বললো, 'মোরা আপনাদের ওই লেখালেখি, সদর-মফ্‌সল বুঝিনি বাবু। যাতে বাঁধে মাটি পড়ে—সেই ব্যবস্থাটি করে দাও। বাস্। আপনার পান খাওয়ার জন্য মোরা আরও কিছু দিব। কি বলো হে?' বলে হরি মণ্ডল তাকালো পুবচরের উৎকণ্ঠিত মুখগুলির দিকে।

তারা সবাই সমস্বরে হরি মণ্ডলের কথার সমর্থন করে।

মদনা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'মোরা সবাই আপনার গোলাম হয়ে থাকবো বাবু। বাঁচাও মোদের।'

'আমার যথাসাধ্য করবো।' বলে ওভারসিয়ার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল গটগট করে।

আমিন হাত পেতে দাঁড়ালো মোনার সামনে, 'আমার পাওনা?'—

মোনা তাকালো হরি মণ্ডলের দিকে।

হরি মণ্ডল হেঁ-হেঁ করে হেসে বললো, 'উপরশি বাবুকে তো দিলাম পাঁচ টাকা গো!—আগেও দিয়েছি কিছু। ওরি মধ্যে তোমরা সব করে লাও বাবু।'

আমিন বললো, 'বাবু ভাগ দেবে আমাদের! ও বাবুর হাত নিতে জানে—দিতে জানে না।'

মদনা বললো, 'দেব তোমাকে—সক্‌কলকে দেব। আগে মোদের বাঁধে মাটি দিয়ে দাও—মুঠো ভরে দেব বাবু।'

'তা হলেই বাঁধে তোদের মাটি পড়েছে।' বলে আমিন রাগ ক'রে চলে গেল গরগরিয়ে।

তবু পুবচরের চাষীরা দিন গুনছে বসে বসে—কবে সরকারী আদেশ আসবে। এদিকে জোয়ার খেয়ে খেয়ে জীর্ণ বাঁধের হানা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। নোনা জল খেয়ে সারা চর যেন খড়ি মাটির মতো সাদা হয়ে উঠেছে। কোথায় মিলিয়ে গেছে যুবতী মেয়ের মুখের মতো পলিমাটির স্বর্ণাভ রং। নোনা জলে পচে উঠেছে মাঠের ঘাস। গোরু ছাগলও তাতে আর মুখ ছোঁয়ায় না। সেখানে কেমন একটা কাঁকড়া-পচা ভ্যাপসা গন্ধের গুমোট থমথম করছে যেন। সারা পুবচরটা অসাড়—নিঃশব্দ। তারই মধ্যে কতকগুলো লোক শুধু বিরস পাণ্ডুর মুখে ঘুরে বেড়ায় ভূতের মতো। উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে আছে—কবে আসবে ওভারসিয়ার কুলি-কামিনের দল, সদরের হুকুম—মাটি পড়বে তাদের বাঁধে। অসহ্য কতকগুলো দিনের পর দিন ওদের যেন পিষে পিষে থেঁৎলে গেল সহস্র দুশ্চিন্তায়।

হরি মণ্ডল রোজই একবার ক'রে আসে—আশা আশ্বাস দেয়। এই পর্যন্ত। যে কারুর দাওয়ায় জমে যায় অনেক রাত অবধি। গল্প গুজব করে পুরানো কালের : চরের প্রথম দিক্‌কার কথা। প্রকৃতির দুরন্ত শাসনের সামনে আজ বড় হয়ে ওঠে যেন তার আরণ্যক ইতিহাসের কথাই। কথা বলে যায় শুধু সেই একাই। পুবচরের অন্য সবাই যেন বোবা মেরে বসে থাকে। সমস্ত কথার মধ্যে ভাবে শুধু তাদের দুর্দিন ও দুর্ভাগ্যের কথা। ওদের পীড়িত ভাগ্য—বোবা নিস্তব্ধতার মাঝখানে হরি মণ্ডলকে মনে হয়—অনেক বুদ্ধিমান, অনেক চতুর, বহু দুঃখে

পোড় খাওয়া লোক! সাহসের প্রতিমূর্তি। সবাই চেয়ে থাকে হাঁ ক'রে তার মুখের দিকে।

হরি মণ্ডল সমস্ত কথার ভেতরে রোজ একবার করে কথা তোলে ওস্তাদের। খোঁচা দিয়ে বলে:

'মোদের এ দুখের দিনে বলো এখন সেই মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা কোথায়! থাকলে তবু দু-দণ্ড বসে একটু গাওন-বাজন শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা করতাম এমন সময়।'

কেউ কোনো কথা বলে না—মায় নফর পর্যন্ত। সত্যিই ওস্তাদ বলে কেউ কোনোদিন ছিল এ চরে, তাকে ঘিরে কোনোদিন গানের তরঙ্গ উঠেছিল এ চরের মেয়ে মরদের মনে মনে, এ যেন আজ মনেই পড়ে না। শুধু হরি মণ্ডল খোঁচা দেওয়ার ছলে কথাটা তোলে—তাই। নইলে মনেই পড়তো না হয়তো তাকে। এখন মূর্তিমান দুর্ভাগ্যের মতো এতগুলি মেয়েমরদের সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে চেপে বসে আছে যেটা সে হলো বাঁধের ওই হানা গুলো আর আশা-আশ্বাসহীন ভাবী দিন। তারই মাঝখানে রসিকতা করে ওস্তাদের কথা তোলে হরি মণ্ডল। বলে:

'দিব্যি এখন একটু আমোদ আহ্লাদ করা যেত, কি বলো?'

সবাই মুখ নীচু ক'রে থাকে।

মদনা হাবাগোবা মানুষ। খোঁচা বুঝতে না পেরে ফট করে বলে ফেললে সে একদিন, 'সে তো পালিয়েছে মণ্ডল—তার আর কি। এখন মোদের কি হবে বলো?'

'সব ভাগ্য। ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।' হরি মণ্ডল বললো, 'এ চরের মাটির ভোগ থাকলে দেখবে, ওই ভাঙা বাঁধে মাটি পড়েছে, ভাঙনে আবার বালি আর পলি এসে পড়েছে। বুঝলে? কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারবেনি।'

কি আছে কপালে? কি সে অদৃশ্য লেখা? বাইরের চরজোড়া গাঢ় অন্ধকারের দিকে চেয়ে পুবচরের জোড়া জোড়া চোখ যেন তাকে পড়ে ফেলতে চায়। আশা নিরাশায় দোল খায়। শেষে চেয়ে থাকে পরম আস্থায় মাতব্বর হরি মণ্ডলের মুখের দিকে।

হরি মণ্ডল বললো, 'চৌকিদারকে পাঠিয়ে একবার জানলে হয় সদর থেকে কোন খবর এলো কি না! কি বলো সবাই?'

'পাঠাও মণ্ডল। কালই পাঠাও।' মোনা বললো, 'রাতে একটু ঘুম হয় না মণ্ডল—কোন কাজে মন বসে না।'

'সব ভাগ্যের খেলা।' হরি মণ্ডল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'নইলে দেখো না, দীন দাসের ঝিয়ের ব্যাপারটা। ঘর-বর সবই তো ঠিকঠাক। কিন্তু ছাখো, কি হতে কি হয়ে গেল।'

মোনা বললো, 'তুমি যখন তার ভার নিয়েছ মণ্ডল—আমরা আর কিছু ভাবি না।'

মদনা সাদাসিদে ভাবে বললো, 'ঠিক কথা। ঘরে তোমার বেটি ছিল না এখন বেটি হয়েছে। এখন তোমার বেটি, তুমি যা ভালো বোঝ কর। মোরা কিছু আর জানি না—হাঁ।'

হরি মণ্ডল এরপর আর কোনো কথা বলে না, তাকে অধিকতর গম্ভীর দেখায়। কি যেন ভাবে। মুখে ছায়া পড়ে গভীর চিন্তার। শেষে বলে, 'যতোই হোক, পরের মেয়ে—ডাগর মেয়ে। তার চিন্তা আছে বৈ কি।'

১২

হরি মণ্ডলের সব চেয়ে অসহ্য লাগে তুলসী যখন ওস্তাদের খোঁজ খবর করে। পশ্চিম চরের একে ওকে সে খবর জিজ্ঞেস করে, কানে আসে হরি মণ্ডলের। ছুটে গিয়ে মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে হঠাৎ

পেটোতে ইচ্ছে করে তার। ইচ্ছে হয় গলা টিপে ধরে যাতে কোনো দিন ওই সরল চিকন মুখটা দিয়ে ওস্তাদের নাম আর উচ্চারিত না হয়। এর ওপরে আরও এক জ্বালা বেড়েছে—সে হ'লো মণ্ডলের বড় ছেলে নিতাই।

জোয়ান মরদ হয়ে উঠেছে নিতাই। এটা যেন সবে এতদিনে জানতে পেরেছে হরি মণ্ডল। বয়স তার কুড়ি একুশ হবে কিন্তু এত দিন সে-নিতাই ছিল যেন হরি মণ্ডলের তিন জোড়া বলদের সামিল—তাদেরই রকমফের আর একটা। ক্ষেত খামার চাষের কাজে সে হরি মণ্ডলের ডান হাত। জবর কাজের মরদ। শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া তার আর অন্য কোনো রকমের জীবন ছিল না। না শুনতো তার মুখে কেউ হাসির হররা না একটা ফষ্টিনষ্টি। গ্রামের লোক ঠাট্টা করে বলে—'মণ্ডলের বলদা।' হরি মণ্ডলের পরিবারে মণ্ডলেরই সমবয়সী এক দূরাত্মীয় বোন ছাড়া আর কোনো স্ত্রীলোক ছিল না সংসারে। এখন যে আর একটি অন্য বয়সের মেয়েলোক এসেছে তার প্রমাণ নিতাইয়ের মতো বলদেরও চম-মনে ভাব। নিতাইও যে ফষ্টিনষ্টি করতে পারে, এ যেন হরি মণ্ডল নিজে কানে না শুনলে বিশ্বাসই করতো না।

এমনি একটা সরস অভিজ্ঞতা ঘটে গেল একদিন মণ্ডলের।

কিন্তু হরি মণ্ডল দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে লাগলো মনে মনে আর আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে রইলো আড়ালে।

তুলসীর সঙ্গে কথা কইছে নিতাই।

নিতাই বললো, 'সকলের কাছে শুধাও তোমার অস্তাদের খবর—মোর কাছে তো শুধাও না।'

তুলসী বললো, 'তোমারা বাপের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। ঘরের বার ক'রে দেবে মোকে।'

নিতাই বললো, 'আমিও তো একটা মানুষ আছি সংসারে—না কি !'

তুলসী ভয়ে ভয়ে বললো, 'তোমাদের মোর ডর লাগে।' বলতে বলতে চোখ ছল ছল করে মেয়েটার।

'মণ্ডলের বলদা'র মধ্যে যে পুরুষটা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল সে বোধ হয় জেগে ওঠে হঠাৎ। এবং জেগে উঠেই অনভিজ্ঞ বোকার মতো হঠাৎ আস্ফালন সুরু ক'রে দেয়। যেন জ্বালা ধরে যায় তার নিজেরি অক্ষমতায়। নিতাই বললে, 'জানি সবাই মোকে বলদা বলে—চুপ ক'রে কাজ ক'রে যাই। কিন্তু ক্ষেপে উঠলে হরি মণ্ডলের বাপ এসেও ঠেকাতে পারবে না মোকে। জেনে রাখ।'

চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে যায় তুলসী। পালাবার জন্যে পা বাড়াতেই গিয়ে পড়ে একেবারে হরি মণ্ডলের সামনে। হরি মণ্ডল আগুন চোখে তাকাল একবার নিতাইয়ের দিকে। কিন্তু নিতাই নড়লো না একটুও—বরং অত্যন্ত উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে।

রাগে জ্বলছে বটে হরি মণ্ডল তবু অত্যন্ত চতুরের মতো সবটা সামলে নিয়ে তাকালো নতমুখী তুলসীর দিকে। আস্তে আস্তে বললে, 'সেই মুখি রাঁড়ীর ব্যাটার খোঁজ খবর তুমি করছো দীন দাসের ঝি—আমার কানে সে কথা অনেক আগেই উঠেছে। খবরটা বলিনি এতদিন তোমাকে—আজ বলি। সে গেছে সেই সুন্দরবন—লাট—সেই সখী রাঁড়ীর পিছু পিছু। শুনলাম—এখন নাকি তার সজেই ঘর-সংসার পেতেছে। এ পীরিতের লটঘট তার অনেক দিনের। বুঝলে ?'

নিতাই দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। তুলসীর মুখে কোনো কথা নেই।

হরি মণ্ডল আবার বললে, 'তার আশা ছাড়। বুঝলে ?' হরি মণ্ডল চলে গেল আস্তে আস্তে সেখান থেকে। যাওয়ার সময় ডেকে গেল নিতাইকে, 'শুনে যা নিতাই।'

নিতাই অত্যন্ত বেপরোয়ার মতো চললো বাপের পেছনে পেছনে। ঠিক পিঠে পিঠেই তার পায়ের শব্দ শুনছে হরি মণ্ডল—ঠিক ভয় নয় বুড়োর, তবু কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে তার। দাওয়ায় এসে বসলো মণ্ডল গুম হয়ে। তামাক খেল অনেকক্ষণ ধরে। এবং গোটা সময়টা ভাবলো মনে মনে—কি বলবে এই হঠাৎ জেগে ওঠা একটা জোয়ান মরদকে। অনেকক্ষণ পরে ভেবে ভেবে খেঁকরে উঠে বললে, 'বলদগুলোকে মাঠ থেকে ঘরে আনতে হবে তো—নাকি!'

নিতাই চলে গেল।

তার পরেও হরি মণ্ডল বসে বসে ভাবলো আকাশ পাতাল অনেক কিছু। চৌকো বুড়ো মুখটাকে কুটিল চিন্তায় ভয়ানক ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখায়। মনে মনে বলে—একটা বিহিত ক'রে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি।

এই বিহিতটা যে খুবই তাড়াতাড়ি করে ফেলা দরকার—হরি মণ্ডল তার পরের দিনই এটা বুঝলো আরও ভালো ক'রে। ঘটনাটা ঘটলো পরের দিন সন্ধ্যের মুখোমুখি। নিতাই গোয়াল ঘরের কাছে বলদগুলোকে বিচালী দিচ্ছিল। ধারে পাশে কেউ ছিল না আর। ঠিক এই সময়েই কি সময় হলো তুলসীর—ছল ক'রে নিতাইয়ের সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার!—আগুন ধরে যায় মণ্ডলের বুড়ো রক্তে।

এর পরে আবার নিতাইয়ের তরল গলার ডাক শোনা গেল, 'আগো দীন দাসের ঝি!'—

হরি মণ্ডল আড়াল থেকে দেখলো, তুলসী থম্‌কে দাঁড়িয়েছে।

'শুনে যাও কাছে এসে।' নিতাই ডাকলো।

তুলসী কিন্তু চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

নিতাই বললো, 'ওস্তাদ ছাড়া আর কারোকে কি পছন্দ হয়নি নাকি গো? শুনি তোমার হিয়ের খবর। আরে একটা কথাই বলে যাও।'

তুলসী মুখ গোঁজ ক'রে চলে গেল। কিন্তু কোথায় গিয়েছিল কি জানি—ফিরে এলো আবার একটু পরে, সেই পথে। এবার 'মণ্ডলের বলদা' ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো তাকে। একেবারে কোলপাঁজা ক'রে তুলে নিয়ে গেল অন্ধকার গোয়াল ঘরের ভেতরে।

তুলসীর গলা শোনা যায় শুধু, 'চেঁচাবো—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।'—

'তা হলে গলা টিপে শেষ ক'রে ফেলাব এইখেনে।' নিতাই হাঁসফাঁস ক'রে বললে, 'টুঁ শব্দটি করলে শেষ করে ফেলাব একেবারে।—কতবড় মেয়ামানুষ তুমি হে!'—

দুটো বলিষ্ঠ বাহুর চাপে দম আটকে আসছে তুলসীর। সত্যিই কি তাকে মেরে ফেলবে এই লোকটা! সমস্ত দেহ তার অবসন্ন হয়ে আসছে ভয়ে। নিতাই তখনো মাটিতে ঠেসে ধরে আছে তাকে। একটা অজগর যেন শিকার গিলবার আগে তাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে নিস্তেজ করে আনছে। তারপর হঠাৎ সে অজগরটা যেন ছিটকে সিধে হয়ে দাঁড়ালো প্রচণ্ড আঘাতে। তার পিঠের ওপরে পড়ছে তখন অন্ধ ক্রুদ্ধ হরি মণ্ডলের বাঁশের লাঠি—ধপাধপ।

'তোর এই কাম শালা, তোর ···'

তারপর আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ হরি মণ্ডলও কোথায় ছিটকে পড়লো অন্ধকারে—মাথায় চোট লেগে ঝিম ধরে যায় যেন। চোখে আর কিছু দেখা যায় না—কানে এসে লাগে না আর কোনো মেয়ের ফোঁপানি আর করুণ কাতরানির পুনরারম্ভ।

পরের দিন হরি মণ্ডল ডেকে পাঠালো চরের সমস্ত চাষীকে। পুবচর ছুটে এলো আগ্রহে—উৎকণ্ঠায়। কি জানি কি বলবে মাতব্বর—কি খবর এনেছে চৌকিদার কে জানে। তারা এসে হাঁ-করে চেয়ে

বসে রইলো হরি মণ্ডলের মুখের দিকে। সে মুখটাকে আজ মনে হচ্ছে ভয়ানক গম্ভীর। হরি মণ্ডল চুপচাপ বসে আছে, অপেক্ষা করছে চরের সকলের জন্যে। একে একে সবাই যখন এলো তখন মণ্ডল আস্তে আস্তে দিব্যি গুছিয়ে গাছিয়ে বললে তার কথা।

সব্বাই শুনলো—বুড়ো হরি মণ্ডল বিয়ে করবে তুলসীকে।

হরি মণ্ডল বললো, 'মত দাও তোমরা। মোর ঘর সংসার দেখার জন্যে ডাগর একটি মেয়ার দরকার ছিল। তাই ভাবলাম—এই অনাথাকেই বিয়ে-সাদি করি। কোথায় ভেসে যাবে, কি করবে! কি বলো তোমরা?'

'এ তো আনন্দের কথা মাতব্বর।' মদনা বলে উঠল।

এই কথারই প্রতিধ্বনি করে সবাই।

এ পঞ্চায়েৎ সভায় দেখা গেল না শুধু নিতাইকে। সে কোথায় চ'লে গেছে কাল সন্ধ্যের পর থেকে।

১৩

তুলসীর সঙ্গে হরি মণ্ডলের বিয়ে-থা চুকে গেল এক দিন। চরের সবাইকেই নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল হরি মণ্ডল—সবাই এলো, পেট ভরে খেয়ে আমোদ আহ্লাদ করে গেল। চুকে-বুকে গেল এইখানে ওস্তাদ আর তুলসীর কথা। পুবচরের যারা একদিন এই বিয়ের জন্যে মেতে উঠেছিল তারাও যেন ভুলে গেল সে সব পুরানো কথা। মোনার মতো শুধু কয়েকজন—যাদের মনে মনে একটা অস্বস্তি ছিল তুলসীর জন্যে, তারাও মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে-থা চুকে যাবার পর একেবারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো: যাক একটা গতি হয়ে গেল অনাথা মেয়েটার। এ নিয়ে তাদের আর ভাববারও সময় নেই। সমস্ত মন জুড়ে আছে এখন তাদের পুবচরের ভাঙা বাঁধটা। সেটা হাঁ-ক'রে দিন রাত্রি চেয়ে

আছে মূর্তিমান সর্বনাশের মতো—তার কাছে জীবন, যৌবন, হিয়ের কথা, ঘর সংসার—সব তুচ্ছ হয়ে গেছে এখন।

তুলসীকে নিয়ে কথা যেটুকু ওঠে সে পশ্চিম চরে—মেয়েদের মধ্যে। সে কথা তুলসীর ভাগ্যেরই প্রশস্তি। গোটা পুবচর আর পশ্চিমচরের লক্ষ্মীছাড়া চাষীদের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী আছে একমাত্র হরি মণ্ডলেরই ঘরে। গোয়াল ভরা তার গাই-বলদ। গোলায় আছে ধান। উঠবন্দী প্রজা সে নয় চরে—তার নিজের জমি-জিরেতও আছে। ভাগ্য ভাল বৈরাগী দীন দাসের ঝি তুলসীর, অমন ঘর-বর জুটে গেল! আর বয়সের তফাৎ? চরের বুড়ীরা কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলে:

'উ সব ছেনালী কথা ছুঁড়িদের। পুরুষ মানুষের আবার বয়স কি লা!'

'মণ্ডলের বল্‌দা গেল কুথায় বলো।' কে একজন হঠাৎ অদৃশ্য সেই ছোঁড়াটার কথা তুলে বসে।

একটি বুড়ী জবাব দিল, 'বাপের বিয়ে ব্যাটাকে দেখতে নাই—মণ্ডল তাই তাকে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে বোধ হয়। তা ছাড়া জোয়ান ব্যাটা। মণ্ডল বোঝে তো সব।'

আবার কে তুলে বসে কথাটা, 'ব্যাটার সঙ্গেই বিয়ে দিলে পারতো মণ্ডল।'

'উ সব হিয়ের কথা লো—কার হিয়ের খবর কে বোঝে!'

হরি মণ্ডলের প্রৌঢ়া বোন ভামী হুঁ হুঁ ক'রে হেসে বললে, 'উ কথা আর বোলোনি। কে জানতো বলো—দাদার হিয়ের মধ্যে এত কথাও ছিল। শুনি আর হেসে বাঁচিনে।'

'এ্যাঁ—শুনেচিস! কি শুনলি!'

কৌতূহলে এবার এক হয়ে যায় সবাই। মেয়েলি কৌতূহলে বয়সের বাঁধন নেই।

ভাবী হাসতে হাসতে বললে, 'সে সব রঙ্গ-রসের কথা। দাদার যেন নবীন জৈবন এসেচে।'

ওরাই কথা বলে, ওরাই সদলে দম বন্ধ ক'রে শোনে। আর নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে, অতর্কিত দুর্ভাগ্যের ঘোর যখন তার কাটলো কদিন বাদে, তখন রোজ সে নির্জন দুপুরে ঘাটে এঁটো বাসন ধুতে গিয়ে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ গাঙের জলরাশির দিকে তাকিয়ে কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এই খবরটা তার কেউ জানলো না।

পশ্চিম চরের এক প্রান্ত থেকে ঘোমটা তুলে সে চোখ মেলে চেয়ে থাকে পুবচরের দিকে। আশ্চর্য! কেমন ছন্নছাড়া লাগে। কোনো দিন সেখানে আনন্দ কোলাহল উঠেছিল, তার জীবনের কত আশা ও স্বপ্ন এক দিন উতরোল হয়ে উঠেছিল একান্ত গোপনে—সে-সব আজ যেন মিথ্যে বলে মনে হয়। জৈষ্ঠের রোদে পোড়া দুপুর কেমন বিষণ্ণ আর নির্জন। ধূ-ধূ করছে পুবচরের নোনা জলে পোড়া মাঠ, ঘাসের সবুজ আভাটুকুও কেমন জ্বলে তামাটে হয়ে গেছে। তারও পুবে গাঙের অগাধ জলরাশি টলমল করছে দিকচিহ্নহীন কূলে। এই বিরাট শূন্যতার মাঝখানে কোথাও যেন একটু আশ্বাস নেই, বন্ধনের মায়া নেই। তারই অপ্রত্যাশিত ভাগ্যের মতো।

এমনি দিনে হঠাৎ একদিন ডুম-ডুম ক'রে বেজে উঠলো চৌকিদারের ঢোল পুবচরের বাঁধের ওপরে। ঢোল থামলে শোনা গেল চৌকিদারের টানা হাঁক—

··· পরগণা জঙ্গলমহাল তরফ জালপাই-নন্দিগ্রাম নাকচর এলাকাধীন পুবচর বাতিল। মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারত সরকারের অধীন জেলা মেদিনীপুর ··· পরগণা জঙ্গলমহাল ··· ডুম্ ডুম্ ডুম্ ···

পুবচরের লোক ছুটেছে ঢোলের শব্দ লক্ষ্য করে। ভিড় জমছে একটি দুটি ক'রে—তারপর সারা পুবচরের মরদ ছেলেপুলে। কচি

ছেলেমেয়েগুলোকে কোলে ক'রে হাঁ করে চেয়ে আছে মেয়েরা। এতদিন পরে নির্দেশ এলো সরকারের ওপরতলা থেকে :

পুবচর বাতিল।···

চৌকিদার গম্ভীর মুখে ঢোল পেটাচ্ছে, আর মুখের বুলি দম দেওয়া কলের মতো তার পেছনে গম্ভীর মুখে চলেছে একজন পেয়াদা, হাতে সরকারী ছাপমারা একটা হলুদে কাগজের নোটিশ। পুবচরের চাষীরা যেন বুঝতে পারে না ওদের কথার প্যাঁচ। বোকার মতো ঘোরে কিছুক্ষণ ওদের পেছনে পেছনে। জিজ্ঞেস করলেও কেউ কোনো কথা বলে না।

মদনা ছুটে গিয়ে চেপে ধরে শেষ পর্যন্ত চৌকিদারের ঢোল বাজানো হাত দুটো, 'আহা—দুটো কথা বল না গো চৌকিদার।'

চৌকিদার হুংকার দিয়ে উঠলো, 'ছেড়ে দাও বলছি এখন—সরকারী কাজ, ছেড়ে দাও।'

ডুম ডুম ডুম ··· প্রাণপণে ঢোল পিটোতে লাগলো ক্ষুদিরাম।

পশ্চিম চরের চাষীরাও জড়ো হয়েছে এসে। হরি মণ্ডল ছুটে এসেছে ঢোলের শব্দ শুনে।

মোনা চেপে ধরলে গিয়ে পেয়াদার হাত। বললো, 'মোদের বুঝিয়ে বলো দাদা। বাঁধে মাটি পড়বেনি তা হলে?'

'শুনছো তো পুবচর বাতিল করে দিল সরকার।' পেয়াদা দাঁত খিচিয়ে উঠলো।

'তা হলে এ চরে আর চাষবাস হবেনি?'

'বাতিল।'

'মোরা তবে যাব কোথায় গো? খাব কি? মোদের কথা কিছু বলেনি সরকার?'

কে দেয় এ বোকা চাষীর কথার জবাব।

ডুম ডুম ডুম ··· তরফ জালপাই-নন্দিগ্রাম নাকচর এলাকাধীন ··· পুবচর বাতিল ···

ঢোল শহরৎ ক'রে পেয়াদা চৌকিদার চলে গেল। পুবচরের চাষীরা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ভাঙা বাঁধের ওপরে। মাঝখানে ওদের স্তব্ধ হরি মণ্ডল।

মোনা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'কি হবে মণ্ডল ?'

হরি মণ্ডল শুধু বললো, 'কপাল !'

মোনা বললো, 'গাঙের নোনা বান খেয়ে মোরা কি সব তবে ভেসে যাব ?'

হরি মণ্ডল বুদ্ধি বাৎলে বললে, 'একবার মালিকের কাছে গেলে পার। ধরে পড়লে যদি বাঁধে মাটি দেয়। সরকার তো এক কলমের খোঁচায় চর বাতিল ক'রে দিল। সব কপাল !—কপালের দোষ !'

'তুমি চরের পুরানো লোক, চর হাঁসিল করেছ মণ্ডল।' মোনা বললো, 'মালিকের কাছে তুমিও চলো। তুমি বললে আরো ভালো হবে। মোরা তোমার পেছনে থাকবো।'—

'বেশ চলো।'

সেই দিনই চলে গেল ওরা মালিকের কাছে দরবার করতে। মালিকের সামনে হরি মণ্ডল দাঁড়ালো হাত জোড় ক'রে। সুরু করলো মাতব্বরী সাধু ভাষায়, 'হুজুর, মোদের একটা নিবেদন আছে।'—

কিন্তু নিবেদন শুনে মালিক বরদাকান্ত বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মণ্ডল! সরকার যেখানে সাহস করছে না—সেখানে আমরা তো তুচ্ছ। ঐ সর্বনাশী গাঙের মুখে পুবচর টিকবে এ বর্ষায় ? তুমি পুরানো লোক—গাঙের গতি তো বোঝ তুমি।'

'এতগুলি চাষী হুজুর—কাচ্চাবাচ্চা ইস্ত্রি নিয়ে কোথায় যায় আপনি না বাঁচালে।'

'মাথা খারাপ।' মালিক বিরক্ত হয়ে বললে, 'বাঁধে মুঠো মুঠো মাটি দিয়ে ওই সমুদ্রকে রুখবে!'

'ঘাসের চাপড়ি ক'রে দেখলে হতো হুজুর।'

'ঘাসের চাপড়ি! ঘাসের চাপড়ি!' কথাটা বার কয়েক আউড়ে মালিক বিরক্ত হয়ে সাফ জবাব দিল, 'অতগুলো টাকা পয়সা খরচ ক'রে ছেলেখেলা! ও চরের আশা আর আমরা রাখি না মণ্ডল, ওর সবটা কোনদিন চলে যাবে গাঙের তলায়।'

মোনা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না—ডুকরে উঠলো, 'আপনার অনেক আছে হুজুর, কিন্তু মোদের ওই পুবচরের মাটিটুকুন গেলে যে সব গেল।'

মালিক সাফ জবাব দিলে, 'চলে যা চর ছেড়ে।'

'এত দিনের ঘর সংসার ফেলে, ছেলেপুলের হাত ধরে কোথায় যাই কত্তা বল।'

'আর কোনো চরে। চলে যা সুন্দরবন—লাট।'

একই কথা বার বার করে বলতে, এই বোকা চাষীগুলোকে একই কথা বার বার ক'রে বোঝাতে যেন কষ্ট হচ্ছিল মালিকের। শেষ পর্যন্ত শেষ কথা বলে গট্ গট্ ক'রে বরদাকান্ত উঠেই চলে গেল বৈঠকখানা ছেড়ে।

পুবচরের চাষীরা তাকালো সবাই একবার হরি মণ্ডলের দিকে। তারপর চোখ ভরে দেখলো পরস্পরের হতাশ পাণ্ডুর মুখ।

হরি মণ্ডল বললো, 'চলো যাই।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠলো সবাই নিঃশব্দে।

বাইরে এসে হরি মণ্ডল বললো আস্তে আস্তে, 'সব কপাল! বুঝলে?'

শুধু আর একটা মাস বাকী। তারপরেই নামবে বর্ষা। আকাশে দেখা দিয়েছে মৌসুমী মেঘের পূর্বাভাষ। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র-বুক

ছেড়ে জ্যৈষ্ঠের বিদীর্ণ মাঠের ওপরে ছায়া ফেলে উড়ে চলেছে দক্ষিণ বায়ুতাড়িত মেঘের দল। জল ঢেলে দেওয়ার জন্যে ওরাই আবার ছুটে আসবে একদিন। দেরি নেই আর বেশী। পশ্চিম চরের চাষীরা মাঠে নেমে পড়েছে একে একে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বৃষ্টিও হয়ে গেল এক পশলা। যে চাষী জলের আশায় বসে ছিল এতদিন হাত গুটিয়ে—সে-ও নেমে পড়লো এবার পশ্চিম চরের মাঠে। সুরু হয়ে গেল কঠিন মাটির সঙ্গে গোরু আর মানুষের টানা জীবন-সংগ্রাম।

নোনাজল খাওয়া বাতিল পুবচর হা-হা করছে তখন। ভাঙা বাঁধটা গাঙের পাশে পড়ে আছে অতিকায় একটা মরা জন্তুর মতো। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পুবচরের মেয়ে মরদেরা। আর মনে মনে চঞ্চল হয়ে ওঠে পশ্চিম চরের মাঠের দিকে চেয়ে—যেখানে বলদ আর মানুষ মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে তাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর শয্যা রচনা করছে। ছটফট করে চাষীর মন—নির্মম ভাগ্যের সামনে কোনো পথ যেন খুঁজে পায় না। মেয়েরা চেয়ে থাকে তাদের মরদদের হতাশ পাণ্ডুর মুখের দিকে। অন্যমনে স্তন দেয় শিশুদের।

মদনা হাউ-মাউ করে, 'ই কি হলো মোদের কপালে! কি করি বলো এখন?'

মোনা বললো, 'চলে যেতে হবে।' একটা ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'চরের আশা নেই আর।'

'কোথায় যাবো গো দাদা!' মদনা আবার হাউ-মাউ করে উঠলো, 'জন্মেই দেখেছি এই চর। আমার মাথায় যে কিছু আসছে না। বর্ষা এসে পড়ল এদিকে।'

মোনা বললো, 'আমি যাব সুন্দরবন। নতুন আবাদী জায়গা, যাই দেখি। আর কোথায় যাব বলো?'

মদনা কেঁদে ফেললো আবেগে, 'এই ষোলকোশী গাঙ পার হয়ে!'

'উপায় কি !'

হরি মণ্ডলও তাই বলে, 'উপায় কি ? সব কপাল !'

সেই মন্দভাগ্য কপালকে মেনে নিয়ে পুবচরের চাষীরা এবার চর ছাড়ার আয়োজন সুরু করে। মোনা অগ্রণী। বলদ বেচে দিল সে পশ্চিম চরের চাষীদের কাছে—সুন্দরবনে গিয়ে ফের কিনবে, জমি জায়গা বন্দোবস্ত করে ঘর বাঁধতে পারলে। বীজধানটুকু বেঁধে নিল মোট ঘাটের সঙ্গে। বউ তার মুখ শুকনো করে মোটঘাট বাঁধে। আড় চোখে তাকায় স্বামীর দিকে। লোকটা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হতে হতে একেবারে শুকনো একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে গেছে। কেমন ভয় ভয় করে বউটার।

মদনা এলো খোঁজ নিতে। বললো, 'হলো তোমাদের ?'

মোনা খেঁকরে উঠলো বউয়ের ওপরে, 'কি যতো রাজ্যের হাঁড়ি কলসী টেনে জড়ো করিস। লাথি মেরে ভেঙে ফেল ও গুলান।'

বউটা ভয়ে থতোমতো খেয়ে দাঁড়ালো। ভয়ে ভয়ে বললে, 'লোব না ? ঘর সংসারের জিনিস ?'

'তোর সংসার !' মোনা দাঁতে চিবিয়ে বললো, 'কোথায় কোন গাছ তলায় গিয়ে মাথা ঠুকতে হবে তার ঠিক নাই। ঘর-সংসার !'

সহজেই বলে কথাগুলো মোনা। কিন্তু বউটাতো ভেবে পায় না কোনটা ফেলে যাবে সে ? প্রতিটি জিনিস তার বহুদিনের হাতের ছোঁয়ায় লালিত। ঘরের কোণের মেয়ে-মন আজ হদিস পায় না, এই ঘর ছেড়ে যাওয়ার দিনে কোনটা ফেলে যাবে সে !

মোনা বললো, 'নে তাড়াতাড়ি। তোদের সব হয়ে গেছে মদনা ?'

'হ্যাঁ গো দাদা, তোমার জন্থেই বসে আছি মোরা।'

এ নতুন অজ্ঞাত পথের মুরুব্বি ক'রে নিয়েছে ওরা মোনাকে। ওদের মধ্যে ওই লোকটাই বোঝে-সোঝে ভালো, বলতে কইতেও পারে। সবাই তাকেই অনুসরণ করে বলদ বেচেছে, বীজধান বেঁধেছে. শেষে রওয়ানা দেয় সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে।

ছেলেমেয়ের হাত ধরে বউকে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরুলো মোনা। মোট হয়েছে ছুটো। হালকাটা নেবে মোনার বউ, ভারিটা সে নিজে। মোনা মুখ গোঁজ ক'রে মোট তুলে নিতে যাচ্ছিল মাথায়, বউটা পেছন থেকে মিনমিন করে বলে উঠলো, 'একটা গড় করবে না ঘরের দেবতাকে!'

থমকে দাঁড়ালো মোনা, তাকালো একবার বউয়ের দিকে। তার রূঢ় দৃষ্টি হঠাৎ যেন বহু দিনের এই ঘরটার নাম শুনে ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে গলে নরম হয়ে এলো মোমের মতো।

'যতো হোক, ঘরের দেবতা'··· বউটা বললে ফের ভয়ে ভয়ে।

কাঠের গুঁড়ির মতো কঠিন জমাট লোকটা এবার হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে ওঠে হাবাগোবা মদনার মতোই।

'ঘরের দেবতা ··· ঘরের দেবতা মোর—থাকতে দিলি না সব্বনাশী। বেরোলাম ছেলেপুলের হাত ধরে আজ পথে।' বলে ঘরের দাওয়ায় মাথা ঠুকে একটা গড় করে সে। মাথা তুললে যখন—তখন চোখ ভেসে গেছে তার অঝোর জলে।

প্রথম চর-ছাড়া দল। ছেলেমেয়ের হাত ধরে বোঁচকাবুচকি মাথায় নিয়ে চলে গেল পুবচরের ভাঙা বাঁধের পাশ দিয়ে খেয়া ঘাটের দিকে। চেয়ে চেয়ে দেখে পশ্চিম চরের চাষীরা—কেউ কেউ যায় অনেক দূর পর্যন্ত ওদের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের মধ্যে মাতব্বর হরি মণ্ডল একজন। অনেক কথা বলে মণ্ডল, অনেক আজগুবি আশার কথা। হয়তো মাতব্বর সান্ত্বনাই দিতে চায় ওদের।

'চর' যদি গাঙের তলায় না চলে যায় তবে চলে এসো সব আবার। তখন দেখবে, এই বাতিল চর আবার আবাদী হয়ে উঠেছে।' তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সব কপালের খেলা!'

পুবচরের চাষীরা শোনে ভারি মন নিয়ে। তারা কোনো কথা বলে না। নীরবে পথ চলে। কথা বলে শুধু হরি মণ্ডল। তার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ পা যেন সকলের ভারি হয়ে আসে বেদনায়।

এমন সময় শোনা যায় দূর থেকে খেয়া নৌকোর হাঁক :

'হে-ই ··· সুন্দরবন মরিচ খালি—ই।' ···

স্বপ্ন থেকে চমকে জেগে ওঠে যেন মোনা। হ্যাঁ, হরি মণ্ডলের কথায় সে স্বপ্নই দেখছিল। চমকে উঠে সামনে থেকে হাঁক দেয় সবাইকে, 'চলো হে—পা চালাও জোর।'

প্রথম দল আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরে। দাঁড়িয়ে দেখলো পুবচরের অবশিষ্ট চাষীরা। চোখে অর্থহীন শূন্যতা। তেমনি আরও একটি মেয়ে দেখলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিম চরের এক প্রান্ত থেকে, সে তুলসী। মনের ভেতরটা তার হু-হু করছে পরিত্যক্ত বাতিল জনবিরল পুবচরটার মতো। বোবা চোখ দুটো যেন শুকনো উপোসী মরুভূমি।

১৪

পুবচরের অধিকাংশ চাষীই মোনার সঙ্গে চলে গেল সুন্দরবন। বাকী আছে মাত্র কয়েক ঘর—সাবধানী ভীরু চাষীরা। গাঙের ওপার—বিদেশ হাজার হোক, তাতে তাদের ভয়। সেখানে গিয়ে কোথায় কি হাল হবে কে জানে! সেখানকার সমস্ত অবস্থাটা জানবার জন্যে ভাকু দাস গেছে মোনার সঙ্গে। তার পথ চেয়ে বসে আছে বাকী চাষীরা। সে ফিরে এলেই ডেরা তুলবে এরা এখান থেকে। কোথায় যাবে—ঠিক-

ঠিকানা নেই। ওদিকে বর্ষার মৌসুমী কালো মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে সারা আকাশময়, দু-এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে, সুরু হয়েছে বৃষ্টি-ভেজা পুবালী বাতাস। চন্‌মন্‌ করছে চাষীর মন—ফসল ফলানো আশা। পশ্চিম চরের মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আরও বেশী ছট্‌ফট করে তারা—সেখানে সারা মাঠ জুড়ে সুরু হয়ে গেছে আবাদ। আর তাদের বাতিল পুবচরের মাঠের ঘাস পচে উঠলো নোনা জলে।

দিন কয়েকের মধ্যেই ভাকু দাস ফিরে এলো সুন্দরবন থেকে। বললে, 'মোনা মিছা কথা বলেনি হে। উদম চর পড়ে আছে—নতুন আবাদি চর। চাষ করো যে যতো পারো।'—

'বলদ গোরু?'

'বলদ-গোরুর কাম কি?' ভাকু বললে, 'জঙ্গল কেটে নতুন আবাদ—শুধু মাটি আঁচড়ে ধান বুনে দাও, তারপর কাটো শালা খেজুরের কাঁদি।'

বোকা-বোকা চোখে চেয়ে থাকে সবাই তার দিকে। বিদেশ-ভীরু চোখে একটা দুরন্ত লোভ হঠাৎ ঝিকিয়ে উঠে মিলিয়ে যায়।

'চলো তবে। না-কি?'

'আর উপায় কি!'

ওরাও যাবে সুন্দরবন—কথাটা চলে যায় পশ্চিম চরে। খালি হয়ে যাবে পুবচর—এতদিনের চেনা জানা লোকগুলি! ভালো লাগে না যেন পশ্চিম চরের চাষীদের। মাঠের কাজের শেষে তারা আসে পুবচরের চাষীদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতে। আসে মাতব্বর হরি মণ্ডলও। এসে বসে নফর মণ্ডলের দাওয়ায়।' তাকে দেখেই নফরের মুখটা ভারি হয়ে যায়। হরি মণ্ডলকে আজকাল আর সহ্য করতে পারে না নফর। তবু লোকটা আসবে রোজই একবার ক'রে আর এসেই হাসতে হাসতে বলবে:

'কি গো, তোমার সাঙাতের খবর কি ?'

চুপ ক'রে হজম ক'রে গেছে নফর—কারণ এখন হরি মণ্ডল প্রবল। ...ে গেছে তার সাঙাতের প্রাণ-নাচানো আসর।

সেদিন হরি মণ্ডল হাসতে হাসতে বললো, 'সবাই যে চললো ...মার সাঙাতের দেশে হে নফর।—'

আর রাগ সামলাতে পারলো না নফর সেদিন, চটে বললে, 'যাবে ...কি বড় মণ্ডল—মানুষ নাম যার, যার প্রাণ আছে সেই পালাবে ...াতের দেশে। জানোই তো, এ চরে সে যখন ছিল তখন ছিল অন্য ...ক রকম, সকলকে মাতিয়ে রেখেছিল আনন্দে। সে চলে গেল—দেখ ...রের অবস্থা।'

'মা গঙ্গা গিলে খেতে এলো সবাইকে! বড় ভালো বলেছ নফর।' ...সে হে-হে ক'রে হাসতে লাগলো হরি মণ্ডল। বললো, 'তামুক দাও ...র—তামুক দাও খাই। বড় ভালো বলেছ কথাটা।'—

তামাকের গাড়ুটা নফর রাগ করেই হরি মণ্ডলের সামনে বসিয়ে ...ল ঠক্ করে।

ও সব সূক্ষ্ম রাগের ইঙ্গিত যেন স্পর্শও করে না হরি মণ্ডলকে। হরি ...ণ্ডল ধীরে সুস্থে তামাক সাজলো বসে বসে। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ...ড়ে বললো আবার:

'বেশ বলতে কইতে পার তুমি নফর। হাজার হোক যাত্রার দলে ...জ করো তো।'—

নফর চুপ।

হরি মণ্ডল আবার বললে, 'ঠিক বলেছ। কেমন দিব্যি আখড়া ছিল ...নার এখেনে—মেয়ে মরদ ছুটে আসতো সবাই।—সব ভেস্তে গেল।'

নফর তবু চুপ। হরি মণ্ডলকে দেখছে সে এক দৃষ্টে কটমট করে। ...ায়া লোকটা তারই দাওয়ায় বসে তারই তামাক পোড়াতে পোড়াতে

কথার প্যাঁচে প্যাঁচে অন্তর-টিপুনি দিয়ে কথা কইছে কেমনতরো। দাঁতে দাঁত চেপে দেখছে নফর।

হরি মণ্ডল হেসে বললে, 'তবে ভয় নাই—সাঙাৎ তোমার লাটে হয়তো নতুন আখড়া গুলজার করে তুলেছে। দেখবে যাও। মোরাই এখেনে শালার চাষ-আবাদ নিয়ে ভয়ে ভাবনায় পচে মরছি। দিব্যি আছে সে সেখানে। ওই সখী ছুঁড়িটাও জুটেছে গিয়ে—হে-হে, কি বলো।'—

এবার নফর ফেটে পড়লো রাগে। বললো, 'উঠে যাও তুমি মোর দাওয়া থেকে—উঠে যাও বলছি।'

মাতব্বর হরি মণ্ডল অবাক হয়ে তাকালো নফরের দিকে। সবটা কেমন তার কাছে অপ্রত্যাশিত। এমন সাহসের কথা শোনেনি আর কখনো সে। নফর বলছে কি তাকে!

'তোমাকে অনেক মান্য করেছি এতদিন—আর না। উঠে যাও তুমি।' নফর একরোখা গলায় এগিয়ে এলো দু-পা। যেন তেড়ে এলো। তারপর নিজেই সে চলে গেল দাওয়া ছেড়ে পথে। এগিয়ে চললো হন্ হন্ করে।

এসে উঠলো একেবারে ভাকু দাসের দাওয়ায়। ভাকু দাসকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমরা সবাই লাট যাচ্ছ?'

'সেই রকমই তো ঠিক করেছি মোরা সব।'

'মোকেও নেবে তোমাদের সঙ্গে?'

'কে কার সঙ্গে যায় বায়েন!' ভাকু দাস ম্লান হেসে বললে, 'মোর চলেছি কপাল সঙ্গে করে।'

'আমিও যাব।'

'কিন্তু তোমার যাত্রার দল?'—

'বর্ষা নামলে তো গাওনা বন্ধ ক'মাস। তারপর যে জমিটুকুন ছিল মোর—সে তো চলে গেল বাতিল চরে। তাই ভাবছি চলে যাই তোমাদের সঙ্গে।'

'মোদের ছুঃখের কপাল!—সঙ্গে যাবে—চলো।' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাকু দাস বললে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে নফরেরও। বললো, 'গাওনার কথা বলছো—তার যখন আবার সময় আসবে তখন হবে ভাই। এখন এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই। এখানে ও লোকটা মোকে টিকতে দেবে না।'

'কে গো?'

'বড় মণ্ডল।'

'কি করলো সে?'

'পরে বলবো সব। এখন পালাতে পারলে বাঁচি। সাঙাৎ চলে গেল কোথায় না কোথায়, তোমরাও চলে যাচ্ছ সব—চর মোদের ফাঁকা। বড় মণ্ডলের কাছে আমি একলা পড়ে গেলাম, থাকতে পারবো না। কখন যাবে তোমরা বলো দেখি?'

'কাল সকালে।'

'বেশ।'—

যেমন এসেছিল ঝপ্ ক'রে—তেমনি চলে গেল নফর। গিয়ে বাঁধা ছাঁদা স্বরু করে দিল যাওয়ার।

কিন্তু এ ভালো লাগে না নফরের বউয়ের। তার এতদিনের ঘর-সংসার! সে-ও কোন এক চরের মেয়ে—বিয়ে হয়েছিল এই চরে, সে কত দিন আগে! ছেলেমেয়ে হয়েছে চার-পাঁচটি। সবাই চলে যাচ্ছে চর ছেড়ে দেখে ভালো লাগেনি তার, কেমন হঠাৎ ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। তবু ছিল তার নিজের ঘর—ছেলে মেয়ে ঘেরা একটু সংসার। সেইটে ফেলে তাকেও চলে যেতে হবে শুনে বুকটা কেমন টনটন করে ওঠে তার। কাজে মন না লাগলেও গোছ-গাছ করে সে স্বামীর সঙ্গে।

সন্ধ্যের পরে নফর বেরুলো তার বাঁশীর বাক্সটি নিয়ে। নফরের বউ অবাক হ'য়ে বললো, 'ওটা নিয়ে আবার কোথায় চললে?'

'বেচে দেবো বউ।'

'বেচে দেবে?'

'এখন এর আর দরকার কি বউ! এর ডাক পড়বে লোকের গোলায় যখন ধান উঠবে। ফসলের সঙ্গে এর সুর বাঁধা বউ। সে সুর এবার কেটে গেছে। এখন তো বাঁচি একে বেচে।'

ওই এক টুকরো চোঙা—যার কিছুই বোঝেনি কোনোদিন নফরের বউ বরং একটা নিরেট চাষীর গ্রামে সবাই যেমন ওটার ওপর বিরূপ—সেও ছিল তেমনি। কিন্তু হঠাৎ আজ যেন মায়া বসে যায় সেই হেলা-ফেলার বাঁশীটার ওপরে। বললো:

'থাক ওটা—বেচো না।'

'কেন বউ, তুই তো এটাকে দু-চোখ পেড়ে দেখতে পারতিস্ না।'—নফর ঠাট্টা করে। মুখে লেগে থাকে একটা ফিকে হাসি—যেটা বড় করুণ মনে হয় হঠাৎ। জল এসে পড়ে নফরের বউয়ের চোখে। শুধু বললো:

'ওটা বেচো না তুমি।'

'না বউ—টাকার দরকার এখন, বর্ষাকালটা বাঁচতে হবে। এখন না হয় বাঁধা দিয়ে আসি মোদের দলের অধিকারীর কাছে—এ ক'মাস সে তো আর বেতন দেবে না একটা পয়সা। যাক এখন—তারপর ফসল উঠলে না-হয় ছাড় করবো।'

বাঁশীর কালো বাক্সটি বগলে ক'রে বেরিয়ে গেল নফর। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো নফরের বউ কাঠ হয়ে। সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে। অন্ধকার চরের দিকে তাকিয়ে মনে হয় তার—সব যেন কেমন হয়ে গেল। কে বলবে—তার এই ঘরের দাওয়ায় একদিন এমন সময় বাঁশী আর বেহালার ঐকতান উঠতো! সেই ঘর-দোর ফেলে চলে যাবে কোথায় না কোথায়!…

হরি মণ্ডল আবার এলো পরের দিন সকালে। এসে বসলো নফরের দাওয়ায়। নফর ছিল না। নফরের বউ বসতে একটা পিঁড়ি বের ক'রে দিলে।

হরি মণ্ডল বললো, 'তোমরাও চলে যাবে শুনে দেখতে এলাম নফরের বউ। যাও, গাঙের ওপারে নরক এবার গুলজার। সখী আছে, মুখি রাঁড়ীর ব্যাটাও গেছে। নফরাও জুটেছে গিয়ে। বুঝলে—সেই ছুঁড়িটাই টান মারছে সবাইকে এক জায়গায়।' বলে হে-হে ক'রে হাসলো হরি মণ্ডল। সরস গলায় আবার বললে, 'যাও—তামুক-টামুক দাও নফরের বউ—খাই একটুন।'

যে লোক বাঁশী বেচে দিয়ে চললো সুন্দরবন—তার সাধের বাঁশী, সে যে নরক গুলজার করতে যাচ্ছে না—এটা বুঝতে আর কষ্ট হয় না নফরের বউয়ের। তবু কাল পর্যন্ত খটকা ছিল একটু। কিন্তু স্বামীর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে আজ সে খটকা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে নফরে বউয়ের। হরি মণ্ডলের কথা শুনে বরং আজ রাগ হয় নফরের বউয়েরও। নীরস কর্কশ গলায় বললে:

'ঘরে তামুক নাই বড় মণ্ডল।'

'আহা—কত তামুক খেতাম, কত গাওন-বাজন হ'তো নফরের বউ!' মণ্ডল যেন কত আফশোস করে বললে, 'নফর কোথায় গেল?'

'বাঁশীটা বিক্রি ক'রেছে—তার টাকা আনতে গেছে।'

'বিক্রি? বাঁশী বিক্রি করে দিল!'

'হাঁ গো বড় মণ্ডল—না হলে গাঙের ওপারে নরক গুলজার হবে কি করে? দুখের কপাল যে!' খোঁচা দিয়ে বললো নফরের বউ, 'তোমার ব্যাটাও যে গেছে শুনি পিঠের দগদগে ঘা নিয়ে সেই নরকে গো!'

হরি মণ্ডল শুধু বললে, 'হুঁ।' হঠাৎ মুখটা তার কালো হয়ে যায়। গোয়াল ঘরের একদিনের সেই কেলেংকারী তা হলে অজানা

নেই এ মেয়েটার কাছে। হঠাৎ হরি মণ্ডলের মুখে আর কথা জোগায় না।

এমন সময় এসে পড়লো নফর। দাওয়ায় হরি মণ্ডলকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় যেন সে : আবার এসেছে নির্লজ্জ এ লোকটা !

হরি মণ্ডল কোনো রকমে মুখে হাসি টেনে বললে, 'তুমিও চললে তা হলে নফর ! বেচে দিলে বাঁশীটা—এ্যাঁ ! তবু একটু প্যাঁ-পোঁ শোনা যেত যে গো।'

ঝাঁটা হাতে ছুটে এলো এবার নফরের বউ, 'বেরো—বেরোও বলছি। বুড়া মড়া ! ছেলের এঁটো চাটছো, আবার মোদের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনাতে এসেছে !'

হরি মণ্ডল সভয়ে নেমে গেল দাওয়া থেকে।

আরও দু'পা তেড়ে গেল নফরের বউ, 'ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দেবো একেবারে। বুড়া ডগর। বেরোও !'

একটা বিশ্রী অশ্লীল গালাগালি দিয়ে চলে গেল হরি মণ্ডল। বলে গেল, 'আচ্ছা দেখবো হারামজাদী।'

'কচু দেখবে বুড়া মড়া। রইলো এই শ্মশান ভিটে পড়ে, দেখো।' যুদ্ধে জিতে যেন ফিরে এলো নফরের বউ। তারপর হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো নফরের সামনে এসে। বললে, 'বলো মোর গা ছুঁয়ে, যেখানে যাচ্ছ সেখানে সেই মুখপুড়ি সখী নাই—বলো।'

'তুই পাগল হলি বউ !' নফর বললো আস্তে আস্তে, 'সুন্দরবন যাচ্ছি ছেলেমেয়ে, বউয়ের হাত ধরে সেই সখীর কাছে? এই ভাবলি তুই?'

'আমি ভাবিনি। ওই বুড়া মড়া বলতে এসেছিল', আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললো নফরের বউ, 'শুনে মোর গা জ্বলে গেল।'

'ওই রকম মোর গা-ও জ্বলতো বউ ওর কথার জ্বালায়। মোর সাঙাৎকে নিয়ে খোঁচা মারতো রোজ। কোথায় না কোথায় চলে গেল সে

...নের দুঃখে। 'ও কি বুঝবে তাকে!' নফর বললে, 'ওর কথার জ্বালা থেকে এবার আমিও বাঁচবো বউ।'

১৫

তারপর একদিন পুবচর খালি ক'রে চলে গেল শেষ দল। বাতিল পুবচরের হা-হা করা নির্জন মাঠে খেয়া-পারানী ডাকের প্রতিধ্বনিটা পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল একটা ভুতুড়ে হাঁকের মতো :

'হো-ই মরিচখালি-ই-ই।' ...

সে ডাক শুনে বাতিল পুবচরের একটুকরো জমির পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক শুধু বিড় বিড় ক'রে বলে উঠলো, 'যাও, যাও—পালাও সব। পালাও পাছা সামলে সাঙাৎরা।'

সে কলিমদ্দি। পরনে এক টুকরো কালো ময়লা ট্যানা জড়ানো। হাড় জির-জির করছে ছাতির। রুগ্ন মুখটা গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা। তাতে দু-একটা পাকা চুলের ছিটে।

পাশে তার দাঁড়িয়ে ছিল বছর ছয়েকের ল্যাংটো ছেলেটা। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে কলিমদ্দি বললো, 'চল ব্যাটা, মোরাও যাই।'

'ওদের সঙ্গে সুন্দরবন যাবি বাপজান?'

'দুর ব্যাটা, মোরা যাবো কেন। ওরা সব ডর পেয়ে পালাচ্ছে।'

'তোর ডর নাই বাপজান?'

'ডর কিসের রে ব্যাটা!' কলিমদ্দি হেসে বললো, 'ওদের সব ডর লেগে গেছে গাঙ দেখে। তাই সব ছেড়েছুড়ে পালালো। মোরা পালাবনি। চল এখন যাই পছিম চর—বড় মণ্ডলের বাড়ী।'

ল্যাংটো ছেলেটাকে কাঁধে করে কলিমদ্দি হাজির হলো এসে হরি মণ্ডলের বাড়ী। মণ্ডল বাড়ী ছিল না—সামনে এসে দাঁড়াল তুলসী। কলিমদ্দি সে মুখের দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে থমকে গেল। মুখটাকে

মনে হয় তার বড় উদাসীন—বড় করুণ। কেমন একটা চাপা দুঃখের আগুনে পুড়ে যেন ঝলসে গেছে।

তুলসী বললো, 'চরের সবাই চলে গেল কলিমদ্দি ?'

'সবাই চলে গেল গো। পড়ে রইলেন শুধু আমি।' কলিমদ্দি বললো, 'বড় মণ্ডলের সঙ্গে একটু তাই শলা-পরামর্শ করতে এলেম।'

তুলসী বললো, 'অস্তাদের সাঙাৎও চলে গেল ?'

ওস্তাদ আর তুলসীর একদিনকের সেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথা কলিমদ্দিও জানে। এই মেয়েটির করুণ মুখে হঠাৎ ওস্তাদের নাম শুনে কলিমদ্দি তাকালো বিষণ্ণ চোখে। আস্তে আস্তে বললো, 'হ্যাঁ—সবাই চলে গেল।'

সব। পুবচর খাঁ-খাঁ করছে—একটিও কলকণ্ঠ আর সেখানে চমক দিচ্ছে না নির্জনতার গুমোট। তুলসীর বাপের বাড়ীর গ্রাম জনহীন। সেই গ্রামেরই একটা লোককে দেখে তুলসীর মনটা কেমন আকুলি-বিকুলি করে আজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। তারপর হঠাৎ চোখে পড়ে যায় তুলসীর—হরি মণ্ডল আসছে। মুহূর্তে সে ভয়ে ছুটে পালালো কলিমদ্দির সামনে থেকে।

হরি মণ্ডল কলিমদ্দিকে দেখে বললে, 'কি খবর দিতে এসেছিলে হে ?'

'খবর কিছু নাই বড় মণ্ডল।' কলিমদ্দি বললো, 'এসেছিলেম তোমার সঙ্গে একটু শলা-পরামর্শ করতে। এখন কি করি বল।'

'তুমিও চলে গেলে না কেন ওদের সঙ্গে ?'

'না বড় মণ্ডল—এ চরের শেষ দেখে তবে মরবো, কিরা খেয়েছি অল্লার নামে।' কলিমদ্দি বললো, 'মোর জমিজমা, গোরু, ছাগল গেছে, বাপ-মা গেছে, বউ মরেছে—দু-দুটো ব্যাটাকে পুঁতেছি এই চরে। এর শেষ দেখে মরবো মণ্ডল। আমি কসম খেয়েছি একদিন।'

'একলা থাকবে! চাষ-আবাদ ?'—

'সেই জন্যেই এসেছি মণ্ডল। তোমার সব জমি আবাদ ক'রে দেব আমি—মোকে একটুন সাহায্য করো। মোর বলদ গোরু নাই, দাও মোকে। আমি চাষ-আবাদ করি। তোমার তো অনেক আছে।'

'ওই গাঙে ভাসা বাতিল চরে আবাদ করবে?'

'হ্যাঁ মণ্ডল। খাজনা সেলামী নাই—ফসল হলে তো ষোল আনা মোর।'

'আর যদি ভেসে যায়?'

'গেল। মোর কপাল চিরকাল দুঃখের। ভিখ মেগে খাবো। তুমি শুধু বলদ গোরু দাও মোকে।'

'কিন্তু মোর আঠারো বিঘা জমি আবাদ করে দেবে?'

'দেবো মণ্ডল।'

'তুমি বোকার মতো কথাটা বললে শেখ। আঠারো বিঘা আবাদ করে নিজের জমি করবে কখন?'

'রেতের বেলা। দিন রাত মোর সমান মণ্ডল।'

'বেশ, দেবো আমি বলদ-গোরু।'

কলিমদ্দি খুশি হয়ে সেলাম ঠুকে দিল মণ্ডলকে। ছেলেটাকে কাঁধে তুলে চললো আবার পুবচর মুখো। পথে যেতে যেতে আর একবার বিড়বিড় করে বললে, 'যাও সব—আমি রইলাম। কসম।'

শুধু সে-ই রইলো—ধূ-ধূ করা জনহীন পুবচরে আর রইলো তার ছেলেটা। হরি মণ্ডলের চাষ-আবাদ ক'রে এসে নিজের জমি চষে সে। ছেলেটা ঘাস বাছে জমির। পশ্চিম চরের চাষীরা দেখে—কলিমদ্দি লাঙল ঠেলছে ঝুঁকে ঝুঁকে। তারা বলাবলি করে:

'শেখের মাথা খারাপ। এ বর্ষায় ও চরের সবটাতো চলে যাবে গাঙে।'

'বেচারীর এত খাটুনী!'—আফশোষ করে ভূষণা।

কে একজন হেঁকে বললো পশ্চিমের মাঠ থেকে, 'কত বিঘা আবাদ করবে হে কলিমদ্দি?'

'পারলে গোটা চরটা।' কলিমদ্দি যেন বিদ্রূপ করলো পশ্চিম চরের চাষীদের।

'যদি ভেসে যায়?'

'এ চর গেলে তোমরা আর কদিন। বাস! তখন তোমরাও পুবচরের মতো সব ফেলে পালাবে হে! তোমাদের দশাও হবে পুব-চরের মতো।'

কি অলক্ষুণে কথা বলে কলিমদ্দি! তাকে ঘাঁটাতে সাহস হয় না আর কারুর। পশ্চিম চরের চাষীদের মুখ থম্ থম্ করে কলিমদ্দির কথা শুনে।

কলিমদ্দি লাঙল ঠেলতে ঠেলতে বললো, 'সরকার এক কথায় বাতিল করে দেবে চর, মালিক বাঁধে মাটি ফেলবে না এক মুঠা আর তোমরা সব পালাবে বউ বাচ্চা কাঁধে করে। বুঝলে?—এই তো দেখছি নিয়ম!'

চ'ড়ে চ'ড়ে কথা বলে লোকটা—যেন সে জনহীন বাতিল চরের নবাব। আর কথা বাড়ায় না পশ্চিম চরের চাষীরা। কিন্তু খোঁচা খাওয়া একটা কথা শুধু কাঁটার মতো বিঁধে থাকে সকলের মনে—পশ্চিম চরের ভাগ্য পুবচরের মতোই হবে—দুদিন আগে আর পিছে।

মাঠের কাজের শেষে বাঁধের ওপরে এসে দাঁড়ায় ওরা দল বেঁধে। পুব দিকে তাকিয়ে দেখে—হা-হা করছে পুবচর, কিছুটা দূরে দিগন্তলীন গাঙ। সবটা যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘিরে ঘোর হয়ে আসে তখন কলোচ্ছ্বাসে ভরা শূন্য অন্ধকারটাকে মনে হয় আদি অন্তহীন সমুদ্র। তার মাঝখানে কলিমদ্দি শেখ তখনো কোথায় কোন মাঠে লাঙল ঠেলছে

ঝুঁকে ঝুঁকে—তাকে আর দেখা যায় না। শুধু শোনা যায় তার কথা—বলদ গোরুর সঙ্গে কথা কইছে লোকটা খ্যাপার মতো :

'জোরে বাপা—জোরে, সাঁজ হয়ে গেল। ওরা সব পালাবে—ভরে, ছেড়ে-ছুড়ে। আমি শুধু মরবো—শেষ দেখে যাবো এ চরের বাপা। কসম—কসম!'—

কলোচ্ছ্বাসে ভরা গভীর অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাগ হয় কলিমদ্দির কথায় পশ্চিম চরের চাষীদের—কিন্তু বড় অসহায় বোধ করে তবু। দিনের পরিশ্রম—ফসলের স্বপ্ন—অজানিত ভাগ্য, সবটা ভরে যায় অন্ধকারের দুরন্ত এক সীমাহীন কলকল্লোলে। বড় অসহায় মনে হয় এ নিঃসীম অন্ধকারে।

১৬

ধীরে ধীরে একদিন মৌসুমী নামলো।

কঠোর গাম্ভীর্য শুধু চাষীর চোখে মুখেই নয়, সারা গ্রাম ঘিরে যেন ঘনঘোর হয়ে এলো। চাষীর গ্রামের মৌসুমী গাম্ভীর্য : মেঘান্ধকার নোংরা আকাশের মতোই। কতকগুলি কুটিরের গুচ্ছ নিয়ে এক-একটি গ্রাম দূরে দূরে ছড়ানো—মাঝে বর্ষার জলে ভরা জলা। বর্ষার দিনে সারাদিন গ্রাম নিঝুম—মেয়ে মরদ মায় কাচ্চাবাচ্চা পর্যন্ত ভিড় করে গিয়ে মাঠে, জলে কাদায় বলদ আর মানুষ কৃপণ বসুন্ধরাকে যেখানে উর্বর ফলবতী করে তুলছে। জোড়া জোড়া কঠিন কর্কশ হাত চেপে ধরেছে লাঙল, গোরু আর মানুষের পায়ে ঘোলা হয়ে উঠেছে যেখানে বর্ষার চিকন জল—জোড়া জোড়া চোখে লক্ষ্য স্থির, হয়তো কখনো অন্যমনা হয়ে যায় সে দৃষ্টি অনাগত ফসলের স্বপ্নে, আঁতুড়ঘরে গর্ভযন্ত্রণা-কাতর মায়ের চোখের মতো। এক আধটা লোকের কর্মক্লান্ত-বিরক্তি ভরা কণ্ঠে ফেটে পড়ে দু-একটা খিস্তি খেউড়;

গোরুকে ওরা গালাগাল করে মানুষের মতো। তারপর আবার সব চুপ। একটানা মানুষ আর গোরুর পা ফেলার শব্দ—ছপ্ ছপ্ ছপ্।… মাঠের ব্যাং ভয়ে ডাকে না। তারা ডাকে তখন গ্রামে—প্রায় জনহীন গ্রামে। সমস্ত মানুষ গিয়ে নেমেছে মাঠে—ওপরের বর্ষা-ভেজা ঠাণ্ডার চাপে গোয়ালের ধোঁয়ার তাল খুব বেশী ওপরে উঠতে পারে না, মেঘের মতো ভেসে চলে যায় মাঠের এক পাশ দিয়ে। অধিকাংশ ঘরই নিঝুম—এ সময়ে রাঁধার কাজ ওদের একবেলা সন্ধ্যের দিকে। অনশনের দুর্দিন সবে যেন উঁকি দিতে থাকে। সে দুর্দিন ক্রমেই ঘনঘোর হয়ে আসে বর্ষা শেষ থেকে শরতে। ধানের অংকুর গজিয়ে গাছগুলি বড় হতে থাকে, তারপর ফসল। সেটা কাঁচায় পাকায় যেমন ক'রে হোক ঘরে না উঠলে অনশনের শেষ নেই। চাষীর গ্রামের এ ইতিহাস চিরকালের।

ঘুম ধরে না চোখে কলিমদ্দির, অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে হিসেব করে—ফসল ওঠার দিন-মাসের, পোয়াতীর মতো। নদীর জোয়ারের ভয় নেই তার—সে যেমন আসবে বাঁধ ভেঙে তেমনি নেমেও যাবে ভাটার সঙ্গে সঙ্গে, খোলা নদীর চরে আবাদ তার। বাঁদ ছাঁদ নেই, জল জমে ধান গাছ পচবে না। ওতে তার ভয় নেই। ভয় হয় শুধু ভাঙনকে। এতকষ্টের আবাদ যদি চড় চড় করে নদীর তলায় তলিয়ে যায় কোনদিন। অবশ্য গাঙ থেকে বেশ কিছুটা দূরে—পশ্চিম চরের ঘেরি বাঁধের গা ঘেঁসে যে জমিগুলো—তাইতে সে ধান বুনেছে। কি জানি কি হবে! অন্ধকারে কান পেতে শোনে সে বর্ষার ভরা গাঙের কলোচ্ছ্বাস।

হঠাৎ ছেলেটা আঁৎকে কেঁদে উঠলো হাঁউমাউ ক'রে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো কলিমদ্দি অন্ধকারে। জিজ্ঞেস করলো, 'কি রে পব্না—এঁ্যা, কি হলো রে?'

'কিসে কামড়ালো বাপ্জান!'—

'কামড়ালো—এ্যাঁ, কামড়ালো!' হঠাৎ বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে কলিমদ্দির। একদিন তিনটি ছেলে ছিল তার, একটাকে এমনি রাতের বেলা অন্ধকারে সাপে কামড়ে ছিল। হারাধনের দশটি ছেলের মতো এখন এসে ঠেকেছে একটিতে।

পবনা কাঁদছে।—

শরীর মায়া বোধ করি জ্বলেও ওঠে আগুনের মতো। কলিমদ্দি জ্বলে উঠলো। হয়তো তার ছেলের ওপরে, অথবা তার নিজের ভাগ্যেরই ওপরে। ধমক দিয়ে বললো, 'চুপ! ভ্যাবাচ্ছিস কেন!'—

আশ্চর্য! হাত কিন্তু কাঁপছে তার। দেশলাই জ্বালালো। লম্ফ জ্বেলে দেখলো—সাপ নয় কাঁকড়া। অসংখ্য ছোট ছোট কাঁকড়া সার বেঁধে উঠে এসেছে ঘরে।

কলিমদ্দির কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখা তাতে কমলো না একটিও। বললো, 'নে উঠে পড় চটপট ব্যাটা। জোয়ার এলো বোধ হয়।'

ছেলেটা উঠে দাঁড়ালো ঘুম চোখে। কলিমদ্দি কাঁথা গুটোলো। জোয়ার বাড়লে মটকায় উঠবে।

না, জোয়ারও না। কলিমদ্দি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো, ভাটির ঢেউ গর্জে মরছে বহু দূরে। বৃষ্টির জলের সোঁতা ধরে উঠে এসেছে কাঁকড়াগুলো। বর্ষার দিনে এমন হয়।

কলিমদ্দি বললো, "কাঁকড়াগুলো তুলে রাখ পবনা, পুড়িয়ে খাওয়া যাবে।'

পবনা হাই তুললো।

কলিমদ্দি ছেলের ঘুম-চোখের দিকে চেয়ে বললো, 'আচ্ছা তুই থাক না। আমি তুলে রাখছি।'

ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ পবনার। তাকে শুইয়ে দিয়ে কাঁকড়াগুলোকে ঝেঁটিয়ে তুলে রাখলো কলিমদ্দি। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে

পড়লো নিজেও। কিন্তু ঘুম এলো না চোখে। হঠাৎ শেয়াল ডেকে উঠলো দল বেঁধে কোথায়। ধড়মড় করে উঠে বসলো কলিমদ্দি। শেষ প্রহরের শিয়াল ডাকলো বোধ হয়। বাইরে বেরুলো—কিন্তু কতটা রাত বোঝবার উপায় নেই। মেঘে বৃষ্টিতে আকাশ অন্ধকার। রাত বড় নিবিড় কনকনে।

শুধু একটি ডাহুক ডেকে উঠলো কোথায় অনেক দূরে। শেষ রাতের ইঙ্গিত।

'পব্না উঠ বে। যেতে হবে।' কলিমদ্দি ডাকলো।

হাই তুলে আবার উঠে বসলো ছেলেটা—তারপর উঠে দাঁড়ালো সিধে।

ছেলের চোখে চোখ রেখে কলিমদ্দি বললো, 'ঘুম পাচ্ছে খুব ?'

পব্না ঘুমে জড়ানো চোখ দুটো জোর ক'রে মেলে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না।'—

এক কাঁধে লাঙল জোয়াল, আর এক কাঁধে পব্না—কলিমদ্দি হেঁটে চললো পশ্চিম চর-মুখো। ছেলেটার মাথায় দিয়ে দিয়েছে তাল পাতার টোকা। পথ চলতে চলতে কলিমদ্দি বললো, 'ঘুম পেলে টোকাটা ভাল ক'রে মাথায় দিয়ে মোর কাঁধের ওপরে একটুখানি ঘুমিয়ে নে পব্না।'

পব্না কিন্তু কাঁধের ওপর থেকে বললে, 'মোকে নামিয়ে দিলে হেঁটে যেতে পারবো বাপজান।'

'উঁহুঁ—সাপের বাচ্চা হয়ে গেছে সব চারিদিকে।'

'মোর ডর নাই বাপজান—তোর মতো।'

'বহুৎ আচ্ছা বেটা। এখন ঘুমিয়ে নে একটু।'

'আচ্ছা, সাপের বাচ্চা তোকে যদি কামড়ায় বাপজান!' হঠাৎ বাচ্চাটা জিজ্ঞেস করলো যেন অনেক বুদ্ধি করে।

কলিমদ্দি খুব নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো, পথ চলতে লাগলো অন্যমনে। পব্না উত্তরের অপেক্ষা করলো অনেকক্ষণ। তারপর

ঢুলুনি এলো তার। ঢুলতে ঢুলতে বাপের মাথার ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো কখন। তার মাথার ঢুলুনি বুঝতে পারলো কলিমদ্দি। তালপাতার টোকাটা ভাল করে মাথায় দিয়ে দিল পব্‌নার। ঝির ঝির করে পড়ছে বাদলার বৃষ্টি। মাঠও ভরে গেছে জলে। তারই মধ্যে দিয়ে কলিমদ্দি চললো পশ্চিম চর—হরি মণ্ডলের বাড়ী। সেখানে হালের বলদ নেবে, তারপর যাবে মাঠে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো কলিমদ্দি। সামনে মালিকের কাছারী বাড়ী—গোলাঘর। হঠাৎ মালুম হলো—কে একজন যেন গোলাঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে মিশে গেল সামনের অন্ধকারে। কাপড় পরার ঢঙে মনে হয় মেয়েলোক। কলিমদ্দি তাকিয়ে দেখলো—কাছারী বাড়ী অন্ধকারে নিঝুম।

ডাকলো কলিমদ্দি, 'কে যায়!'

সামনের ছায়ামূর্তিটা আরও দ্রুত মিশে গেল অন্ধকারে।

শুধু একটু হাসলো কলিমদ্দি মনে মনে: হবে হয়তো এ চরের কোন গরীব চাষীর সোমত্থ বউ। নজরে পড়ে গেছলো হয়তো গিরিশ তশীলদারের। হবে।···

আবার এগোলো কলিমদ্দি।

কিছুটা এগিয়ে কাশির শব্দ শোনা যায় হরি মণ্ডলের। হরি মণ্ডল জেগে বসে আছে দাওয়ায়।

'বড় মণ্ডল!'—কলিমদ্দি ডাকলো।

হরি মণ্ডল কাশতে কাশতে বললে, 'আজ লাল বলদ দুটা নেবে হে কলিমদ্দি।'

'মোকে খুলে দিতে হবে মণ্ডল। কাঁধের ওপরে লেড়কাটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমুক এট্টুন'—কলিমদ্দি কৈফিয়ৎ দিয়ে যেন বললে, 'মাঠে নিয়ে গেলেই জেগে যাবে।'

হরি মণ্ডল গোয়াল থেকে বলদ বের করে দিল।

কলিমদ্দি কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, 'কাছারী বাড়ীতে কে এসেছে মণ্ডল ?'

'গিরিশ তশীলদার।' মণ্ডল বললো, 'কাল বিকালে এলো। পুবচর তো গেছে—দেখতে এসেছে পশ্চিম চরের আবাদ।'

'তাই বলো—কেউ এসেছে।' কলিমদ্দি বললো, 'অন্ধকারে দেখলম কি না, কে একটা জেনানা যেন ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালালো।'

'দেখলে ? এ্যাঁ—কে হে !'

'চিনতে পারলমনি মণ্ডল।'

'কার আবার কপাল খুললো দেখ।'

'ভাঙা কপালের সব দিকই খোলা গো মণ্ডল।'

কলিমদ্দি বলদ দুটো তাড়িয়ে নিয়ে চললো মাঠের দিকে। চললো অন্যমনে। হঠাৎ একটা মেয়েলোক তাকে যেন অন্যমনা করে দেয়। আমিনা মরে গেল পাঁচ বছর।...মনে মনে গুণলো কলিমদ্দি—পাঁচ বছর দুমাস। তারপর তার একলা জীবন। হঠাৎ কেমন বিশ্রী লাগে। হঠাৎ একটা মেয়েলোকের গন্ধ তার সমস্ত সত্তাকে যেন এলোমেলো করে দেয়। দীর্ঘ পাঁচটি বছর তার জীবনে কোনো মেয়েলোক নেই।

অন্যমনা হলেও পা দুটো চলছে সমানে। কলিমদ্দি এসে পড়লো এবার মাঠে।

'হ—হ—'

বলদ দুটো দাঁড়ালো স্থির হয়ে।

'পব্না !'—ডাক দিয়ে কলিমদ্দি কাঁধ থেকে ছেলেকে নামালো।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাপ্জান।' পব্না হাই তুলে বললো অপরাধীর মতো।

'এবার আর ঘুম না।'

'না বাপ্‌জান।'

'মাথায় টোকা দিয়ে ওই উঁচু আলের ওপর বোস। আমি এখন লাঙল করি।' কলিমদ্দি গোরুর কাঁধে জোয়াল চাপাতে চাপাতে বললে, 'অন্ধকারে ডর লাগবে না তো।'

'ডর কিসের বাপ্‌জান! মোর ডর নাই।'—পব্‌না বললো—যেমন ক'রে ঠিক কলিমদ্দি বলে।

কলিমদ্দি লাঙল ঠেলে নিয়ে নেমে গেল মাঠে—অন্ধকারে। পব্‌না বসে আছে আলের ওপরে। কোথায় কড়মড় শব্দ হচ্ছে যেন।

'হেট্।' কলিমদ্দি হেঁকে উঠলো।

পব্‌না বললো, 'ডরিস না বাপজান—শেয়াল বোধ হয় কাঁকড়া খাচ্ছে।'

'ঠিক বেটা, ডর পাবি না।'

'নাঃ—আমি ডর করি না।' পব্‌না বলে নরম কচি গলায়।

ভোর হয়নি তখনও। বর্ষা-ভেজা শেষ রাত্রি তখনও অন্ধকারে যেন লেপটে আছে। তাকে মুখর করে তোলে দূরে কাছে শুধু চাষীদের বলদ খেদানোর শব্দ। থম্‌কে গেছে ব্যাঙের নিশীথ ঐকতান। নিস্তব্ধ অন্ধকারকে মাড়িয়ে উঠছে বলদ আর মানুষের জোড়া জোড়া জলভাঙা পায়ের শব্দ—ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌। প্রকৃতির সঙ্গে নির্মম জীবন সংগ্রাম।...

এ সমস্ত কিছুকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে আমিনার কথা কিন্তু আজ কলিমদ্দিকে একটানা অন্যমনস্ক করে রাখে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে একভাবে—মাঠের মাঝখানে হা-হা করে ছুটছে ঠাণ্ডা হাওয়া। দাঁতে দাঁত লাগে—হাড় পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠে ঠক্ ঠক্ করে। এই ঠাণ্ডার

ভেতরে হঠাৎ একটি মেয়ের গায়ের নরম উষ্ণতা বার বার মনে পড়ে যায় কলিমদ্দির—আর কেমন যেন খেপিয়ে তোলে তাকে। খেপে ওঠে—বিরক্ত হয়ে ওঠে যেন সে সব কিছুরই ওপরে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে দুই হাতে কৃপণ মৃত্তিকার বুকে ঠেসে ধরে লাঙল। সে চাপ টানতে পারে না বলদগুলো—বেঁকে এলিয়ে পড়ে। গালাগাল দেয় কলিমদ্দি—প্রাণখুলে খিস্তি খেউড় করে। গাল পাড়ে সে হরি মণ্ডলের নাদুস নুদুস বলদ জোড়াকে, গাল পাড়ে এ চরের মাটিকে —কখনো নিজের ভাগ্যকে, কখনো কাছারী বাড়ীর গিরিশ তশীলদারকে।

'বাপজান!'—

পব্‌না ডাকলো।

'কি রে?'

'শীত কর্‌ছে—তামুক খাবি?'

'ঠিক বাত্‌—সাজ এক ছিলিম।'

ভোর হচ্ছে পূর্ব দিগন্তে। লাঙল থামিয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে তামুক খেতে এলো কলিমদ্দি। তাকালো পবনার শান্ত কচি মুখটার দিকে: ঠিক—চিবুকের তলাটা ঠিক তার মায়ের মতো, নরম, চিকন। ··· হঠাৎ ছেলেটাকে কাছে টেনে আদর করে কলিমদ্দি —হাত বুলিয়ে দেয় তার গলায় চিবুকে। ওর পাঁচ বছরের পুঞ্জিত আবেগ যেন গলে গলে পড়ে কর্কশ আঙুলগুলোর ডগা দিয়ে।

'পব্‌না!'—কলিমদ্দি ডাকলো।

'কি বাপজান!'

'খুব জাড়—না?'

'উঁহু—আমি তো তামুকের আগুনের হাঁড়ির কাছে বসে ছিলাম।'

'তবু খুব জাড়।' কলিমদ্দি বললো।

'আরিব্বাপ।' হঠাৎ কে আর্তনাদ করে উঠলো এমন সময়ে।

'কি হলো হে—এ্যাঁ, কি হলো!'—

মাঠে ডাকাডাকি পড়ে যায় হঠাৎ। কে বললো, 'সাপ! ওই যে যায়!—আরেব্বাপ্! দুধ খরিস! দুধ খরিস!'—

'কেটেছে নাকি?'

'মাহিন্দ্র বসে পড়েছে কেন! মাহিন্দ্র—মাহিন্দ্র!'

একটা সোরগোল পড়ে যায় হঠাৎ। কয়েকজন চাষী তাড়া করে গেছে সাপটাকে—কয়েকজন ছুটে যায় মহেন্দ্রের দিকে। মহেন্দ্র বসে আছে পা চেপে। তাকে সবাই ধরাধরি করে তুললো আলের ওপর। সরু দুটি দাঁত বসেছে পায়ের চেটোর ওপরে।

'বেঁধে দাও—হাঁটুর কাছে বেঁধে দাও দড়ি দিয়ে।'

'বড় মণ্ডলকে খবর দাও একজন।'

'গুনিন ডাকতে পাঠাও।'

বিষ তখনও ওঠেনি কিন্তু মহেন্দ্র এলিয়ে পড়েছে ভয়ে; চোখ মুখ তার বিহ্বল।

হঠাৎ ভুণ্ডুল হয়ে গেল মাঠের কাজ। সমস্ত চাষী এসে জড়ো হয় মহেন্দ্রকে ঘিরে। একজন ছুটে গেছে বড় মণ্ডলের কাছে। অপেক্ষা করে সবাই বড় মণ্ডলের জন্যে।

বড় মণ্ডলকে যে ডাকতে গিয়েছিল সে ফিরে এলো মুখ ভার করে।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো একজন, 'কি হলো, মণ্ডল আসছে?'

'কি জানি!' লোকটা মুখ বিকৃত করে বললে, 'যেমনি বললাম মাহিন্দ্রকে সাপে কাটার কথা—অমনি মণ্ডল তেড়ে এলো মোর দিকে—যেন চিবিয়ে খাবে। আর সে কি বে-অন্যায় গালাগালি মশয় মোর মা-মাসী তুলে।'

'গাল দিলে ?'

'শুধু গাল ! মোকে মারতে এলো। পালিয়ে এলম।'

'তাই পালিয়ে এলি ? হায় হায় !' একটি আধবুড়ো চাষী জিভে চুক্ চুক্ শব্দ করে বললে, 'লক্ষণ ভালো নয় হে।'

'কেন কেন !'

'কেউ সাপ-কাটার ওষুধ আনতে গেলে মণ্ডল মা-মাসী তুলে বিচ্ছিরি গাল দেয়। মণ্ডলের ওষুধের নাকি ওই নিয়ম। যদি গাল খেয়ে না কেউ পালিয়ে আসে তবে সে রোগী বাঁচবেই।'

'তো মোকে আগে বলে দিতে হয়।' যে মণ্ডলকে ডাকতে গিয়েছিল সে বললে ঘাবড়ে গিয়ে।

'ওই তো মণ্ডল আসছে। ওষুধ আনছে মনে হচ্ছে।'

কথাটা শুনে মহেন্দ্রের বিহ্বল চোখ দুটোও মুহূর্তে যেন উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে তাকালো।

কি একটা গাছের পাতা দু-হাতের চেটোয় ডলতে ডলতে হরি মণ্ডল এসে দাঁড়ালো ভিড়ের কাছে। যে ডাকতে গিয়েছিল তাকে সামনে পেয়ে আবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো মণ্ডল, 'অমন করে পালিয়ে এলি যে !'

'তা তুমি অমন করে গাল দিলে মণ্ডল।'

'বাঁচবে না, রোগী বাঁচবে না। এ একেবারে সাক্ষাৎ কালে কেটেছে, না হলে আমার ওষুধে মরা মানুষ উঠে বসে। লাও হে মাহিন্দ্র—খেয়ে ফেল দেখি রসটুকুন।'

মহেন্দ্র নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে বললো, 'বাঁচব নি মণ্ডল !'

'আগে খেয়ে ফেল রসটুকুন, তার পর তোর কপাল।'

মহেন্দ্র রস খেয়ে শুয়ে পড়লো আবার আলের ওপরে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

হরি মণ্ডল বললো, 'ওকে ঘরে নিয়ে যাও সবাই ধরাধরি ক'রে। সারে যদি তো ওই এক মাত্রাতেই। না হলে'—হরি মণ্ডল হতাশ ভঙ্গী করলো।

মহেন্দ্রকে ধরাধরি ক'রে ঘরে পৌঁছে দিতে গেল কয়েকজন চাষী। বাকী সবাই আবার নামলো মাঠে। জীবন-সংগ্রাম। ঘাড় নিচু ক'রে লাঙল ঠেসে ধরে আবার সবাই।

অনেকক্ষণ পরে একটা টানা কান্নার শব্দ চিড় দিয়ে ছুটে যায় বর্ষা ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে। চাষীরা থমকে দাঁড়ায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কলিমদ্দি বিড় বিড় করে কি যেন বলে: মেয়েলোকের কান্না, হয়তো মহেন্দ্রের বউ কাঁদছে।

'তোর – হারামজাদী – খা – খা –'

হঠাৎ একটা গালাগাল দিয়ে কলিমদ্দি আবার ঠেসে ধরে লাঙল চরের মাটিতে – আক্রোশে, দাঁতে দাঁত চেপে। সম্ভব হলে সে যেন এই নির্মম বসুধার গর্ভ চিরে ফেলতো দুই হাতে, ছিঁড়ে আঁচড়ে বার করতো ফসল – জীবন, স্বপ্ন। ব্যর্থতায় আক্রোশে টগবগ করে সে। তারপর হাত তার অবশ হয়ে আসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দম নেয়। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে শুধু:

'আল্লা!'—

১৭

মেঘে মেঘে অন্ধকার দিন। সূর্য যে কখন উদয় হয় আর কখন অস্ত যায় বোঝবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে সারা আকাশ জুড়ে পাতলা মেঘের স্তরগুলো গলে গলে পড়ে – মেঘচুয়ানো আলোটুকুও ঝাপসা হয়ে যায় দূর থেকে দূরে। হাওয়া হইতে থাকে জোরে। লাঙল-ঠেলা লোকগুলো কাঁপতে থাকে ঠক ঠক ক'রে।

কলিমদ্দি দুহাতে লাঙলের মুঠি চেপে ধরে একটা হাড়-কাঁপুনি শীতকে যেন সামলে নিল। খিস্তি ক'রে উঠলো দাঁতে দাঁত চেপে. 'ত্তোর'—

পবনা চেয়েছিল বাপের কাঁপুনির দিকে। বললো, 'বাপজান, তামুক সাজবো?'

কলিমদ্দি মুখ বেঁকিয়ে বললো, 'নাঃ।'

'সাজ রে সাজ।' পেছনে বড় মণ্ডলের গলা। বেলা গড়িয়ে এদিকের কাজ দেখতে এসেছে। বললো, 'একটু তামুক খেয়ে লাও হে কলিমদ্দি, জাড়ে যে কাঁপছ।'

বিকৃত মুখে হাসি টেনে কলিমদ্দি বললো, 'তুমি আবার কষ্ট ক'রে ভিজে ভিজে এলে কেন মণ্ডল?'

'এই চলে এলাম।' হালকা ভাবেই বলে উঠলো মণ্ডল।

কিন্তু কলিমদ্দি লাঙল ঠেলতে ঠেলতে একটু হেসে বললো, 'তা লয় মণ্ডল, দেখতে এলে—বসে-টসে আছি কিনা। তোমার সব জমিন তুলে দেবো মণ্ডল, ভয় নাই। মোর এক জবান।'

'তা নয় হে, তা নয়।' বড় মণ্ডল নরম গলায় বললো, 'তোমাকে পেয়েছি যখন, তখন দু'চোখ বুজে আমি বসে আছি। এসো এসো, তামুক খাও।'

কলিমদ্দি এসে বসলো উঁচু আলের ওপর।

বড় মণ্ডল কিন্তু মনে মনে তখনও যেন হিসেব করছে কি একটা। বললে, 'এ জমিটুকুন তো আজ চযে শেষ করবে?'

'তা বোধ হয় হয়ে যাবে মণ্ডল।'

'হাঁ হাঁ, হবে বৈ কি। শেষ করে দাও।' সুকৌশলে চাপ দিয়ে বললো বড় মণ্ডল। নরম গলায় বললো ফের, 'তোমার হাতে চাষের ভার দিয়ে আমি আর কিছু ভাবি না হে শেখ।'

'তবু তুমি মোর কাম দেখতে এসেছ গো মণ্ডল।' কলিমদ্দি ঠাট্টা করে বললো, 'তুমি কোনো লোককে বিশ্বাস কর না মণ্ডল—ইটি তোমার এক মস্ত দোষ।'

'এ মোর দোষ বলতে পারো বটে হে শেখ, কিন্তু ভুল আমি করি না। কত দেখলম।' অন্য প্রসঙ্গ পেড়ে বসলো মণ্ডল। বললো, 'এই ছাখো না গুপির কাণ্ড।'

'গুপির আবার কি হলো মণ্ডল।'

'বলি তোমার পাশের জমিতেই তো কাল পর্যন্ত লাঙল ঠেলছিল—আজ দেখছো ?'

'তাই তো মণ্ডল, আসে নি তো সে। কি হলো মণ্ডল তার আবার ?'

'পালিয়েছে।'

'পালালো ?'

কলিমদ্দি চেয়ে রইলো পাশের জমিটার দিকে। আধ-চষা জমি। সবুজ ঘাস এখনও হিল হিল করছে এখানে ওখানে, তারই মাঝে মাঝে ফাল চিরে মাটি তুলেছে। এক পাশের আল বাঁধা হয়েছিল শুধু। অন্য তিন পাশ বাকি। কাল সকাল পর্যন্ত লাঙল ঠেলে গেছে লোকটা। বিকেলে আসেনি। দেখা হয়েছিল সন্ধ্যে বেলা ভেড়ি বাঁধের ওপরে। কলিমদ্দি জিজ্ঞেস করেছিল তাকে :

'ইদিকে কোথায় গেছলে গো ?'

'গাঙ দেখতে গেছলাম কলিমদ্দি।' ছোকরা নীরস গলায় বলেছিল, 'মস্ত একটা ধস নেমেছে। বর্ষা পার হবে না—চরের সবটা চলে যাবে গাঙের মুখে, আমি বলে দিলম।'

'তবে এবার সব ছেড়ে ছুড়ে পালাও আর কি।' কলিমদ্দি বিদ্রূপ করে বলেছিল।

'কোন আশায় থাকবো বলো দিকিন। পেটে না খেয়ে চাষ করবো, মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো ওই সব্বনাশী গাঙের দিকে চেয়ে!' গুপি কেটে পড়েছিল যেন, 'কি আছে এখেনে!'

সেই লোকটা তবে সত্যিই চলে গেছে! তার আধ-চষা জমির দিকে চেয়ে চেয়ে কলিমদ্দিও মনে মনে বললো, 'কি আছে এখানে!'

বড় মণ্ডল বললো, 'গুপি পালিয়েছে তার খুড়ীকে নিয়ে।'

'খুড়ী!'

গাঁজলা বেঁধে উঠছে যেন চরের জীবন-যাত্রায়। জীবন-মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে বর্বর বেপরোয়া হয়ে উঠছে জীবন দিনে দিনে। কলিমদ্দি বোবা মেরে বসে রইলো।

বড় মণ্ডল একাই কথা বলে, 'বোঝ—নিজের খুড়ী। ওই হেঁপো বুড়ো বিন্দাবন, দ্বিতীয় পক্ষ এনেছিল ঘরে দু'বছর আগে, এখন বোঝ ঠেলা।'

কলিমদ্দি অন্যমনস্ক—তবু শুনছে একভাবে। বকর বকর করে বড় মণ্ডল বলে যাচ্ছে আদ্যোপান্ত কাহিনী :

'কাল দেখি কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে বউতে বুড়োতে। মাঠের জলে কাদায় পড়ে সে কি ঝটাপটি—বুঝলে? তা একটা যুবতী মেয়ের সঙ্গে ওই হেঁপো বুড়ো পারবে কেন!'

কলিমদ্দি বললো, 'আমি কিন্তু আগেও দেখেছি মণ্ডল, ওই বুড়োটা বউটাকে বেঁধে বেঁধে মারতো বড়।'

মণ্ডল বললো, 'কাল সব উল্টা ব্যাপার গো। বিন্দাবন বেঁধেছিল ঠিক কিন্তু বউটা কাল যেন খেপে গেছলো হে। বউটা যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন পাশের একটা খুঁটির সঙ্গে তাঁকে বেঁধে ফেলেছিল বটে বিন্দাবন, তারপর মারের গুঁতোয় জেগে উঠে বউটা এক চাড়ায় কবেকার পুরানো বাঁশের খুঁটি—তাকে চড় চড় করে ভেঙে বেরিয়ে এলো বাইরে।'

কলিমদ্দি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

মণ্ডল বললো, 'খালের মুখে মাছ পড়ছে খুব—জেলেদের সঙ্গে বিন্দাবনও টঙ বেঁধেছে একটা, রাতে সেইখেনে থাকে, জাল পাহারা দেয়। আর উদিকে ঘরের বউ শালার সারা রাত চরতে চলে যায় কোথায় না কোথায়। শুনলাম এই সব।'

কলিমদ্দি চুপ।

মণ্ডল বললো, 'বৃন্দাবন মোকে দেখালো তার বউয়ের বদন। ছড়ে ছিঁড়ে রক্তপাত্। বেটি যেন ম্যাড়া-কাঁটার জঙ্গলে ঢুকেছিল হে! বিন্দাবন বললো,—ত্যাখ মণ্ডল, ত্যাখ, রাতের সব চিহ্ন—দাগ। কোথায় না কোথায় গেছলো।'

কলিমদ্দি সকৌতূহলে শুধালো, 'বউটা কি বললো?'

'যেন গেরাহ্যিই করলো না—পাছা ঘুরিয়ে চলে গেল হে! একেবারে সাক্ষাৎ চামুণ্ডা। রাতে স্বামীর বিছানা থেকে উঠে চলে যায় নাকি! বোঝ।'

'তুমি কি করলে?'

'আমি আর কি করবো! আমি গিয়ে দেখি, মেয়েটা বিন্দাবনকে ঠেসে ধরেছে মাঠের জল-কাদায়, উঠে বসছে ছাতির ওপরে। ছাড়িয়ে দিলাম। মেয়েটা একেবারে বেসামাল। বুঝলে? উলঙ্গ!'

কলিমদ্দি চুপ। চোখের সামনে সে শুধু দেখছে একটা বেসামাল উলঙ্গ যুবতী মেয়েকে—হঠাৎ বহুদিন পরে খেপে ওঠা, বেপরোয়া, কাটা ঠোঁট আর গাল। তারপর চোখের সামনে ভেসে উঠলো গুপির চেহারাটা—জোয়ান মরদ, মুখটা থম্ থমে—ধস দেখে থম্ থম্ করছে মুখ চোখ। যে লোকটা কাল সন্ধ্যেবেলা বলেছিলো, 'বিরাট ধস নেমেছে।' হঠাৎ ফেটে পড়ে বলেছিল, 'কি আছে এখানে!'···কিছু নাই এখানে—শুধু ধস নামছে! একটা ঘন অন্ধকারের ধসের

সামনে কলিমদ্দিরও মনে হয়—সে-ও বসে আছে যেন। গা, গরম হয়ে উঠছে তার। গুপির কথাই ভাবছে সে আর ভাবছে তার খুড়ীর কথা : একটা বেসামাল উলঙ্গ মেয়েলোক। …

ক্ষাণিক পরে তামাক খেয়ে বড় মণ্ডল চলে গেল। কলিমদ্দি নামলো মাঠে। লাঙলের মুঠো চেপে ধরলো সে—শুধু অভ্যাসের বশেই। আশ্চর্য, কোনো কিছুতে মন লাগছে না আর তার! গোরুগুলোকে পিটোচ্ছে বেপরোয়া, খিস্তি-খেউড় ক'রে গালাগাল দিচ্ছে গোরুর চোদ্দপুরুষ ধ'রে। কিছুই ভাল লাগছে না আর তার। সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেছে যেন পব্‌নার কথাও। শুধু বিশ্রী লাগছে তার। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে মনে মনে, তারই বা কি আছে এখানে,—কেন মাটি কামড়ে পড়ে আছে সে? কেন—কেন? তারপর সব প্রশ্ন চাপা দিয়ে হঠাৎ—বহুদিন পরে—একটা মেয়েলোকের জন্যে ভয়ানক মন কেমন করে ওঠে তার। বিরাট ধ্বস একটা দেখে এসে গুপি যেমন বেপরোয়া হয়ে ফেটে পড়েছিল তেমনি বেপরোয়া হয়ে উঠলো যেন সে। কঠিন দারিদ্র্য, সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থ পরিশ্রম—প্রেমহীন দিনের পর দিন আজ যেন বিরাট একটা ধ্বসের মতোই দাঁত বের ক'রে আছে তার সামনে। এত দিনের ঠাণ্ডা নিঃশব্দ মানুষটা হঠাৎ বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে : কোনো নীতি বন্ধন সে মানবে না—সে-ও চলে যাবে যাকে হোক সঙ্গে নিয়ে। যে কোনো একটা স্ত্রীলোক। …

কিন্তু যাবে কে?

আশ্চর্য! যাওয়ার মতো মনে পড়ছে না তো কারুকে। তবু সে যাবে—যেখানে হোক, যে কোন একটা মেয়েলোকের কাছে! মুখ চোখ জ্বালা করছে। …

'দুত্তোর শালা!'—আবার খিস্তি করলো কলিমদ্দি। তারপর কাজ বন্ধ ক'রে, লাঙল জোয়াল গুটিয়ে বললো, 'চল বে পব্‌না।'

'এখন কোথায় যাবি বাপজান ?' অবাক হয়ে পব্না শুধালো।

'চল বড় মণ্ডলের বাড়ী।'

'তোর তবিয়ৎ খারাপ বাপজান ?'

'চুপ দে।' হঠাৎ ধম্‌কে উঠলো কলিমদ্দি।

পব্না ভয়ে চুপ ক'রে গেল। হন্ হন্ ক'রে গোঁ ভরে এগিয়ে চললো কলিমদ্দি। সারা পথ পব্না আর একটি কথাও শুধালো না ভয়ে।

কলিমদ্দিকে দেখে মণ্ডল অবাক হয়ে বললো, 'এরি মধ্যে উঠে এলে মাঠ থেকে!'

'মোকে গণ্ডা চারেক পয়সা দাও মণ্ডল—মোর এক জায়গায় যেতে হবে।' কলিমদ্দি নীরস গলায় বললে।

'তুমি আবার কোথায় যাবে হে!'

'কেন, সবাই যেতে পারে—মোর কি যাওয়ার জায়গা নাই! পয়সা দিবে কি-না বল।'

হঠাৎ কেমন বেয়াড়া লাগে কলিমদ্দিকে। বড় মণ্ডল অবাক হলো। বললে, 'তুমি হঠাৎ কাজ ফেলে চলে যাচ্ছ কোথায় না কোথায়!'—

'তোমার কাজ শেষ হ'লে তো হলো। তুমি পয়সা দেবে তো দাও। মোর আজ কিছু ভাল লাগছে না।'

এত দিনের ঠাণ্ডা চুপচাপ লোকটা হঠাৎ বদলে গেছে যেন। কতকটা ঘাবড়ে গিয়ে বড় মণ্ডল চার আনা পয়সা এনে দিল কলিমদ্দিকে। পয়সা পেয়ে কলিমদ্দি উঠলো,। নীরস গলায় ছেলেকে বললে :

'চল বে পব্না।'

ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গট্ গট্ ক'রে চলে গেল কলিমদ্দি। পেছনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো হরি মণ্ডল : আশ্চর্য, হঠাৎ খেপেই গেছে লোকটা।

পব্না চুপটি ক'রে বসে আছে কাঁধের ওপরে। বাপের মেজাজের পরিবর্তন বাচ্চাটাও বুঝতে পেরেছে যেন—ওই বয়সেই বুঝতে শিখে গেছে সব। প্রকৃতি যেন তাকে বুঝতে বাধ্য করেছে।

এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে পব্নাকে বদলে নিল কলিমদ্দি।

ভয়ে ভয়ে পব্না বললো, 'আমি তোর সঙ্গে হেঁটে যেতে পারবো বাপজান।'

কলিমদ্দি কোনো কথা কইলো না—একমনে হেঁটেই চললো শুধু।

ছেলেটা আবার ভয়ে ভয়ে বললো, 'তোর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে আমার খুব ভালো লাগে বাপজান।'

'তো চল।' কলিমদ্দি পব্নাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল।

পব্না প্রায় ছুটে চললো বাপের হাঁটুনীর সঙ্গে তাল রেখে।

কলিমদ্দি এসে থামলো খেয়াঘাটের কাছে। উঠলো কসুবি দুগ্‌গার দোকানে।

খেয়াঘাটের আশে পাশে আরও দু-চারটি কুঁড়ে আছে এমনি। সামনের দিকটা পান-বিড়ির দোকান, তেলেভাজা, মুড়ি চিঁড়েও রাখে। খেয়াপারের যাত্রীরা আসে, জমা হয়। খায়-দায়—চলে যায়। সব চাষাভুষো—দেহাতি মানুষ। অধিকাংশই সুন্দরবনের যাত্রী। আর দোকানীও অধিকাংশই মেয়েলোক, ঘর-সংসার খুইয়ে টঙ বেঁধেছে খেয়া ঘাটের পারে। কেউ কেউ পুরুষও জুটিয়ে নিয়েছে এক-একটি। এদের মধ্যে দুগ্‌গা শুধু একা। এ পারের জমি-ঘর, স্বামী-সমাজ সব খুইয়ে খেয়াটা পার হতে হতে যেন ঠেকে গেছে কোনো রকমে গাঙের ধারে এসে। বিধবা হওয়ার পর পুরুষ যে তার জোটেনি তা নয়—জুটেছিল। খেয়াঘাটের এই ছোট্ট কুঁড়েটুকুতে পেতেওছিল ক-দিনের ঘর-সংসার। তারপর সে লোকটা না-কি দুগ্‌গার জমানো টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে ভেগে গেল কোথায় না কোথায়। সেই থেকে ওই চিরকেলে ঘর

বাঁধনের পাট তুলে দিয়েছে দুগ্‌গা। এখন কেউ থাকতে চাও, দাম দাও—থাক। বাস।

কলিমদ্দিকে দেখে দুগ্‌গা বললো, 'ও মাগো, শেষ কালে শেখও চললে সুন্দরবন!'

'সুন্দরবন লয় গো, এলেম তোমার কাছেই।' কলিমদ্দির দাড়ি-ঢাকা মুখটা লালসার হাসিতে কেমন বিকট দেখায়।

দুগ্‌গা বললো, 'মোর কাছে!'

'কেন, কত কত আসে আর আমি আসতে পারি না!' কলিমদ্দি যেন তেড়ে তেড়ে বললে কথাগুলো।

দুগ্‌গা একটু হেসে চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'বলি এত দিন তো আসনি শেখ! কতলোকে এসেছে, কত লোক পার হয়ে গেল এই ঘাটে—শুধু তোমাকে কখনও এ পথ মাড়াতে দেখিনি। মোর ভাগ্য ভালো, সেই তুমি এলে আজ মোর দোকান পর্যন্ত।'

'এলম দুগ্‌গা—হঠাৎ মোর মনে পড়ে গেল—দিলটা কেমন ক'রে উঠলো।'

'বসো শেখ বসো।—উটি বুঝি ব্যাটা? মা গো—কতটুকুন দেখেছিলম ওর মায়ের কোলে।' দুগ্‌গা এসে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল। কলিমদ্দির দিকে চেয়ে কটাক্ষ ক'রে বললে, 'ছেলে সুদ্ধ নিয়ে তুমি মোর কাছে এসেছ শেখ—এঁ্যা! তুমি কি রকম গো?' দুগ্‌গা হেসে উঠলো খিক্‌খিক্‌ ক'রে।

কলিমদ্দি মিয়ানো গলায় বললো, 'কি করি—কার কাছে রেখে আসি বলো! মোর কেমন ডর লাগে। সব কটা তো গেছে—এখন ওই একটিই আছে।'

'না না শেখ, খুব ভালো করেছ।' ছেলেটাকে আদর করতে করতে বললো, 'আর যারা আসে তারা সব একাই আসে স্ফূর্তি

করতে। তুমি এই যে ছেলেটাকে এনেছ—মোর বড় ভালো লাগছে শেখ।'

ছেলেটাকে একটা মোয়া দিল দুগ্‌গা। কোল থেকে আর তাকে যেন ছাড়তে চায় না সে। কলিমদ্দি দেখছে ছেলে কোলে দুগ্‌গাকে। কি একটা অজ্ঞাত জিনিস্ বহু দিন পরে যেন তার ছাতির মধ্যে—দিলের গভীরে ঠেলা মারছে থেকে থেকে। আশ্চর্য! বউয়ের মুখটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে যেন ভেসে ভেসে যাচ্ছে দুগ্‌গার স্নেহকরুণ মুখটার ওপর দিয়ে। বয়স হয়েছে দুগ্‌গার। মোটাও হয়েছে বেশ। সামনের দাঁত দুটো খয়ে গেছে অনেকখানি। পুরু কালো ঠোঁট। একে খ্যাপা কলিমদ্দির মতো চাষীও বলবে না খুবসুরৎ। কিন্তু হঠাৎ যেন খুবসুরৎ লাগছে দুগ্‌গার আদর, দুগ্‌গার কথা, দুগ্‌গার মিষ্টি হাসি। কলিমদ্দি চেয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে।

দুগ্‌গার ঘরে কলিমদ্দির সন্ধ্যে উৎরে গেল।

পব্‌না ঘুমিয়ে পড়েছে একটা চ্যাটাইয়ের ওপরে। বাইরে থেকে দমকে দমকে ছুটে আসছে বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া। ছেলেটার গায়ে একটা কাপড় ঢেকে দিল দুগ্‌গা। এসে বসলো কলিমদ্দির সামনে। বললে, 'বিড়ি খাবে?'

'দাও, শীত করছে।' উবু হয়ে কুঁকড়ে বসে যতটা সম্ভব নিজেকে গরম রাখবার চেষ্টা করছে কলিমদ্দি।

দুজনে দুটি বিড়ি ধরালো। তারপর ওরা গল্প করে দু'জনে—পুরানো বন্ধুর মতো। অধিকাংশই দুগ্‌গার সেই চরের পুরানো কথা।

দুগ্‌গা বললো, 'সেই কাতুবুড়ীর কথা তোমার মনে পড়ে শেখ? তার সেই টোপাকুলের গাছ।'

'তোমরা' বড্ড তার কুল খেতে।' কলিমদ্দি হাসলো—মরা মানুষের হাসির মতো।

'হ্যাঁ, আমি আর তোমার বউ। কুল আর পাকতে দিতাম না।' দুগ্‌গা সেই কথা মনে ক'রে আজ আবার হাসলো আপন মনে। এ হাসিটি জ্যান্ত মানুষেরই। কথায় কথায় তারই হারানো চরের পুরানো একটা লোকের কাছে দুগ্‌গা যেন আজ বেঁচে ওঠে।

... দুটি বউ করে কুল খেতে যেত চুরি করে। খেতে খেতে হাতের নাগাল পেতে পারে এমন জায়গার সব কুল শেষ হয়ে গেল একদিন। দুগ্‌গা একদিন বুদ্ধি করে বললো, 'গাছে ওঠ আমিনা।'

আমিনা বললো, 'শেখ জানতে পারলে মেরে ফেলাবে মোকে।'

'কাতু বুড়ীই জানতে পারছে না—তা তোর শেখ জানবে কি করে! আমি তলায় পাহারা দিই—তুই ওঠ ভাই।'

লোভে লোভে উঠলো আমিনা। কি দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এলো—দুগ্‌গা এক ফাঁকে গিয়ে ডেকে আনলো শেখকে। কুল গাছের তলায় এনে বলেছিল, 'ঐ ছাখ শেখ—তোমার মাথার ওপরে!'

'মা গো মা! আমিনা তো ভয়ে জড়সড়।' সেই কথা মনে করে আজ আবার হাসলো দুগ্‌গা।

বহুদিন পরে পেয়েছে তার চরের একটি পুরানো লোককে দুগ্‌গা। সমস্ত রঙিন পুরানো কথাগুলির সুতো ধরে টান মারে সে একে একে: তখন চরে সমৃদ্ধি ছিল—স্বামী বেঁচে ছিল দুগ্‌গার, ছিল জমি, গোরু, ছাগল। সে কত দিন আগের কথা! ...

একদিন দুগ্‌গার স্বামীকে ধরলো কালাজ্বর। তাইতেই মারা গেল সে। কিন্তু মরার কথা আজ চাপা পড়ে যায় বাঁচার খুঁটিনাটি কথাগুলিতে।

দুগ্‌গা বললো, 'তোমাদের সঙ্গে একবার মেলায় গেছলাম শেখ, লুকিয়ে।'

'হ্যাঁ। তুমি, আমিনা, আর বুধি দাসের বউ। তা তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে। আমিনা কেঁদে কেটে অস্থির: তোমার স্বামী খোঁজ করতে এলে বলবে কি সে!'

'হারাইনি শেখ। তোমরা সবাই ঘুরছো—রাত হলো, ফেরবার কথা ভুলে গেছ যেন সবাই। মোর মনটা খারাপ হয়ে গেল—স্বোয়ামী কি না কি ভাবছে। খুঁজছে হয়তো। তোমাদের না বলে তাই ঘরে চলে এসেছিলাম।'

'তাই হবে।'

'ঘরে এসে বুক মোর ঢিপ ঢিপ করছে। কি বলবো! তা ঝোঁকের মাথায় সব খুলে বললাম। বললাম—মেলায় যেয়ে মোর ভালো লাগেনি, তোমার জন্যে শুধু মন কেমন-কেমন করছিল। শুনে স্বোয়ামী মোর বকবে কি, বুকে জাপটে ধরে হাসতে লাগলো। অমন মানুষ শেখ—আর একটিও দেখিনি।'

বলতে বলতে গলা কাঁপে দুগ্‌গার—চোখে জল এসে পড়ে।

'কোথায় গেল সে-সব মানুষ শেখ, কোথায় গেল মোদের চর!' ···

'সে চরের শুধু আমিই টিকে আছি দুগ্‌গা। আর মোর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছিল সেই বুধি দাসের লালু কুত্তাটা। চর যখন ফাঁকা হয়ে গেল তখন সে কদিন সকলের ভিটে শুঁকে শুঁকে বেড়ালো। তারপর চরও চলে গেল গাঙের তলে—তাকেও আর দেখিনি।' কলিমদ্দি বিষণ্ণ গলায় বললো, 'তারপর মোর আমিনা গেল—ছেলেগুলান গেল একটা একটা করে।'

'মোরটি থাকলে আজ কত বড় হতো শেখ!' দুগ্‌গা বললো, 'তোমার পব্‌নার চেয়েও বড় ছিল দু-বছরের। সে-ও চলে গেল একদিন বুক খালি করে মোর। গেল জমি, গোরু, স্বামী, পুত্‌'—

কেঁদে ফেলে দুগ্গা। চোখ মোছে আঁচলে। বলে, 'আজ অসুখ হলে কেউ নেই দেখবার শেখ—সব মোর ফাঁকা।'

সব ফাঁকা।...

বাইরে ঘনঘোর অন্ধকার—দৃশ্যমান সমস্ত জগৎটা দুগ্গার দেখা স্বপ্নের মতো কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পুরাতন মানুষগুলি, একটি কুলগাছ, একটি কুকুর, মেলার কাহিনী—সব নিয়ে জড়ানো একটা জীবন আজ বড় করুণ আর বড় মায়াময় হয়ে দেখা দেয় সামনে। একদিকে তার কলিমদ্দি শেখ আর একদিকে চোখে জল কস্‌বি দুগ্গা, মাঝখানে দুস্তর অন্ধকারে কোন স্বপ্ন ও জীবনের ডাক পড়ে আজ। হায় রে!...আবহাওয়াটা বড় থম্‌থমে—বড় দুঃসহ মনে হয় দুজনেরই।

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছেই।

ঘনঘোর বর্ষা রাত্রির অন্ধকার সমস্ত বাইরের জগৎটাকে গ্রাস করে যেন ওদের দু-জনের সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে—এমনি ভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে ওরা। দূর থেকে ভেসে আসছে গাঙের কলোচ্ছ্বাস। সমস্ত কিছু জুড়ে আজ ওদের স্মৃতি আর বিস্মৃতি যেন মুখর হয়ে উঠেছে। বহুদিনের পুরানো দুটি বন্ধুর মতো বসে আছে ওরা অসহায় ভাবে। সমস্ত উত্তেজনা কোথায় উবে গেছে কলিমদ্দির। কথায় কথায় দুগ্গা তাকে কোথায় টেনে এনে ফেলেছে যেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দুগ্গা বললো, 'রান্নার পাট শেষ ক'রে আসি—তারপর বসে বসে গপ্প করবো শেখ।'

দুগ্গা উঠে চলে গেল।

উবু হয়ে কলিমদ্দি তেমনি মিইয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ একা। মাথার মধ্যে সবটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে যেন তার। দিকচিহ্নহীন একটা আত্মহারা অন্ধকারে সে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ আগেও চোখ মুখ গরম হয়ে ছিল তার—এখন শীত করছে। হঠাৎ কি মনে হলো, গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। পব্না ঘুমিয়েছিল একপাশে গুটিসুটি হয়ে—তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলো আস্তে আস্তে।

'পব্না—পব্না।'···

পব্না ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। চোখ ঘষতে ঘষতে ভয়ানক অপরাধীর মতো বললো, 'ঘুম ধরে গেছলো বাপ্জান।'

কলিমদ্দি ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'চল যাই এবার।'

'রাতে থাকবে বললে যে!'

'চুপ—কথা বলিস না, চল।'

বাইরে বেরিয়ে পব্নাকে আবার কাঁধে তুলে নিল কলিমদ্দি। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে—তারই মধ্যে দিয়ে সে এগিয়ে চললো সন্তর্পণে।

নাঃ, দুগ্গার ঘরে আর তার ভালো লাগছে না একদণ্ডও। একটা গুরুভার পাষাণ যেন তার ছাতির ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে দুগ্গা। এখনও সেটা চেপে আছে তার দিলের ওপরে—তার কলিজায়।

ভোর ভোর এসে দেখলো হরি মণ্ডল—কলিমদ্দি যথারীতি লাঙল ঠেলছে। পব্না বসে আছে আলের ওপরে।

মণ্ডল বললো, 'কাল তেড়ে ফুঁড়ে কোথায় গেলে বলো দিকিন শেখ?'

'দুগ্গা কসবির কাছে।'

'বটে—বটে!' মণ্ডল রসের গন্ধ পেয়ে যেন উছলে উঠলো এই বুড়ো বয়সেও। বললো, 'এসো এসো—তামুক খাও। শুনি একটু তোমার কথা। কখন এলে? সারা রাত ছিলে?'

বিকৃত উল্লাসে মাছির মতো ভন্ ভন্ ক'রে উঠলো হরি মণ্ডল।

কলিমদ্দি বললো, 'কি আর শুনবে মণ্ডল। দেখলম এ চরের কসবিও কাঁদে।'

'এ্যাঁ—কাঁদিয়ে দিলে একেবারে! খুব মরদ শেখ তুমি।'

'না মণ্ডল, সে-সব কিছু নয়।' কলিমদ্দি কেমন বিষণ্ণ গলায় বললো, 'হাজার হোক—এই চরেরই লেড়কী তো দুগ্‌গা। চরের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললে। মনটা মোর কেমন হয়ে গেল তারপর—পালিয়ে এলম মণ্ডল।'

'ধুস্'—বলে হা-হা ক'রে হাসতে লাগলো হরি মণ্ডল। বললো, 'এই রকম মরদ তুমি! এ্যাঁ!'

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কলিমদ্দি—একেবারে বদ্ধ জলার পানির মতো। বিচ্ছিরি লাগে তার হরি মণ্ডলের হাসি। আরও বিচ্ছিরি লাগে হরি মণ্ডলের রসিকতা। বিদ্রূপের অট্টহাসির সামনে কোণ-ঠাসা হয়ে বসে থাকে সে ঠাণ্ডা মেরে। গা গরম করে তামাক খেয়ে।

হরি মণ্ডল বললো, 'বেঁচে গেছ হে কলিমদ্দি। নিকে-সাদি যে একটা করে বসোনি, বেঁচে গেছ। যুবতী মেয়ামানুষ সামলানো তোমার কম্ম নয়।'

কলিমদ্দি নীরব।

হরি মণ্ডল বললো, 'বিবি তোমার চরতে বেরিয়ে যেত বিন্দাবনের বউয়ের মতো।'

কলিমদ্দি মনে মনে মরে যাচ্ছে লজ্জায়—হীনতায়: দুগ্‌গার কান্নায় কেমন যেন হয়ে গেল তার তেতে ওঠা মন—পালিয়ে এলো। তার ওপরে হরি মণ্ডলের কড়া টিট্‌কারী। বিশ্রী লাগছে। কালকের মতো আর তেড়ে তেড়ে কথা বলার মতো খ্যাপামীও ঠাণ্ডা মেরে গেছে বুকের মধ্যে। মিন্ মিন্ ক'রে শুধু বললো:

'বিবির কথা ভাববার মোর সময় হয়নি গো মণ্ডল—গাঙের তাড়া খেয়ে খেয়ে ভিড়লাম এসে তোমাদের চরে। তাছাড়া বয়সও তো হয়ে গেল!'—

'বয়স!' হরি মণ্ডল হেসে উঠলো আবার। বললো, 'তোমার চেয়ে মোর বয়স অন্তত চার গণ্ডা বেশী। তো মোর ঘরে তো যুবতী বউ। মোকে কি বেসামাল দেখছো। বলো?'

কলিমদ্দি মিন্ মিন্ ক'রে বললে, 'তোমার কথা আলাদা মণ্ডল।'

'কেন!'

'তুমি মাতব্বর লোক।'

মণ্ডল বললো, 'তা নয় শেখ—মরদের তেজ চাই। এক হাঁকাড়ি দেবে, তো শালার মেয়েমানুষ জোঁক। বুঝলে? মেয়েমানুষ লেপটে থাকবে তোমার গায়ে গায়ে।' বলে চওড়া বুকটাকে চিতিয়ে ধরে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকালো মণ্ডল কলিমদ্দির দিকে। সগর্বে। কলিমদ্দি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

দীর্ঘ কাঠামো—চৌকো মুখ—কর্মঠ পেশী—লম্বা চওড়া চেহারা। কলিমদ্দির নিরীহ দৃষ্টির সামনে নিজেকে সগর্বে দেখিয়ে হা-হা করে হাসছে লোকটা। এ চরের সম্পন্ন চাষী—মাতব্বর, এ চরের পয়লা নম্বর দলের পুরানো লোক। ওঝা বলো, গুনিন বলো, বৈষয়িক ব্যাপারের ফন্দিটন্দি বলো—সবটাই জানা আছে কিছু কিছু। বিপদে আপদে এই লোকটার অভিজ্ঞতার কাছে চরের সবাইকেই প্রায় দারস্থ হতে হয়। গোরুর কাঁধের দরদ থেকে সাপ-কাটির ওষুধ—সবটাই সামাল দিতে পারে সে, ঠ্যাকা দেয় গরীব চাষীর অভাব অনটনেও। মাতব্বর এ হরি মণ্ডলের কথা স্বতন্ত্র। তার সম্পদ আছে—পৌরুষও আছে।

১৮

হরি মণ্ডলের সম্পদ আর পৌরুষের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে লেপটে আছে তুলসী। মণ্ডলের সচ্ছল সংসারে ভয়ে ভয়ে পা ফেলে সে। ভয়ে

ভয়ে তাকায় না সে এই লোকটার মুখের দিকে। নতুন বিয়ের পরে হরি মণ্ডল একদিন এই ভীতু মেয়েটাকে বিছানায় হিড় হিড় ক'রে টেনে এনে শুধিয়েছিল, 'কি গো, বুড়া বলে গোসা ক'রে রইলে না কি!'

তুলসী তো ভয়ে চুপ।

'এ্যাঁ, বুড়া বলে মোকে পছন্দ হচ্ছে না? বলো না?'

তুলসী ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে সেদিন চেয়েছিল দীর্ঘ কাঠামোর এই লোকটার দিকে—আশা করছিল প্রতিমুহূর্তে, এই হয়তো পেটাতে সুরু করবে। না, এ লোকটার মধ্যে জীর্ণ বার্ধক্যকে সে কোথাও দেখে না। চাষ-আবাদ করতে গিয়ে একটা জোয়ানেরই মতো সে মাঠের কাদায় ভূত হয়ে ঘরে ফেরে। সমস্ত চেহারাটায় একটা কর্মঠ ঋজু কঠিনতা জমাট বেঁধে আছে। কর্কশ হাতের চওড়া চওড়া পাঞ্জা, তার মোটা মোটা আঙুল গুলো গভীর প্রেমের আবেগে যখন আদর করে তাকে, তখন ভয় করে তুলসীর: কে জানে, হয়তো ওই বলিষ্ঠ কঠিন পাঞ্জা ঠেসে ধরবে তার গলা। সে পাঞ্জার জোরের কাছে হেরে মরে যাবে তুলসী। ভয়ে সে এতটুকু হয়ে থাকে এই লম্বা চওড়া কাঠামোর লোকটার সামনে।

এর ওপরে আছে আরো—মণ্ডলের বোন ভামীর বাক্যবাণ। সে-ই ছিল এতদিন বিপত্নীক মণ্ডলের সংসারে একমাত্র কর্ত্রী। ভেবেছিল— এমনি ক'রেই দিন যাবে। কিন্তু কোথা থেকে সব উল্টে পাল্টে গেল যেন। 'বাপখাগী' তুলসী হয়ে গেল এ বাড়ীর বউ। বিধবা হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে একদিন সে আশ্রয় নিয়েছিল এসে দাদার সংসারে একটি কচি ছেলের হাত ধরে। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। কিন্তু আর যেন দিন কাটানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে তার। হরি মণ্ডলের বুড়ো বয়সের প্রেম আর মিনমিনে বউটার কর্তৃত্বের সম্ভাবনা তাকে পাগল ক'রে তোলে। হরি মণ্ডল ঘরে এলেই বলবে:

'ই হারামজাদী বউকে কোথায় তুই দূর করবি দাদা, কর।'

হরি মণ্ডল শোনে, বোনকে কোনো রকমে শান্ত করে—বোঝে মণ্ডল, বিধবা বোনদের দাদার সংসারে এই দশা। সর্বত্রই ঘটে। কিন্তু একদিন সে জ্বলে উঠলো বোনের ওপরেই, 'ফ্যাচর ফ্যাচর করিসনি—চুপ কর।'

'এ্যাঁ, মোকে চুপ করতে বললে!' বাস্—আগুন জ্বলে গেল ভামীর মাথায়, 'এ্যাঁ, মোর ওপরে বিষ!'

হরি মণ্ডল গর্ গর্ ক'রে বললো, 'বউটার পেছনে তুই বড্ড লাগিস্।'

'আমি পেছনে লাগি! হে ভগমান।'—উত্তরোত্তর গলা চড়তে লাগলো ভামীর, 'তুই যেমন এক ভেড়ুয়া!'

সবে মাঠ থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে মণ্ডল—চটে বললে, 'মুখ সামাল দে ভামী। জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলাবো একেবারে।'

'এ্যাঁ, মোর গায়ে হাত! ওরে বুড়া ভেড়ুয়া রে!'—

হরি মণ্ডল লাঙল তুলেই তাড়া ক'রে গেল—ভামীকে মেরেই ফেলবে!

কিন্তু ভামী নড়লো না এক পা। বরং রাগ চেপে হরি মণ্ডলই ফিরে আসতে বাধ্য হলো, পড়শী কয়েকজন এসে ধরে ফেললো মণ্ডলকে। গর্ গর্ করতে করতে চলে গেল মণ্ডল, নাইতে গেল, খেল, একটু জিরিয়ে মাঠে চলে গেল। ভামী কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। থেকে থেকে নেচে-কুঁদে গাল পাড়ছে চিৎকার করে:

'ওরে পোড়ার মুখ রে, সেই গোয়ালের কাণ্ডকারখানা জানি রে। সাত দিন ভিরমি খেয়ে পড়ে ছিলি রে। ছেলে যে তোকে মেরে ফেলতো রে। হাড় জুড়েতো রে!—ছেলের এঁটো চাটিস রে!'

গাল পাড়তে পাড়তে আট বছরের ছেলেটার হাত ধরে বিকেলের দিকে চলে গেল কোথায় না কোথায়। আর তার দাদার সংসারে

ফিরলো না ভামী। বলে গেল, 'ওই পাপের সংসারে আর না। বরং ভিক্ মেগে খাব।'—

ভামী চলে গেল।

তুলসী ভয়ে কাঠ। ফেরাতে গিয়েছিল, লাথি খেয়ে ফিরে এসেছে। হরি মণ্ডলের অপেক্ষা করতে লাগলো সে: লোকটা ঘরে আসবে আর তাকে শূন্যে তুলে আছড়ে মেরে ফেলবে আজ নির্ঘাত।

কিন্তু মণ্ডল কিছুই করলো না। শুধু বললো, 'মরুক। মেয়েমানুষের বেশী বাড় ভালো না।'

কদিন দেখলো তুলসী, হয়তো ভামী ফিরে আসবে; কোথায় যাবে একলা মেয়ে লোক। কিন্তু দিন গেল, ভামী আর ফিরলো না। এবার তার একার সংসার—কাজে ঠাসা দিন, গোরু-ছাগলের তোয়াজ—ঘরকন্না, আর অহেতুক একটা ভয়: কবে হরি মণ্ডল তাকে ধরে মেরে টেনে নিয়ে ঠেসে ধরে গলা টিপে দেবে। কেউ জানবে না। ভামীও নেই যে একটু সাড়াশব্দও পাবে। আশ্চর্য! বাঁচবার জন্যে তখন কান্না পায় তার। অসংখ্য কাজের মধ্যে সব ভুলে হাঁ-করে চেয়ে থাকে সে ওস্তাদের নিঃসাড় ঘরটার দিকে। মরতে তার কেমন ভয় করে—এত দুঃখেও।

দুপুরে একটু জিরিয়ে হরি মণ্ডল বেরিয়ে যায় মাঠের কাজে। ঘরে একা তুলসী। এতক্ষণে বুকের দুরদুরুনিটা যেন কমে। চোখ তুলে তাকায় এদিক ওদিক। জনহীন পুবচরটা যেন হু-হু করে ওঠে তার মনের মধ্যে। বুকের ভেতরটা টনটন্ করে। তার সমস্ত প্রত্যাশা আর স্বপ্ন শূন্য ঘরে এসে তাকে যেন ঘিরে ধরে: কোথায় যে গেল ওস্তাদ!

একদিন পায় পায় এগিয়ে গেল সে ওস্তাদের ঘরের দিকে। হরি মণ্ডল তখন মাঠে বেরিয়ে গেছে। পথ দিয়ে গেল না তুলসী—ঘুরে গেল বনে-বাদাড়ে, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে—পাছে কেউ দেখে ফেলে।

ঘরের সামনে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। বাঁশের দরোজায় লাগানো তালাটায় মর্চে ধরে কালো হয়ে গেছে। আশপাশের ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো—ঘরের ভেতর অন্ধকার। নাকে এসে লাগে ভ্যাপসা নোনা গন্ধের গুমোট।

এমন সময় আশপাশের ঝোপে কোথায় যেন শব্দ হ'লো সর্‌সর্‌ ক'রে। চম্‌কে ফিরে তাকালো তুলসী। মণ্ডল দাঁড়িয়ে আছে গাছ-পালার আড়ালে সরু পথটার ওপরে। তুলসীর মনে হলো—এখুনি মরে যাবে সে। এবং বাঁচবার অন্ধ-তাড়নায় যেন ছুটে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরলো হরি মণ্ডলের। কেঁদে উঠে হাউমাউ ক'রে অনেক কি বললো, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু একটা বোবা পশুর মতো গোঙিয়ে গোঙিয়ে মাথা কুটতে লাগলো মাটিতে।

একটি কথাও বললো না হরি মণ্ডল: চলে গেল মাঠের দিকে। পায়ের প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে তুলসী শুধু ছিটকে পড়ল একদিকে। মণ্ডল আর ফিরেও তাকালো না।

সন্ধ্যেবেলা হরি মণ্ডল ফিরে এলো মাঠ থেকে। ঘর দোর অন্ধকার। রান্না ঘরে আলো জ্বলছে শুধু। একটা গুন্‌গুন্‌ গানের সুর ভেসে আসছে সেদিক থেকে। অবাক হলো হরি মণ্ডল—তার ঘরে আবার গান গায় কে! গান আবার সেই নফর মণ্ডলের আখড়ার গান।

কাছে গিয়ে দেখে—তুলসী। পারিপাটি ক'রে চুল বেঁধেছে। পরে বসেছে একটি ভালো শাড়ী। আর গুন্‌গুন্‌ ক'রে গাইছে:

জ্বালাটা—প্রাণ-জ্বালাটা
উঠলো যে মোর মনে লো—
জ্বালার কথা।...

হরি মণ্ডল গিয়ে দাঁড়ালো সামনে। তুলসী তাকে কেয়ারই করলো না।

হরি মণ্ডল ডাকলো, 'বউ!'

তুলসী সাড়া দিল, 'উঁ।'

অবাক হয় হরি মণ্ডল। মেয়েটা তো ভয় পেল না তার ডাকে! মণ্ডল নিজেই কেমন ঘাবড়ে যায়। পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তুলসীর। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো আবার, 'বউ!'

'আঁ···া···া—।'

হঠাৎ একটা আর্তনাদ ক'রে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো তুলসী। সুরু হলো হাত পায়ের খিঁচুনি। দেখতে দেখতে শক্ত কাঠ হয়ে গেল যেন।

হরি মণ্ডল ছুটে গিয়ে জল আনলো—ছিটিয়ে দিল চোখে-মুখে। দাঁত কপাটি লেগে গেছে। হাতের মুঠো ছুটো শক্ত।

এমন সময় কলিমদ্দির ডাক শোনা গেল, 'মণ্ডল!'

হরি মণ্ডল ডাকলো, 'ইদিকে চলে এসো কলিমদ্দি।'

'কি হলো মণ্ডল!' কলিমদ্দি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'বোধ হয় খারাপ হাওয়া-টাওয়া একটু বেধে গেছে শেখ।'

'ভূতে ধরেছে বলছো?'

'হ্যাঁ গো—তবে আর বলছি কি। বয়সটা তো ভালো না। এ বয়সে ও রকম ধরে একটা না একটা। তুমি একটু ছুঁয়ে বসো দিকিন একে। আমি আর একটু জল আনি।'

ভূতের নাম শুনে পর্‌নার মুখটা শুকিয়ে গেছে। বাপের গায়ে লেপটে থাকলো সে। কলিমদ্দি পা ছুঁয়ে বসলো তুলসীর।

হরি মণ্ডল গা-হাত-পার কাদা ধুয়ে সাফসুফ হয়ে জলে মন্ত্র পড়তে বসলো। কি বললো বিড় বিড় ক'রে—ঘটির জলে ফুঁ দিল বারকয়েক।

মাটিতে হাত ঠেকিয়ে গড় করলো কার উদ্দেশ্যে যেন। তার জল-পড়ার দিকে হাঁ-করে চেয়ে বসে রইলো কলিমদ্দি আর পবনা।

তারপর মণ্ডল মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে দিল তুলসীর গায়ে। সেই জল মুখে দিয়ে মুখে আঙুল পুরে আস্তে আস্তে দাঁত-কপাটি ছাড়ালো। কিছুক্ষণ পরে হাতের বদ্ধমুষ্টিও শিথিল হয়ে গেল আস্তে আস্তে। কিন্তু তুলসী উঠে বসলো না তবুও।

কলিমদ্দি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো, 'ভূত কি ছেড়ে গেল মণ্ডল ?'

হরি মণ্ডল তুলসীর চিৎপাত শরীরটার দিকে গভীর চোখে চেয়ে চেয়ে বললো, 'না হে। এ সহজে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তবে ! হুঁশ হবে তো ?'

'তা হবে। তবে সহজে ছাড়বে না শালার ভূত। বয়সটা কাঁচা কি-না !'

'আহা, বড় ভাল মেয়া—বড় ঠাণ্ডা মেয়া গো মণ্ডল ! অমন আর একটি ছিল না মোদের চরে।'

হরি মণ্ডল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চেয়ে রইলো তুলসীর ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখটার দিকে। ভাবতে লাগলো—এ ভূতকে ছাড়াবে কি ক'রে।

১৯

ভর চাষের সময়—গোরু বলদের তোয়াজ দরকার বেশী। আর ঠিক এই সময়েই তুলসীকে ভূতে ধরলো ! ব্যাপারটা মণ্ডলকে খুব চিন্তায় ফেলে দেয়। রাতে কয়েকবার আলো জ্বেলে দেখলো—তুলসী ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলো মণ্ডল—তুলসী এক মনে লেগে গেছে ঘর-সংসারের কাজে। রোজকারের মতো। মণ্ডল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ! যাক—অল্পতেই ভূতটা তা হলে ছেড়ে গেল।

ভোর ভোঁর খবর নিতে এসেছিল কলিমদ্দি। মণ্ডল হেসে বললো, 'ভূত ছেড়ে গেছে শেখ।'

'গেছে!' কলিমদ্দি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে মণ্ডলের দিকে চেয়ে বললো, 'তোমার গুণ-বিদ্যার জোর মণ্ডল!'

হরি মণ্ডল খুশি হয়ে হাসলো।

দুপুরের দিকে মণ্ডলের গুণ-বিদ্যের সব কেরামতি আবার ভেস্তে গেল। আবার বোধ হয় ভূতে ধরলো তুলসীকে। হঠাৎ সে পাগলীর মতো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল ওস্তাদের নিঃসাড় ঘরটার দিকে—মণ্ডল চেপে ধরলো তার দুটো হাত। জোরে জোরে ডেকে যেন তার চৈতন্য ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলো মণ্ডল :

'বউ—বউ!'

তুলসী কেঁদে কাৎরে উঠলো—হাত ছাড়াতে চাইলো মণ্ডলের, 'না না—ছেড়ে দাও মোকে—ছেড়ে দাও বলছি।'

'যাবি কোথায় বউ! শুনছিস?—বউ!'

হরি মণ্ডলের কোনো হাঁকেই চৈতন্য ফেরে না তুলসীর। সে শুধু চেষ্টা করতে লাগলো মণ্ডলের হাতটা ছাড়াবার জন্যে। আর কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মণ্ডল এবার জোরে একটা ঝাঁকানী দিলে তুলসীর কাঁধ ধরে। সেই ঝাঁকানীতে মেয়েটা হঠাৎ যেন থমকে তাকালো মণ্ডলের চোখে চোখে, কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে। তারপর উলটে পড়লো দুম ক'রে। হাত-পা খিঁচুতে খিঁচুতে শক্ত হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

দূর থেকে কয়েকটি পড়শী মেয়ে দেখছিল এদের কাণ্ডকারখানা—ভেবেছিল একটা কিছু রাগ অভিমানের ব্যাপার ঘটেছে হয়তো দুজনার মধ্যে। তারপর হঠাৎ তুলসীকে উলটে পড়ে যেতে দেখে ছুটে এলো তারা।

মণ্ডল তখন বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে : এর পরে কি করবে এই ভূতকে নিয়ে!

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো গো মণ্ডল?'

মণ্ডল বললো, 'কাল থেকে এমনি হচ্ছে—ভূতে ধরেছে। যাবে যতো সব অজায়গায় কুজায়গায়—ধরবে না কেন বলো?'

'কোথায় গেছলো গো মণ্ডল!'

'ওই মুখি রাঁড়ীর ভিটের দিকে। সে মাগী তো আছে ওই ভিটেতে অপঘাতে মরে।'—

শুনে মেয়েরা কাঠ মেরে দাঁড়িয়ে রইলো।

মণ্ডল বললো, 'তোমরা একটু ধর দিকিন ওকে—ঘরে নিয়ে যাই।'

তুলসীকে ধরাধরি করে তারপর ঘরে আনা হলো। গতকালের মতোই মণ্ডল তার মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে দিল তুলসীর গায়ে, মুখে চোখে। সেই জল দিয়ে দাঁত-কপাটি ছাড়িয়ে দিল মেয়েরা। তুলসী কিন্তু চোখ বুজে একভাবে ঝিমিয়ে পড়ে রইলো।

মেয়েরা থেকে থেকে সাগ্রহে শুধু জিজ্ঞেস করে মণ্ডলকে, 'ভূত ছাড়লো মণ্ডল?'

মণ্ডল শেষ পর্যন্ত চটে উঠলো, 'ছাড়লে তো দেখতেই পাবে।'

মণ্ডল ফের ঝাড়ফুঁক দিতে বসলো। কিন্তু তুলসী একটুও গা-নাড়া দিল না—ঝিমিয়ে পড়ে রইলো এক ভাবে।

মণ্ডলের মুখটা ব্যাজার হয়ে উঠলো। গালাগাল দিয়ে উঠলো মুখি রাঁড়ীর উদ্দেশে :

'সারা জীবন গেছে ছেনালী ক'রে—মোকে জ্বালাচ্ছে এখন ভূত হয়ে। কাল ছেড়ে গেল শালা ঝপ ক'রে—আজ আবার ছাখো, খচড়ামো করতে লেগেছে।'

মেয়েরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো আবার, 'ছাড়লোনি মণ্ডল—না?

'নাঃ।' মণ্ডল বললো বিরক্ত হয়ে, 'মোকে ভোগাবে।'

আনন্দি বুড়ী বললে, 'মোকেও ভূতে ধরেছিল এমনি একবার মণ্ডল। তখনও ছেলেপুলে হয়নি মোর, কাঁচা বয়েস। ভর দুক্কুর বেলা একা গেছি গাঙের ধারে নুন-মাটি আনতে। একটা খারাপ হাওয়া ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল মোর ওপর দিয়ে। বাস্, ঘরে এসে ওই নুন-মাটির ঝুড়ি নিয়ে পড়ে গেলাম দড়াম ক'রে। তারপর কত শেকড়-বাকড় গুনিন!—সব এলিয়ে গেল। মোর বড় ছেলে পেটে আসতে তবে ভূত ছাড়লো। সে ভূতটা ছিল মদ্দা। গুনিন বলেছিল। আর ওই মদ্দা ভূত গুলিন বড্ড জ্বালায় মণ্ডল সোমত্ত মেয়াদের।'

মণ্ডলও ভাবছিল কপাল কুঁচকে—কে জানে, তুলসীর ভূত মদ্দা না মাদি! মুখি রাঁড়ী নাও হতে পারে—হয়তো তার ব্যাটাই—সেই যাত্রার দলের ছোঁড়া। গিয়েছিল সুন্দরবন—হয়তো মরে-টরে গেছে সেখানে। তারপর ভূত হয়ে এসে ঢুকেছে তার নতুন ঘরে। হিয়ের টান ছিল তো!

তুলসীকে ভূতে ধরার খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল চরময়। মেয়েরা ভিড় করে দেখতে এলো তাকে। এবং যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই যেন তুলসীকে ভূতে চেপে ধরতে লাগলো। তার হাসি, গান, উলঙ্গ হয়ে গড়াগড়ি—হঠাৎ কোন এক ফাঁকে ছুটে চলে যাওয়া ওস্তাদের ঘরের দিকে, তারপর হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে মূর্চ্ছা—এ ঘটতে লাগলো দিনের পর দিন। প্রথম দিকে ভালো যখন থাকতো একটু, তখন বসে থাকতো ঝিম মেরে। কিন্তু পরের দিকে কেটে গেল এই ঝিম-মারা ভাবটা। চরের কোন মেয়ে দেখতে এলে বরং বলে উঠতো:

'এই,—তুমি আবার এলে জ্বালাতে রাত দু'পহরে।'

কোথায় রাত! খব্‌খব্‌ করছে হয়তো দিন দুপুর।

'রাত কোথায় লো !' মেয়েরা বলতো, 'দিন ফুটে আছে খই মুড়ির মতো !'

'না না, যাও—শুতে যাব এখন।'

'আচ্ছা যাস শুতে—তোকে ধরেছে কে বল দিকিনি ?'

'ধরবে আবার কে ! যাও তোমরা, আমি শুতে যাব।'

'কার সঙ্গে শুবি লো ?'

'ও মাগো !' খিল খিল করে হাসিতে ফেটে পড়ে তুলসী, 'যাও—এখন জ্বালিও না বাপু।'—

ওর কথাবার্তার ধরনধারণে বুড়ি আনন্দি মণ্ডলকে বললে একদিন, 'ওকে মুখি রাঁড়ী কখ্খনো ধরেনি মণ্ডল—বলে দিলম। ই নিঘ্ঘাত মদ্দা ভূত।'

মণ্ডল বললো, 'কিন্তু মুখি রাঁড়ীর ভিটের পাশে যেদিন গেছলো—সেই দিন সন্ধ্যে বেলাই ভূতে ধরেছে।'

'এ ভূত মুখি রাঁড়ী নয়।' আনন্দি বললে, 'ওই সেই বোবা ছোঁড়াটাই হয়তো হবে—লাটে গিয়ে মরে-টরে গেছে হয়তো অপঘাতে। এ সেই। জানি তো ওদের খুব ভাব ছিল।'

'এ যে মদ্দা ভূত—বুঝলি কি করে ?'

'না হলে শুধু শুতে যাওয়ার কথা ওর মুখে লেগে আছে কেন বলো ?'

মণ্ডলের মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়—ঝুলে পড়ে নিচের বুড়ো চোয়ালটা।

আনন্দি বললো, 'তুমি বড় গুনিন আনিয়ে দর্পণ দেখাও মণ্ডল—ভূত ধরা পড়বে। ওই দ্যাখো, বড় গুনিনের কথা বলতে তুলসী কেমন ক'রে তাকাচ্ছে কটমট ক'রে।'

মণ্ডল চিন্তিত হয়ে বললো, 'বড় গুনিনই ডাকবো ভাবছি আনন্দি।'

আনন্দি'গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললো, 'তাই করো চটপট মণ্ডল, কবে কার ঘাড় মটকে দেবে তার ঠিক নাই। মোরা পাঁচ কথা বলছি—সব শুনছে তো ওর মধ্যে থেকে।' তারপর আনন্দি তুলসীর দিকে চেয়ে বড় গলা করে বললে, 'এবার ভাল হয়ে যাবি লো—ভাবিস নি।'

তুলসী চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি চলে যাব বলছি—চলে যাব।'

'তো যা না'—আনন্দি বললো, 'কে তোর আছে কোন কুলে, চলে যা কোথায় যাবি। তোর ভাগ্যি ভালো মণ্ডলের ঘরে বউ হয়ে ঢুকেছিস।'

হরি মণ্ডল বললো, 'ওই দ্যাখো, চলে গেল। ওই এক কথা ওর মুখে।'

আনন্দি বললো, 'ও কথা কি আর ও নিজে বলে, বলে ওর মধ্যে যে ভূত রয়েছে—তিনি! ওকে নিঘ্‌ঘাত কোথাও উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চায় তোমার কাছ থেকে। তুমি তো সব জানো মণ্ডল—গুনিন লোক।'

মণ্ডল বিব্রত ভাবে বললো, 'দ্যাখো দিকিনি মোর জ্বালা। দেখি আবার কোথায় চলে গেল!'

কোথাও যায়নি তুলসী। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাঁ-করে চেয়ে আছে ওস্তাদের কুঁড়েটার দিকে। ওর শান্ত ভীরু চোখের সমস্ত সজল প্রশান্তি আর ভয় কি এক তীব্র দহনে দহিত হয়ে বাষ্পের মতো যেন উবে গেছে—এখন আছে শুধু জ্বালাটুকু। তার দেহযন্ত্রের কোন গভীরে বহু প্রত্যাশায় প্রজ্জ্বলিত সেই জ্বালাটা ব্যর্থতায় আর হতাশায় তার সমস্ত দেহ আর মন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যেন খাক করে দিচ্ছে। সে জ্বালা তার নারীত্বের—তার প্রত্যাশিত জননী জীবনের, বুড়ো হরি মণ্ডল যে তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। এরা বলে ভূত।

শেষ পর্যন্ত একদিন বড় গুনিন এলো তুলসীর ভূত ছাড়াবার জন্যে। শুনলো সব আদ্যোপান্ত ইতিহাস। শুনলো ওস্তাদের কথা—ওদের ভাব-সাবের কথা। শুনে গুরিদাস গুনিন বললে, 'মোর মনে হয় বাঘা ভূত।'

মণ্ডল উদাসী ভাবে বললো, 'হবে।'

'অস্তাদ লাটে গেছলো বলছো যখন,' গুরিদাস বললো, 'বাঘের পেটে গেছে হয়তো। ই ভূত ছাড়াতে বড় কষ্ট আছে মণ্ডল।'

মণ্ডল বললো, 'যাই হোক, মোকে উদ্ধার করে দাও ভাই।'

'এ বড় বিপদের কাজ মণ্ডল।' গুরিদাস বললো, 'বাঘের পেটে যাওয়া মানুষ, একেবারে জলজ্যান্ত একটা লোক মরে যায় ধড়ফড় করে। এ সে ভূত হলে আর রক্ষা নাই। পারলে গুনিনেরই ঘাড় মটকে দেয়।'

গ্রামের মরদেরা জড়ো হয়েছে সবাই—মেয়েরা কান পেতে শুনছে আশ-পাশ থেকে। তুলসী বসে আছে সামনে—শুনছে শূন্য চোখ মিলে।

গুরিদাস বললো, 'এ ভূত তবু আমি নামিয়ে দিচ্ছি কিন্তু পাঁচটি টাকা দিতে হবে মণ্ডল।'

মণ্ডল বললো, 'দেবো।'

'আর একখানি লতুন কাপড় লতুন গামছা। লতুন বস্ত্র পরে আমি ভূতকে তোমার বাস্তুর সীমানা থেকে বার ক'রে কোনো একটা গাছে বেঁধে দিয়ে যাব।'

'বেশ, সব দেবো। মোকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো।' মণ্ডল বললো।

'দেখি তবে তোমার কেমন বাঘা ভূত। আমিও গুনিন গুরুদাস।' বলে সোৎসাহে কাপড় এঁটে পরলো গুরিদাস। হাতে নিল ভূত ছাড়ানো হাতখানেক একটা লাঠি বা কোঁৎকা—সেটা কাঠের না বাঁশের

বোঝার উপায় নেই। তেল পাকানো কালো ঝিম। গিয়ে বসলো তুলসীর সামনে।

বেঁটেখাট এই রুক্ষ লোকটার দিকে চেয়ে তুলসী কেমন ঘাবড়ে গেল যেন।

গুরিদাস বললো, 'কটমট ক'রে চাইচিস কি—এঁ্যা?' ছোট কোঁৎকাটা তুলে বললো, 'এবার পড়েছিস গুনিন গুরিদাসের পাল্লায়—দেখি তুই কত বড় বাঘা ভূত।'

তুলসীর চোখে দেখা গেল এবার ভয়। পেছোবার চেষ্টা করছে।

গুরিদাস হেসে উঠলো। আস্ফালন করে বললো, 'থাম—এখনও হলুদ পোড়াইনি। মোকে একটা শুকনো হলুদ দাও মণ্ডল।'

একটি মেয়ে হলুদ এনে দিলে তাড়াতাড়ি। গুরিদাস হলুদের ওপরে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিল। তারপর সেই হলুদটা পুড়িয়ে ধরলো তুলসীর নাকের কাছে। অসহ্য গন্ধে তুলসী নাকে ঢাকা দিতে চাইলো।

গুরিদাস হুংকার দিয়ে উঠলো, 'নাম বল—নাম বল, কে তুই।'

'আমি তুলসী—আমি'—

'তুই তুলসী!' গুরিদাস হেসে বললো, 'তাকে মোরা জানি। তাকে ধরেছে কে বল—তার নামটাই চাই?'

নাকে আবার হলুদ-পোড়া ধরা হলো। একটা বিটকেল গন্ধে নাকে কাপড় দিল সবাই। তুলসী ছটফট ক'রে উঠলো।

'বল নাম।' গুরিদাস মাটিতে কোঁৎকার বাড়ি দিল।

'আমি বাঘা ভূত।' তুলসী গুরিদাসের রূঢ় চোখের দিকে চেয়ে বললো বিহ্বল ভাবে।

'সে আমি আগেই টের পেয়েছি। তা তোর নাম কী?'

'তুলসী—তুলসী!'

'আবার !' হুংকার দিল গুরিদাস।

তুলসী কেঁদে শেষে বললে, 'জানিনি।'

গুরিদাস দম নিয়ে বললো, 'কোথায় ধরলি তুলসীকে বল?'

'মুখি রাঁড়ীর ভিটের কাছে।'

'কখন?'

'দুপুর বেলা।'

এ ক-দিন পাঁচ মুখে মুখে যা যা শুনেছে তুলসী, বলে গেল গড়গড় করে।

'হুম্। তো নাম বলবিনি?'

তুলসী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো শূন্য চোখে।

গুরিদাস বললো, 'আমি দর্পণে ধরে দিচ্ছি শালার ভূতকে। একটা কাঁঠাল পাতা আনো আর সিঁদুর একটু আনো।'

এবার এলো কাঁঠাল পাতা আর সিঁদুর। গুরিদাস মন্ত্র পড়ে কাঁঠাল পাতার মাঝখানে বেশ বড় করে একটা সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে দিল। তারপর আয়নার ওপরে রাখলো সিঁদুর মাখানো কাঁটাল পাতাটা। তার সামনে উবু হয়ে বসলো তুলসী।

গুরিদাস তুলসীকে বললো, 'ওই সিঁদুরের ফোঁটার ঠিক মাঝখানটিতে এক-নজরে দেখবে মণ্ডলের বউ। আলো দেখতে পাবে। সেখানে যা যা দেখবে—সব বলবে। ভূত তোমার গলা চেপে ধরবে, বলতে দেবে না—জানি, তবু ঠিক ঠিক জবাব দেবে যা শুধোবো। তোমাকে মোরা সারিয়ে তুলতে চাই। বুঝলে? এখন বলো কি দেখছো?'

ছোট্ট একটি আলোর কণিকা ভেঙে এসে পড়েছে উধ্বর্মুখী আয়নার রশ্মি থেকে চিকন কাঁঠাল পাতার ওপরে। তুলসী সেইটের দিকে চেয়ে বললো, 'আলো।'

'ভালো করে দ্যাখো—আলোটা বড় হবে।'

মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করছে তুলসীর। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। ছোট আলোর বিন্দুটা যেন অনেক বড় লাগছে এবার।

গুরিদাস বললো, 'আলোর মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে?'

'না।'

'ভালো করে ছাখো—গাছপালা টিপি চর—কিছু দেখা যাচ্ছে কি না। দেখছো?'

সম্মোহিত তুলসী এবার বললো, 'দেখছি।'

'কি?'

'একটা গাছ।'

'গাছে কি আছে? এক ঠেঙে, গলা কাটা, ঘোড়া ভূত—বাঘা ভূত?'

'ও মা গো!' তুলসী আর্তনাদ করে উঠলো, 'মোকে খেয়ে ফেলবে বলছে।'

'হুম্।' গুরিদাস বললো, 'গাছে কতগুলান ভূত আছে?'

'অনেক। ও মা গো! কিলবিল করছে।'

'বাঘা ভূতটাকে চিনতে পারো?'

'ও মা গো! অস্তাদ—অস্তাদ!'

হঠাৎ উল্টে পড়লো তুলসী—গোঁ গোঁ করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

গুরিদাস তার কোঁৎকা বাগিয়ে মেয়ে মরদের ভিড়ের দিকে চেয়ে হাসলো একটু সগৌরবে: ভূতকে এবার চেনা গেছে। সবাই অপেক্ষা করছে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে।

গুরিদাস মন্ত্র-পড়া জল দিয়ে মূর্চ্ছা ছাড়ালো তুলসীর। তারপর তাকে টেনে বসালো জোর করে। তুলসীর চোখে মুখে অপরিমেয় ক্লান্তি।

গুরিদাস হুংকার দিয়ে বললো, 'সিধে তাকাও মোর দিকে—সিধে।'

তুলসী তাকালো ফ্যাল ফ্যাল করে—সে দৃষ্টিতে মগজের স্পর্শ নেই। ফাঁকা বোকা দৃষ্টি।

গুরিদাস কোঁৎকা বাগিয়ে তুলসীর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখের দিকে চেয়ে সুরু করলো ভূতের সঙ্গে কথা বলা, 'এবার যে ধরা পড়ে গেছ চাঁদ। এখন সিধে কথার জবাব দাও, তুলসীকে ছেড়ে যাবে কি না?'

তুলসী তবু চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে।

গুরিদাস হুংকার দিয়ে বললো, 'ছেড়ে যাবে না গুরিদাসের বাড়ি খাবে।' বলে হাতের ছোট কোঁৎকাটা তুলে আস্ফালন করলো গুরিদাস।

তুলসীর ভাবলেশহীন মুখে এবার ভয় দেখা গেল।

'ছেড়ে যাবে—না ছাড়াতে হবে? বলো অস্তাদ।'

'না—না—না।' তুলসী যেন তার সমস্ত প্রাণশক্তি শেষবারের মতো জড়ো করে আর্তনাদ করে উঠলো। গুরিদাসের কোনো ভূতুড়ে সম্মোহনকে মানলো না।

গুরিদাস সকলের দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'বাঘা ভূতের কাণ্ড দেখ! ছাড়বে না। আচ্ছা'—দাঁতে দাঁত চেপে গুরিদাস ভূতের সঙ্গে আবার কথা সুরু করলো, 'বলি, ছাড়বে না, কেন?'

তুলসী জবাব দিল, 'তাকে মোর ভালো লাগে।'

গুরিদাস হুংকার দিয়ে বললো, 'শেষবার বলছি—ছেড়ে দাও ওকে। নইলে ভালো হবে না।' বলে কোঁৎকা আস্ফালন করলো ফের।

'আমি মরে যাব যে গো!'—তুলসী কেঁদে ফেললে।

গুনিন গুরিদাস বোধ হয় আর রাগ সামলাতে পারলে না এই বেয়াড়া বাঘা ভূতের গোঁ দেখে। ধাঁই করে বসিয়ে দিলে কোঁৎকার এক বাড়ি তুলসীর পিঠে—তারপর এলোপাথাড়ি মার।

তুলসী আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'ছেড়ে দেব—ছেড়ে দেব!'—

গুরিদাস বললো, 'যাবে? চলে যাও—চলে যাও তবে।'

'আমি চলে যাব—চলে যাব।' তুলসী বলে উঠলো সম্মোহিত কণ্ঠে।

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

'আর কোনোদিন এ মুখো হবে ?'

'না।'

'ছ্যাচড়ামী করলে এই বাড়ি!' কোঁৎকা তুলে দেখালো ফের গুরিদাস। বললো, 'ছেড়ে যে যাবি তার প্রমাণ দিতে হবে। ওই জলের ঘটি দাঁতে করে নিয়ে যেতে হবে দাওয়ায়।'

'যাব।' সম্মোহিত কণ্ঠে বললো তুলসী।

গুরিদাস মন্ত্র-পড়া জল ছড়িয়ে দিল সারা ঘরে—ভিড়ের গায়, তুলসীর গায়ে। দিয়ে তুলসীর সামনে এগিয়ে দিল জলের ঘটিটা। বললো, 'দাঁতে করে তোল ঘটি।'

তুলসী দাঁত দিয়ে কামড়ে ঘটিটাকে তুললো অনেক কষ্টে।

গুরিদাস কোঁৎকা আস্ফালন করে বললো, 'চল দাওয়ায়।'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সম্মোহিত তুলসী দাঁতে ঘটির কানা কামড়ে। মেয়েটা টলছে। টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে। দাওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে না—হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে।

গুরিদাস বললো, 'ভূত ছাড়লো কিন্তু। যে যেখানে আছ—বসে থাক সব। ভগমানের নাম করো।'

অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না—তবু সবাই চেয়ে আছে ভয়ার্ত চোখে তুলসী যেখানে পড়ে গেছে। জলে কাদায় ভূলুণ্ঠিত মূর্চ্ছিত তার দেহ।

'আর ভয় নাই মণ্ডল।' 'গুরিদাস বললো, 'এবার সেরে উঠবে। আমি জ্ঞান ফিরিয়ে দিচ্ছি। তারপর ঘুমোতে দাও—যতক্ষণ ঘুমোয়।'

ভূত ছাড়ানো দেখার ভিড় ভেঙে গেল আস্তে আস্তে। গুনিন গুরিদাস মন্ত্র পড়ে আটঘাট বেঁধে চলে গেল বিদায় নিয়ে। তুলসী পড়ে

রইলো মরার মতো। সমস্ত স্নায়ু তার তন্ত্রমন্ত্রের বিকৃত এক সম্মোহন বিদ্যার তরঙ্গ বিক্ষোভে একেবারে চৈতন্যহীন। সারা রাত সে পড়ে রইলো ঝিম মেরে। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখলো—নতুন একটা রূঢ় পৃথিবী। সব কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। আলোর দিকে চেয়ে সে চোখ বুজলো। মাথাটা তখনও ঝিম-ঝিম করছে। একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন তার ওপর দিয়ে,—ভয়ের তরঙ্গ প্রবাহ। মনে করবার চেষ্টা করলো কিছু কিছু। সেই গুনিনের কর্কশ মুখটা, অন্ধকার ঘরের কোণ—তারপর ছোট একটু আলোক বিন্দুর মাঝখানে ভয়ানক একটা ভয়ের রাজ্য—ভূত। তারপর সব কিছু মুছে গিয়ে একটা মুখ মনে পড়ে যায়—সে মুখ ওস্তাদের। শূন্য চোখে সে তাকালো দূরের কুঁড়ে ঘরটার দিকে—যার বন্ধ দরজার তালাটা মর্চে পড়ে কালো হয়ে গেছে। সমস্ত চরটা ফাঁকা মনে হচ্ছে—ফাঁকা চোখের সামনের সমস্ত জগৎটা। বুকের ভেতর কি একটা পাষাণ-ভার ভেতর থেকে তার কণ্ঠটাকে সবলে চেপে ধরে। কান্না পায় তার। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। মুখে তীব্র একটা যন্ত্রণা চাপার ছায়াপাত হয়।

বুড়ী আনন্দি এই সময়ে এসে দাঁড়ালো সামনে।

তুলসীকে তীব্র পর্যবেক্ষণে দেখে নিল আপাদমস্তক। নরম গলায় বললো, 'কি রে মা, কষ্ট হচ্ছে খুব?'

তুলসী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো বুড়ীর মুখের দিকে। মুখে যাই থাক—বুড়ীর নরম গলাটা কাঁপছে তখন তুলসীর বুকের গভীরে। রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'বড় কষ্ট!'—বলে একটা ছোট্ট মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠলো তুলসী।

এর বেশী আর সে কিছু বললো না। বুড়ী আনন্দিও জিজ্ঞেস করলো না আর কিছু! স্বয়ং মণ্ডল, সারা চরের মানুষ—কেউ জানবে না তুলসীর সেই কষ্টের কথাটা। একটা চাপা-পড়া দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে

শুধু ভুতুড়ে একটা ব্যাপার হয়ে রয়ে গেল তুলসীর সে কষ্টের ইতিহাস।

দিন তিনেক পরে, গুনিন গুরিদাস এসে মণ্ডলের দেওয়া নতুন কাপড় গামছা পরে পুবচরের একটা বড় তেঁতুল গাছে বেঁধে দিয়ে গেল অপঘাতে মরা বাঘা-ভূত চন্দ্র ওস্তাদকে।

এ চরটা এত ফাঁকা আর কোনদিন লাগেনি তুলসীর। সকলের অজান্তে শুধু একটা ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল ঘরের এক কোণায় গিয়ে।

২০

হিয়ের কথা হিয়েতেই লুকানো থাকে, বাইরে তাকে ফুটিয়ে তোলবার, রাঙিয়ে তোলবার অবকাশ কোথায় এই চাষীর গাঁয়ে! পীরিত বা মন জানা-জানি এক আধটুক যে হয় না এর ওর তার জীবনে তা নয়। হয়। তা নিয়ে রসালো কানাঘুষাও চলে কিছু দিন। তারপর বাইরের পাঁচটা কথাও যেমন থিতিয়ে মরে যায়—মনের কথার দশাও হয় তেমনি। বড় যেটা হয়ে ওঠে—চিরকেলে কথা, সে হলো নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম। তার ওপর সময়টা তখন চাষ-আবাদের শেষ মরশুম। একদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি আর একদিকে গোরু মানুষে টানাটানি তখন উঠেছে চরমে। এর মাঝখানে কোথায় হারিয়ে যায় তুলসী, কোথায় হারিয়ে যায় তার হিয়ের কথা। কে আর মনে করে রাখে—কবে যেন কার সঙ্গে কার মন জানা-জানি হয়েছিল।

মাঠের জল কাদা ঘেঁটে সারা দিনের পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে ফিরে আসে মরদেরা, মেয়েরাও—ভূতের মতো। উদয়াস্ত পরিশ্রমের টানাপোড়েন। চাষীর গ্রাম—অন্ধকারে আলোও জ্বলে না বেশীক্ষণ। বর্ষা-ভেজা আদিম রাত্রি তার সমস্ত বন্যতা নিয়ে ঘনঘোর হয়ে আসে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে। ঝিল্লি আর অশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক। এই

আরণ্যক প্রকৃতির ভেতরে কটা আদিম অভ্যাসই শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিশ্রান্ত মেয়ে আর মরদদের দেহের ওপরে—ক্ষুধা মৈথুন আর নিদ্রা। এরই মধ্যে এরা বাঁচে—এরই মধ্যে কখন মরে যায়।

সেদিন কিন্তু শিউরে উঠে বসলো সবাই—অন্ধকারে ভয়ে চোখ মেলে তাকালো হা-হা করা জনহীন পুবচরের দিকে। অতি পরিচিত সেই বেহালার সকরুণ মুর্ছনা! বর্ষা-ভেজা রাত্রির বুক চিরে যেন এ চরের রহস্যময় করুণ সুর একটি আর্তনাদ করে উঠলো বহুদিন পরে, বহু দুঃখের ভেতরেও। কিন্তু অন্তর্ভেদি সে করুণ সুর আজ কারুর হৃদয় স্পর্শ করে না। বরং সবাই ভয় পেয়ে জেগে উঠে শুনতে লাগলো কান পেতে।

একটা বোবা জানোয়ার যেন মাথা কুটে কুটে আর্তনাদ ক'রে মরছে হা-হা করা জনহীন পুবচরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। তমসাবৃত বর্ষা-রাত্রির মাঝখানে সবটা মনে হয় যেন ভূতুড়ে কান্না। একটা মরা মানুষের বেহালার সুর গুমরে মরছে—ভয় পাবে বৈকি জ্যান্ত মানুষগুলো। সবে-ফসল-তোলা মাঠের একদার সে আনন্দ নেই এ চরে, মন নেই সুরের ছোঁয়ায় জেগে ওঠার, প্রাণ নেই সর্বরিক্ত জীবনকে অনুভব করার। সমস্ত মানবীয় চিহ্নলেশহীন ক্ষুধার্ত এক বন্য জীবন শুধু ঘিরে আছে আজ চরের মেয়ে পুরুষগুলিকে। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়েছে অনটন অর্ধাসনের কাল—দিনের পর দিন তা তীব্রই হয়ে চলে। আর আছে ভয় অপ্রাকৃতের। গুনিন এসে ভূত ছাড়িয়ে গেছে তুলসীর—আর সে ভূত হলো ওস্তাদ। যাকে না-কি বাঘে খেয়েছে সুন্দরবনে। এমন ঘন-ঘোর রাতে তারই বেহালার আর্তনাদ শুনে সকলে কণ্টকিত হয়ে উঠবে বৈকি।

বেহালাটা একভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বাজছেই। কাছের পড়শীরা কয়েকজন সাহসে ভর করে এলো মণ্ডলের বাড়ী।

'মণ্ডল !'

মণ্ডলও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসেছিল। কাশলো। বললে, 'এসো।'

'শুনছো ?'

'শুনছি তো !'

'মোদের ডর লেগে গেছে মণ্ডল। গুনিন কি না কি করে দিয়ে গেল!'

'ভয় নাই—মোদের চর থেকে বার ক'রে পুব চরের গাছে বেঁধে দিয়ে গেছে।' মণ্ডল বললো, 'তা না হলে মোরই ঘরের আনাচে কানাচে এতক্ষণে ওর বেহালা শুনতে পেতে।'

'কি কাণ্ড !'

'বাঘা ভূত ওই রকম হয়। সুন্দরবনে যারা কাঠ কাটতে যায় তাদের মুখে শুনেছি—ঠিক মানুষের মতো নাম ধরে ডাক দেয়। যদি সাড়া দিলে—বাস, গেলে তা হলে !'

ভয়ে কাঠ মেরে বসে রইলো সবাই।

তুলসী কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল উঠোনে অন্ধকারে—একা। হরি মণ্ডল ধমকে উঠলো, 'কোথায় চল্লি ?'

তুলসী থমকে দাঁড়ালো। সে শুধু বললো, 'অস্তাদের মতো বেহালা বাজছে কোথায়! অস্তাদ'—

'অস্তাদ !' মণ্ডল বললে মুখ ভেঙিয়ে, 'তার সঙ্গে যা তবে সেই যমের ঘর।'

কে বললো নরম গলায়, 'বাঘা ভূত ! ঘরে যাও মণ্ডলের বউ।'

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না তুলসী—ওস্তাদ মরে গেছে। কথাটা যেন বিশ্বাসই হয়নি 'তার কোনো দিন। অথচ তাকে কেন্দ্র করেই কত কাণ্ড ঘটে গেল, ওঝা এলো, ভূত ছাড়ালো—কত কি। খুব নিঃশব্দে চেপে চেপে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সে—তারপর ফিরে এলো ঘরে।

বেহালাটা কোথায় কোন অন্ধকারে বেজেই চলেছে তখনো।

সব চাপা পড়ে গিয়েছিল—আজ আবার সীমাহীন একটা দুঃখের সমুদ্র যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তুলসীর বুকের গভীরে। তারই শুধু ভয় করে না, তার প্রাণ মন কেঁদে ওঠে ওই ভূতুড়ে বেহালাটার মীড়ে মীড়ে। মানব-সত্তার চূড়ান্ত পরিচয় বোধ করি তার প্রেমে—সে প্রেমে ভয় নেই, আছে বেদনাবোধ, সহানুভূতি আর আত্মার জাগরণ। এ চরের ভয়ার্ত বুনো জীবনগুলির মাঝখানে—অনেকগুলি মেয়ে মরদের মাঝখানে যেন সে-ই শুধু উৎকণ্ঠিত উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো তার সমগ্র হৃদয়টাকে মেলে দিয়ে।

… ও নাগর, আমায় ঘরে রইতে দিলি না রে। …

দীন দাস গান ধরতো, ওস্তাদ ধরতো বেহালা। গুরু আর সাকরেদ তন্ময় হয়ে যেত। বেহালায় সেই সুরটাই বাজছে কোথায়—

… ঘরে রইতে দিলি না রে। …

কান্না পায় আজ তুলসীর। গেঁয়ো এই মেয়েটার ব্যর্থ স্বপ্ন, তার আশা কামনা যৌবনবেদনা—সমস্ত কিছু উদ্বেল হয়ে ওঠে অন্ধকার ঘরের এক কোণে। দুঃখের একটি করুণ মুহূর্তে তার সঙ্গে তার ব্যর্থ-জীবনের সহসা যেন মুখোমুখি পরিচয় হয়ে যায়। এই তার জীবন—এই তার ভাগ্য। …

সকালে কলিমদ্দি এলো পশ্চিম চরে। সবাই ঘিরে ধরলো তাকে। পুব চরের মানুষ সে—কাল রাতের ভূতুড়ে বেহালার কাণ্ডটা সবিস্তারে শুনতে চায় সবাই তার কাছ থেকে।

হরি মণ্ডল বললো, 'বাঘা ভূতের বেহালা কাল কেমন শুনলে হে কলিমদ্দি।'

কলিমদ্দি হেসে বললো, 'তোমাদের ওই গুণবিদ্যার মন্ত্রে আর বিশ্বাস

নাই মোর মণ্ডল কোথায় বাঘা ভূত কোথায় কি—কাল সাঁঝ পহরে অস্তাদ এসে হাজির।'

'অস্তাদ!'

'হ্যাঁ গো—অস্তাদ। লোকটা দেখি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সাঙাতের পোড়ো ভিটের কাছে। চারদিক হা-হা করছে—বুঝতে পারে না কিছু। তারপর আমি বললাম সব একে একে মোদের চরের মানুষের কপালের কথা।'

কে একজন তবু বললে, 'বাঘা ভূত অনেক ছল ছলায় হে কলিমদ্দি। পায়ের চেটো উল্টো দিকে আছে কি-না দেখেছিলে?'

'দেখেছি।' কলিমদ্দি হেসে বললো, 'লোকটা রাতভর ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে সারা চরময়—একটুনও ঘুমায়নি। এখন ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'তা হলে সে মরেনি?' বলে হরি মণ্ডল কি ভাবতে ভাবতে গম্ভীর হয়ে গেল।

'ধুৎ—সব বাজে কথা। তোমার গুনিন ওদিকে ভূত বেঁধে দিয়ে গেল গাছে।' বলে কলিমদ্দি হাসলো সবার মুখের দিকে চেয়ে।

তুলসী এসে শুনছিল—দাঁড়িয়ে ছিল মেয়ে মরদের ভিড়ের একপাশে। এই সময়ে চলে গেল সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার কম্প্র শব্দে কেমন যেন সচকিত হয়ে ওঠে হরি মণ্ডল। হঠাৎ মণ্ডলের মুখটাকে বড় কঠিন মনে হয়। কলিমদ্দির কথার জবাবে বললে, 'বাঘা ভূত অনেক রকম ছল জানে। কে জানে হয়তো আসল ভূত মুখি রাঁড়ীর ব্যাটার নাম করেই পালিয়েছে।'

'হবে।'

হয়ত তাই হবে—এই কথাটাই সকলের মনে ধরে। কিন্তু ওস্তাদ—হঠাৎ অস্তাদ আবার ফিরে এলো কেন এ চরে?

হরি মণ্ডল মুখ বেঁকিয়ে বললো, 'ও চলে এলো যে বড় সেই সব্বনাশী ছুঁড়িটাকে ছেড়ে ? সব তো জুটেছে গিয়ে সেইখেনে।—ওর সেই সাঙাৎ, মোনা, ভাকু দাস।'—

কলিমদ্দি বললো, 'কোথায় ছিল না ছিল, কেমন ক'রে জানবো মণ্ডল। বোবা মানুষ—মুখে যে রা নাই। তবে বোধ হয় এ চরের কারুর সঙ্গেই ওর দেখা হয়নি। হলে চরের খবর তো আগেই জানতো। বরং মোর কাছে সব শুনে কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।'

'উ সব শয়তানী।' হরি মণ্ডল বললো, 'সেই চামুণ্ডা ছুঁড়িটা পাঠিয়েছে ওকে—মোরা সব কেমন আছি দেখতে।'

সখীর কথা এসে পড়ে। হরি মণ্ডল বললো, 'তার সেই হাসির কথা মনে হলে মোর গা শিউরে উঠে এখনও। তখনই জানি, ও কুলে কালি দেবে। তারপর ওই ছোঁড়া—মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা, শালা বোবা শয়তান ! বাপ্‌রে, চরের বউ-ঝিরা সব যেন উদোম হয়ে উঠলো কদিন। এসেছে ফের ঘুরে—এখন ঘর সামলাও, বলে দিলম সবাইকে।'—

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনে গেল সবাই—জলজ্যান্ত চন্দ্র ওস্তাদ ফিরে এসেছে চরে।

'তবে যে গুনিন বলে গেল বাঘে খেয়েছে !' ভুষণার বউ বললো অবাক হয়ে। তার পর জিভে চুক্ চুক্ শব্দ ক'রে বললো আবার, 'আহা—বেচারী তুলসী !'

ভুষণা ধমকে দিল, 'চুপ। কে কোথায় শুনতে পাবে—বলবে যেয়ে মণ্ডলকে।'

'মণ্ডল কি বলে ?'

'বলে—ও কোনো ফন্দি এঁটে এসেছে। গাঁয়ের বউ-ঝিরা সব সাবধান।'

'মুখে আগুন! সামলাক এখন তার নিজের বউকে।' ভুষণার বউ ঝামটে উঠলো। তার পর নরম গলায় বললো, 'আহা গাঁয়ের লোক গাঁয়ে ফিরে এলো। ছিল কোথায় এতদিন গো?'

কেউ তা জানে না।

২১

এ চরে ফিরে এসেছিল সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে। তার বিক্ষুব্ধ মন তখন অবসাদে থিতিয়ে এসেছে। সমস্ত মন তার চাইছে তখন সহানুভূতি—প্রিয়জনের ছায়া।

এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে জনহীন শূন্য পুব চরের ভাঙা বাঁধের ওপরে। কোথায় গেল তার সাঙাতের ঘর—কোথায় সারি সারি কুঁড়েগুলো যেখানে একদিন গানের হর্‌রা উঠেছিল! হঠাৎ মনে হয়েছিল তার—পথ ভুলে সে বোধহয় আর কোন চরে এসে পড়েছে: সামনে থৈ থৈ করছে গাঙের দিকচিহ্নহীন জল-রেখা।

তারপর দেখা হয়েছিল কলিমদ্দির সঙ্গে। শুনেছিল বাতিল পুব চরের গোটা ইতিহাসটা। কে কোথায় চলে গেছে, নেই তার সাঙাৎ, নেই তুলসীও—নেই আরও অনেকগুলি প্রিয় মুখ। ভূতুড়ে ভিটেগুলো শুধু অতীতের কবরের মতো পড়ে আছে বুক চিতিয়ে এখানে ওখানে। নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছিল সে কলিমদ্দির। তার নিজের যে একটা ঘর আছে পশ্চিম চরে—সেখানে ফেরার কথা একবারও মনে হয়নি। হা-হা করা পুব চরের মাঠ আর জলার মতোই সমস্ত মন তার তখন ফাঁকা হয়ে গেছে।

কলিমদ্দি বলেছিল যেতে যেতে, 'নতুন ঘর হলো তোমার—এবার বিয়ে সাদি হবে, মোরা ভাবছি এই কথা। হঠাৎ যে তুমি কোথায় চলে গেলে একদিন!'—

চলে গেল—অশান্ত বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে চলে গিয়েছিল সে একদিন ; যে-মন মজেছিল সখীর যৌবন-ঝলকে ও জীবনশ্রীতে—সে মনকে ধরে রাখতে পারেনি শান্ত ভীরু আতুরের মতো তুলসী। গুরু দীনদাস বাপের তুল্য। তার মেয়ে হলো তার সাক্ষাৎ বোনের মতো। সে হবে তার কোলের বউ—ঘরের মেয়ে মানুষ, এ কোনদিনই ভাবতে পারেনি ওস্তাদ। মনে মনে গুরুর কাছে ক্ষমা চেয়ে পালিয়ে ছিল একদিন। দিন কয়েক এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে উঠে বসেছিল সুন্দরবনের খেয়া নৌকোয়। কে জানে হয়তো সখীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

দেখা হয়নি—কোন সন্ধানই সে পায়নি। কদিন ঘোরাঘুরি ক'রে হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল তার, যে অন্য লোকের সঙ্গে চলে যেতে পারে—তার পেছনে কেন ঘুরে মরছে সে ! রাগ হয়েছে—ঘেন্না হয়েছে নিজের ওপরে। তার অভিমানী সমস্ত পৌরুষ নিয়ে সে ভেবেছে—হেরে গেছে, মস্ত হার হয়ে গেছে তার।

তারপর দীর্ঘ দু-মাস উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরাফেরা—কাকদ্বীপ ডায়মণ্ড-হারবার গেঁওখালি—গঞ্জ থেকে গঞ্জ। যাত্রাগানের জন্যে এর অনেক জায়গাতেই গিয়েছে আগে—চেনা-পরিচয় আছে। সবাই খাতির-যত্ন করেছে—আর প্রাণ ভরে শুনেছে তার বেহালা। কিন্তু তার প্রাণ হু-হু করছে তখন—দু-চার দিনের বেশী টিকতে পারেনি কোথাও। এরই মাঝখানে হঠাৎ একদিন আটকে গিয়েছিল ডায়মণ্ডহারবারের এক সদরআলা ধনী মানুষের বাড়ীতে। বনেদী রায়চৌধুরী বাড়ী—গান-বাজনা জলসার প্রতি আছে সহজাত আকর্ষণ। এসেছিল ছুটিতে। পথের পাশ থেকে ওস্তাদকে কে একজন ধরে নিয়ে গিয়ে খাড়া করে দিয়েছিল আদিত্য চৌধুরীর সামনে।

আদিত্য চৌধুরী স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনেছিল তার বেহালা। অবাক হয়ে বলেছিল, 'কে তুমি !'

ওইখানকার একজন গোমস্তা বলেছিল, 'লোকটি কথা বলতে পারে না—বোবা।'

'বোবা!' আদিত্য চৌধুরী অবাক হয়েছিল: তাই কি লোকটা প্রাণ নিংড়ে কথা বলে—প্রাণ জেগে ওঠে, প্রাণ কাঁদে! মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, 'বাজাও তুমি—আবার বাজাও।'

যাত্রার দলের ঢঙে সেলাম দিয়ে ওস্তাদ আবার তুলে নিয়েছিল বেহালা। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছিলে আদিত্য চৌধুরী। বলেছিল, 'থাক তুমি এইখানে ওস্তাদ। আমার জীবনের বাকী ক'টা দিনের একজন সঙ্গীর দরকার ছিল হে—এত দিনে পেয়ে গেছি। আমার মেয়েদের ওই বাজনা শেখাও তুমি—থাক এইখানে।'

সেখানেই আটকে ছিল দীর্ঘদিন। তারপর আদিত্য চৌধুরী তোড়-জোড় করতে লাগলো কলকাতা যাওয়ার। ওস্তাদকে বলেছিল, 'আমাদের সঙ্গে তুমিও কলকাতায় চলো ওস্তাদ। এ তল্লাট তো জয় করেছ, এখন শহর জয় করবে চলো।'

যাত্রার দলের ঢঙে আবার একটা সেলাম বাজিয়ে ছিল ওস্তাদ।

আদিত্য চৌধুরী খুসি হয়ে বলেছিল, 'কলকাতার রসিক লোক অবাক হয়ে যাবে তোমার বেহালা শুনে—এ আমি বলে দিলাম ওস্তাদ। তুমি একটি প্রতিভা—কোথায় পড়েছিলে গ্রামে! তোমার নামডাক পসার, সম্মান—সব অপেক্ষা ক'রে আছে এখনও—চলো আমাদের সঙ্গে।'

এরপর সারা রাত ভেবে ভেবে নিজের মনকে ঠিক করেছে ওস্তাদ।

কোথায় সে শহর কলকাতা! নাকচরের পুব সীমান্ত থেকে সে কতদূর! দীর্ঘ দিন অপরিচিত মুখের ভিড়ে তখন ক্লান্তি এসেছে তার। অনেক মানুষ—অনেক মজলিশ জলসার ভিড়ে, পুবচরের কোন একটি হৃদয়গত ছোট্ট ঘটনার জন্যে তার এই উর্ধ্ববেগ ছোটাছুটি—সবটা তখন থিতিয়ে এসেছে অবসাদে। অনেকে পেয়েছে প্রশংসা—পেয়েছে সম্মান,

কিন্তু হৃদয়ের আশ্রয় কোথায়! সমস্তটা তার হঠাৎ অত্যন্ত রুক্ষ লেগেছে। মন ছুটে গেছে তখনি তার চরের মাটিতে—চেনা মুখগুলির মাঝখানে। বহু স্বপ্ন আর একটু ভালোবাসা, অসীম কামনা আর একটুকু শান্তির জন্যে মন তখন তার মাথা কুটে মরছে। আদিত্য চৌধুরীর কলকাতা রওয়ানা হওয়ার আগের দিন কারুকে না জানিয়ে বেহালাটা কাঁধে ঝুলিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছিল সে শেষ রাতের অন্ধকারে—চেপে বসেছিল খেয়া নৌকোয়।

··· 'হো ··· ই তেরপাখিয়া ··· তালপাটি ··· ই' ···

আবার সেই খেয়া নৌকোর জলতরঙ্গ মেশা ডাক। মনের মধ্যে হু-হু করে উঠেছিল পুবচর—পশ্চিম চর, নোনামাটির পরিচিত গন্ধ—আবাল্য চেনা মানুষগুলির কলকণ্ঠ—তাদের সপ্রেম শুভেচ্ছা। মনে পড়ে গেছলো—তার বেহালার সুরে সুরে আন্দোলিত দেহ-মন মানুষগুলিকে। কখনো প্রাণ খুলে হো-হো ক'রে কেঁদে উঠেছে—কখনো হর্‌রায় ফেটে পড়েছে। সহজ মানুষগুলির অতি সহজ জীবনাবেগের প্রকাশ। নেই গাম্ভীর্য, নেই রসিক আভিজাত্যের অতি সূক্ষ্ম আড়াল।··· সেলাম তোমায় সহর কলকাতা—সেলাম আদিত্য চৌধুরী : মনে মনে বলেছিল সে, যাওয়া তার হল না। কোথায় কোন অজ্ঞাতনামা চরের মানুষগুলি বুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। সাঙাৎ—সে চরের সবাই তার সাঙাৎ নফর মণ্ডল।

ঢেউয়ের দোলায় নৌকোটা দুলছে। মুখে লাগছে দক্ষিণ সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। অত্যন্ত আরামে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বুজেছিল সে—ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন; বড় শ্রান্ত সে—বড় ক্লান্ত।

এই ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে জনহীন, ফাটল ধরা বাতিল পুবচরের সীমানা বাঁধে। কোথায় গেল সেই চেনা মানুষগুলি? তার সাঙাৎ?

এ চরে যেন নতুন করে আবার জীবন সুরু করা।

পরের দিন ভোরে একটু দেরি করেই ঘুম ভাঙলো তার। প্রথম ঘুম-ভাঙা চোখে শূন্য চরটার দিকে চেয়ে মনে হলো তার—এ চরে ফিরে আসার অর্ধেক আনন্দ তার নষ্ট হয়ে গেছে। সাগ্রাৎ নফর নেই—নেই তার সে সঙ্গতের আড্ডাও।

তাকে ঘুম ভেঙে উঠতে দেখে পব্না ছুটে এলো। বললো, 'তোমার জন্যে বাপজান মোকে বসিয়ে রেখে গেছে অস্তাদ। পানি রেখেছি—মুখ হাত ধুতে ওঠো।'

ওস্তাদ ছেলেটাকে কোলের কাছে টেনে নিল। পরিত্যক্ত চরের একটি মাত্র কুঁড়ের কলকাকলী। ছেলেটাকে বড় আদর করতে ইচ্ছে হয় ওস্তাদের !

পব্না বললো, 'কাল থেকে তুমি একটিনও কথা বলনি কেন অস্তাদ ?'

ওস্তাদ ইঙ্গিতে বোঝালো, সে কথা বলতে পারে না।

'ধ্যাৎ।' পব্নার কথাটা বিশ্বাস হলো না। তারপর বললো, 'আচ্ছা একটু বেহালা বাজাও না অস্তাদ।'

ওস্তাদ ছেলেটার গাল টিপে দিল আদর করে।

'বাজাও অস্তাদ—মোর বড় ভালো লাগে।' পব্না ওস্তাদের হাত জড়িয়ে ধরলো।

হেসে বেহালাটা কাঁধে তুলে নিল ওস্তাদ—ছড় টানলো শিশু শ্রোতাটির দিকে চেয়ে। তার দিকে হাঁ-করে চেয়ে রইলো পব্না। অবাক হয়ে শুনতে লাগলো : বেহালাটা কিছু যেন বলছে। তার সেই অবাক কচি মুখটি, এ চরের ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ, ভেজা নোনা মাটির গন্ধ আর সর্বরিক্ত একটি বেদনা—সব জড়িয়ে একটি অনন্ত সুর যেন ভোরের ছায়াম্লান আলোকে বড় করুণ বড় মর্মস্পর্শী করে তুললো। সে অনন্ত

সুর এই বোবা মানুষটার গভীর হৃদয়ের বিক্ষুব্ধ বেদনার।

ওদিকে মাঠে তখন হরি মণ্ডল ভুরু কুঁচকে বললে, 'শুনছো হে?'

পাশের জমি থেকে নন্দ বললো, 'অস্তাদের বেহালা।'

হরি মণ্ডল খিস্তি করে উঠলো, 'তোর বেহালার নিকুচি করেছি। শালা মোদের শিরদাঁড়া বেঁকে ভেঙে গেল—হাজায় পচে খসে গেল হাত-পা। আর মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বেহালা বাজাচ্ছে এখন শোনো।'

এমন ভাবে গোটা জিনিসটাকে তুলে ধরে মণ্ডল যে ওই বেহালার ব্যাপারটা সত্যিই বড় বিসদৃশ লাগে। কেউ আর কোনো কথা বলে না।

হরি মণ্ডল বললো, 'তোমরা আবার বলো—উ হলো মোদের লোক। এই ছাখো মোদের লোক! দু-মাস সেই বিধবা ছুঁড়িটার সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে কাটিয়ে চরে ফিরে এলো—ফের এখানে আবার কার বউ-ঝি ধরে টান মারবে দ্যাখো।' কলিমদ্দি কাজ করছিল মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে—তার দিকে চেয়ে মণ্ডল বিদ্রূপ ক'রে বললে, 'কলিমদ্দি, সাবধান!'

কলিমদ্দি বিনীত ভাবে বললো, 'মোর ঘরে আর কে আছে মণ্ডল।'

'বেঁচে গেছ তুমি।' মণ্ডল বললো, 'কিন্তু তোমার ঘরে আড্ডা না বসে আবার দ্যাখো। মোদের পছিম চরে আমি থাকতে সাহস পাবে না কিছু করতে।'

সবাই চুপ—সবাই শুনছে শুধু। চাষের শেষ মরশুম—কাজের শেষ চূড়ান্ত ঠেলা। মুখ তুলে কথা কইবারও যেন সময় নেই। তবু শোনে সবাই কান পেতে—বোঝবার চেষ্টা করে হরি মণ্ডলের কথাগুলো।

হরি মণ্ডল গর-গর করে বললো আবার, 'মোদের লোক! মোরা জলে-কাদায় গোরু-মানুষে হিমসিম খেয়ে গেলাম আর মুখি রাঁড়ীর

ব্যাটা এখন এল বেহালা বাজাতে। আর ক'দিন পরে বর্ষাটা ছাড়লে চলে যাবে যাত্রার দলের সঙ্গে।' মণ্ডল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আর মোরা তখন চেয়ে বসে থাকবো বাঁধের দিকে—কখন কোটালের জোয়ার এসে মোদের ভাসিয়ে দিয়ে যাবে সব।'

ঠিক। সমস্ত কথাগুলি ঠিক। পাশাপাশি জমিতে কাজ করছে যারা, কান পেতে শুনছে সবাই। মণ্ডলের একটি কথাও তাদের ভুল মনে হয় না। একদিন যে ওস্তাদকে নিয়ে তারা মেতে উঠেছিল—তার জন্যে আজ মুখোমুখি বড় লজ্জা দিচ্ছে হরি মণ্ডল। তাদের রাগ হয়—আফশোষ হয়। ওস্তাদ আর তাদের কর্মক্লান্ত নিষ্ঠুর জীবন-ধারার মাঝখানে মস্ত বড় একটা ব্যবধান যেন এতদিনে চোখে পড়ে।

হরি মণ্ডল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'মোরা সুখেও মরি, দুখেও মরি হে। কিন্তন বেশ আছে মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা—চিন্তা ভাবনা নাই, মাঠে মাঠে গতরপাত করা নাই—দিব্যি আছে!'

দিব্যি আছে! সে মুহূর্তে মনে হয় সকলের—বেশ আছে ওস্তাদ। ভাবনামুক্ত দিব্যি এক জীবন। সেই মুহূর্তে সমস্ত লোকগুলোর বুকের গভীরে হঠাৎ একটা শ্রান্ত ক্লান্ত হিংসা মাথা ঠেলা দিয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময়ে উঁচু ঘেরি বাঁধের ওপরে এসে দাঁড়ালো ওস্তাদ—হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে আছে কলিমদ্দির লেড়কা পব্‌না।

হরি মণ্ডল কলিমদ্দির দিকে আড়চোখে চেয়ে বললো, 'শেখ কি ব্যাটাকে বেহালা শিখাবে নাকি হে?'

'কি যে বল মণ্ডল!' কলিমদ্দি খোঁচা খেয়ে রেগে ওঠে—রাগটা গিয়ে পড়ে ছেলের ওপরে।' খেঁকরে হাঁক দিল পব্‌নাকে, 'জলদি চলে আয় ইদিকে—দাঁড়িয়ে রইলি যে!'

কলিমদ্দির হুংকারে মুখ তুলে তাকায় সবাই। বাঁধের ওপর দেখতে পায় ওস্তাদকে। গায়ে লেবু রংয়ের একটা হাফ-সার্ট—তার ওপ র

উড়ুনি একখানি জড়ানো। কাঁধে বেহালার ঝোলাটা যেন নতুন, গাঢ় নীল রংয়ের। হাসছে সকলের দিকে চেয়ে। কিন্তু মাঠের লোকগুলির মুখে হাসি নেই। দুই চোখ ভরে তাদের বরং কেমন একটা তীক্ষ্ণ যাচাই-করা ভাব। সেই মুহূর্তে মাঠের জল-কাদা মাখা ভূতের মতো মানুষগুলির মনে হয়—ওস্তাদ কোনো দিনই তাদের লোক নয়।—ও লোকটা তাদের দুঃখের জীবনের জ্বালা কিছুই বোঝে না।

মাঠের লোকগুলোর হঠাৎ রূপান্তরিত কঠিন মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ওস্তাদের মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়। মনে হয় তার—এ একটা নতুন চরেই সে এসে পড়েছে যেন। গানে মেতে ওঠা সেই একটা চর কোথায় হারিয়ে ফুরিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে।

তবু সে ছুটে এসেছিল—অনেক দূর থেকে ছুটে এসেছিল শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে।...

পব্‌নার হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ নীচু করে ওস্তাদ একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে পা বাড়ালো নিজের কুঁড়ের দিকে।

২২

বুড়ি আনন্দি এক ঝুড়ি শাকপাতড়া লতা-পাতা নিয়ে যাচ্ছিল বকতে বকতে। বকে বকে কলের দু-পাশে ফেনা জমে গেছে। কাকে বকছিল বোঝা যাচ্ছিল না—হয়তো সে তার বুড়ো বয়সের ভাগ্য—এ চরের জীবন।

'খাও—গরু ছাগোলের মতো খাও এই শাক-পাতড়া, গেল তোমরা। খাটতে পারো না যখন বুড়া ডগর—এখন ভাত তো নাই তোমাদের! সে খাবে যারা খাটবে। ওরে, খেটে খেটে গতর দিয়েছি, যৈবনে বুড়িয়ে গেছি। হারামজাদী বউ বলে কি-না—ভাত কোথায়! হবে লো—তোরও হবে কপালে এই রকম। তখন ভাত দেবে না হুড়ো দেবে

মুখে তোর। .হারামজাদী—নিজে গিলছে কাঁসা কাঁসা ভাত। কি?
—না, চাষের কাজ করি।'

শুরু হয়েছে চাষীর ঘরে অনটন অর্ধাশনের কাল, শেষ হয়ে আসছে বছরের ফসল। পেট ভরছে শাক-পাতে। দুবেলা ভাত খায় শুধু খাটিয়ে মরদেরা। তাও পেট ভরে না—পেট বোঝাই করে আমানিতে।

বক বক করতে করতে আনন্দি ওস্তাদের ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালে, 'ও মা গো, মুখপোড়া সত্যিই তবে মরেনি—এসে ঘর খুলেছে দ্যাখো!'

এমন সময় চোখা চোখি হয়ে গেল ওস্তাদের সঙ্গে। আনন্দি হেসে বলে উঠলো, 'এলে দাদা? আমি ভেবে মরি—বলি এতদিন গেল কোথায়! এই চলেছি যমের অরুচি, শাক-পাতড়া নিয়ে। একমুঠো ভাতের সঙ্গে ঘেঁটেঘুঁটে খেয়ে বাঁচো বুড়া বয়সে। হারামজাদী বউ বলে কিনা—ভাত নাই, আমানিও নাই।'

আনন্দি চলে গেল বকতে বকতে।

এ গ্রাম নিরন্ন হয়ে এলো—আগামী তিন মাসের ক্ষুধা গুঁড়ি মেরে আসছে বর্ষা শেষের সঙ্গে সঙ্গে। সবে পুঁতে শেষ করা ধানের চারা-গাছ গুলিবড় হয়ে উঠবে—তার কেশর হবে, তারপর ধান। সুদীর্ঘ তিন মাস। ··· একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো ওস্তাদের। মনে পড়লো কলিমদ্দির কথা। কাল রাতে সে বলেছিল :

'মোর ঘরে থেকে গেলে—কিন্তু কি তোমাকে খেতে দিই অস্তাদ!' একটু ম্লান হেসে বলেছিল, 'চাট্টি মুড়ি চিড়াও নাই। থাকবে কোথা থেকে বলো – ধান থাকলে তো! সে মোর ফুরিয়ে গেল।'

ওস্তাদ নিজের পুঁটলির চিঁড়ে খুলে ভাগ ক'রে দিয়েছিল কলিমদ্দিকে আর তার ছেলে পবনাকে।

'কপাল ভালো মোর।' কলিমদ্দি সাগ্রহে চিঁড়ে চিবোতে চিবোতে

বলেছিল, 'না হলে বাপ ব্যাটায় দু-ঘটি জল খেয়ে পড়ে থাকতম অস্তাদ। সেই সকালে মণ্ডলের ঘরে যেয়ে পান্তা খেতম দু-জনে।'

মাঠের গম্ভীর বিরস মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওস্তাদের। সে জানে, সেখানেও আছে ওই কলিমদ্দির মতো দাঁত-চাপা ক্ষুধা। তাই হয়তো তার হাসির উত্তরে হাসেনি কেউ। সে ফিরে এসেছে এ চরের অনটনের দিনে।

আরও একটি মুখ মনে পড়ে তার—করুণ, লাজুক আর ভীরু। সে তুলসী। মাতব্বর চাষীর বউ সে এখন, হয়তো সুখেই আছে। তাকে মনে করে একটা শাড়ী কিনে এনেছে সে—তার গুরু-কন্যে। শাড়ীটা পুঁটলিতে বাঁধা আছে। ইচ্ছে হলো তখনি গিয়ে দিয়ে আসে তুলসীকে। অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল তার: মেয়েটাকে বড় দুঃখ দিয়েছে সে। একবার খুলে বার করলো শাড়ীটা। আবার পাট ক'রে বেঁধে রাখলো। থাক— একেবারে সন্ধ্যের পরে বেরোবে, যখন মাঠের লোকজন ফিরে আসবে ঘরে, খেয়ে দেয়ে সবাই শান্ত স্নিগ্ধ হবে। দাওয়ায় বসে প্রাণভরে বেহালা বাজিয়ে শোনাবে সে আজ। হিয়ের বোঝা হালকা করে দেবে।

কিন্তু হিয়ের বোঝা তার হিয়েতেই রয়ে গেল। তুলসীকে শাড়ী দিতে গিয়ে হরি মণ্ডলের খেপে ওঠা মূর্তির সামনে কাঠ মেরে দাঁড়িয়ে রইলো সে। কলিমদ্দি বসে আছে দাওয়ায় মুখ নীচু করে।

হরি মণ্ডল গালাগাল দিয়ে রুখে ছুটে এলো—যেন মেরে তাড়িয়ে দেবে। হাতের শাড়ীটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বললে, 'মোর বউকে তুই শাড়ী দিয়ে ভোলাবি আমি বেঁচে থাকতে! মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা তুই—জন্মের ঠিক নাই! খবদ্দার বলে দিচ্ছি—মোর সীমায় তুই পা দিবি না।'

ওস্তাদকে দেখে তুলসী ছুটে এসেছিল বাইরে – পালিয়ে গেছে ভয়ে। হরি মণ্ডল চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করতে লাগলো।

কলিমদ্দি বললো, 'তুমি চলে যাও অস্তাদ – আর দাঁড়িয়ে থেকনি।'

হরি মণ্ডল কলিমদ্দিকে সাক্ষী মেনে বললো, 'দ্যাখ—তুমিই দ্যাখ একবার কাণ্ডখানা শেখ। শাড়ী দিয়ে মোর বউকে ভোলাবে শালা। কেটে দু-খণ্ড করে ভাসিয়ে দেব না গাঙে!'

কলিমদ্দি মিন মিন করে বললো, 'যাক, উতো চলে গেল মণ্ডল। এবারে চেপে যাও।'

হরি মণ্ডলের আস্ফালন আরও বেড়ে গেল একলা কলিমদ্দিকে পেয়ে। বললো, 'ই সব .ব্যাপার চেপে যাব কি শেখ, আমি বিচার করবো। গ্রামের সব্বাইকে ডেকে বলবো—শালা জারজপুত্তুরের আস্পদ্দার কথা!'

কোন লজ্জা নেই, কোনো সংকোচ নেই। হরি মণ্ডল চেঁচাতে লাগলো তিনগুণ জোরে, 'আর দ্যাখ মোর ঘরের বউয়ের কাণ্ড—ছুটে এল ঢলাতে! তোর মাগীর জাত!'

মণ্ডলের গালাগাল চলতে লাগলো সমানে।

পায়ে পায়ে ওস্তাদ এসে দাঁড়ালো পশ্চিম চরের ভেড়ি বাঁধে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। সব কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে যেন তার জীবনে। যখন তার মন চাইছে শান্তি—বিশ্রাম, তখন জীবনের সমস্ত ছায়াঘেরা আশ্রয়গুলো যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে একে একে।

তাকালো সে ইতস্তত ছড়ানো কুঁড়েগুলির দিকে। সেখানে আলোর রেখা নেই একটিও। পরিশ্রান্ত মানুষগুলো এরই মধ্যে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে দম চেপে আছে ক্ষুধা, ক্লান্তি, অনটন। ওদিকে যেতে আর মন টানে না।

একটা অত্যন্ত ক্লান্ত মানুষের মতোই যেন নিজেকে কোনো রকমে টেনে নিয়ে চললো সে—পায়ে পায়ে, নিরুদ্দেশ ভাবে। ঠিক এই মুহূর্তে যেন জীবন-পথের সমস্ত নির্দিষ্ট গন্তব্য তার গোলমাল হয়ে গেছে। নিজেকে শুধালো : এখন কোথায় যায় সে?

কোথাও না। এগোতে লাগলো উঁচু ভেড়ি বাঁধ ধরে। মৌসুমীর শেষ। ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ। হঠাৎ মেঘ কেটে বাঁকা ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসির মতো এক ফালি চাঁদ ঝিলমিল ক'রে উঠেছে আকাশে। ধানের চারা গাছগুলি দোল খাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আদুরে শিশুর মতো। আর মাঠের কোথায় ছপ্ ছপ্ করে জল ভাঙার শব্দ হচ্ছে যেন। তার চোখ পড়লো সেই দিকে। একটি মেয়ে আর একটি জোয়ান মরদ তখনও কাজ করছে মাঠে ঝুঁকে ঝুঁকে। আর কেউ কোথাও নেই। এমন সময় আবির্ভাব হলো সেখানে তৃতীয় একটি মানুষের। বাঁধের ওপর থেকে লোকটা হেঁকে উঠলো :

'কে।'

সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে কর্মরত মেয়েটি আর মরদটি যেন চমকে উঠেই মাঠ থেকে ছুটলো বাঁধের কোলে কোলে। মেয়েলোকটা পেছনে পড়ে গেল কিছুটা। তৃতীয় লোকটি ক্রোধে আস্ফালনে করে জাপটে ধরলো গিয়ে মেয়েটাকে। তার সঙ্গের মরদটি তখন ছুটে এগিয়ে গেছে অনেকটা। মেয়েটার সঙ্গে ঝটাপটি লেগে গেল দেখতে দেখতে। তার সঙ্গের মরদটি ঘুরে এলো আবার ঝটাপটি লেগে গেছে যেখানে। তারপর হাতের কোদাল তুলে তার পাশা দিয়ে মারলো এক ঘা তৃতীয় লোকটার মাথায়। লোকটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো—তবু ছাড়ছে না মেয়েটাকে। আবার এক ঘা। এবার সব চুপ। কোদাল হাতে মরদটা ছুটে পালাচ্ছে, আর মেয়েটা যেন হঠাৎ পাথর—স্তব্ধ—হয়তো ভীত।

ওস্তাদ ছুটলো সেই দিকে।

মেয়েটা সচকিত—চঞ্চল। নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে—পারছে না। তার শাড়ীটা শক্ত মুঠোয় ধরা। শাড়ী খুলেই ছুটলো মেয়েটা এবার—উলঙ্গ। হঠাৎ পড়ে গেল ওস্তাদের সামনে। কিষ্ট দাসের বউ। তার আঠারো বছরের কর্মঠ পরিপূর্ণ দেহটা নিয়ে হঠাৎ যেন ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মুহূর্তের জন্য। তারপর ছুটে চলে গেল উল্টো দিকে বুনো জানোয়ারের মতো।

বাঁধের ওপরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে তখন কিষ্ট দাসের দাদা রাখাল। কপাল ফেটে রক্ত ছুটছে ফিন্‌কি দিয়ে—রক্ত ও কাদায় মাখামাখি হয়ে সবটা যেন মনে হচ্ছে থেঁৎলে গেছে। তার এক হাতের শক্ত মুঠোয় দু-তিন পাক জড়ানো কিষ্টদাসের বউয়ের শাড়ী।

ওস্তাদ জলা থেকে আঁজলা আঁজলা জল এনে দিতে লাগলো রাখালের মাথায় কপালে। এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালো কলিমদ্দি। রাখালের বীভৎস মুখটার দিকে চেয়ে আঁৎকে উঠলো সে:

'এ-কি হলো অস্তাদ! কে করলো?'

ওস্তাদ শুধু পাশের জলাটা দেখিয়ে দিল।

কিছুই বুঝলো না কলিমদ্দি। ওস্তাদের মতো সেও আঁজলা আঁজলা জল এনে দিতে লাগলো রাখালের ফাটা চৌচির চাঁদি আর কপালে। সমানে রক্ত বের হচ্ছে। ওস্তাদ চেপে ধরলো হাতে। বেশ কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা খেয়ে খেয়ে রাখালের চেতনা ফিরে এলো যেন মুহূর্ত কয়েকের জন্যে।

কলিমদ্দি তার মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে অমন করলো রাখাল?'

'ভাই। কিষ্ট।'

'কেন?'

'জমির সীমানা—ঘুঁটি,' দম নিয়ে রাখাল মিন মিন করে বললো, 'ঘুঁটি নেড়ে দিল—সে আর তার বউ।'

'বুঝেছি।'

'দু-হাত জমি ··· মোর জমি থেকে দু-হাত জমি।' দম নিয়ে বললো, 'জমি চুরি।'

'বুঝেছি।' কলিমদ্দি তাকে ধরে বসালো। বললো, 'চলো ঘরে পৌঁছে দিই। যেতে পারবে?'

রাখাল চোখ বুজে বললো, 'চল।'

কিন্তু তাকে টেনে তুলতে সে টলে পড়লো। মাথাটা ঝুলে পড়েছে এক দিকে।

কলিমদ্দি ডাকলো, 'রাখাল!'

কোনো সাড়া নেই। আবার মূর্চ্ছা গেছে।

ওস্তাদ ছুটে গেল আবার আঁজলা ভরে জল আনতে। রক্ত ঝরছে সমানে।

কলিমদ্দি বললো, 'ওকে ঘরে পৌঁছে দিই চলো অস্তাদ। এখানে অমন করে কত জল দেবে। কাঁধে করে নিয়ে যাই চলো।'

দু-জনে ধরাধরি ক'রে কাঁধে তুললো। চললো নিঃশব্দে।

মাঝখানে আবার চেতনা ফিরে এল রাখালের, মিন মিন করে বললো, 'মোর ভাগের দেড় কাঠা।'

কলিমদ্দি বললো, 'বুঝেছি। এখন চুপ কর।'

'সাক্ষী' ···

'হ্যাঁ, মোরা সাক্ষী।' কলিমদ্দি বললো, 'কিষ্টর বউয়ের শাড়ীও তো কেড়ে রেখেছ। সে-সব হবে কাল। ভাইয়ে ভাইয়ে কি তোমাদের কাণ্ড! এই সেদিন ভাগ হলে—জমি ভাগ করলে দেড় কাঠা করে—সীমানা-ঘুঁটি দিলে, এরই মধ্যে গোলমাল বেধে গেল! খুব দরদ হচ্চে?'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বোধ হয় আবার মূর্চ্ছা গেছে। রক্ত ঝরছে ওস্তাদের কাঁধ বেয়ে—পিঠে।

কলিমদ্দি ডাকলো, 'রাখাল হে!'

কোনো সাড়া নেই।

কলিমদ্দি বললো, 'খুব জবর জখম মনে হচ্ছে অস্তাদ।'

ওস্তাদ শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললো, 'অঁ।'

কিছুটা পথ আসতে আসতে রাখাল আবার বলে উঠলো ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে, 'মোর দেড় কাঠা!'—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

'হ্যাঁ গো, তোমার দেড় কাঠা।' কলিমদ্দি বললো, 'এখন চুপ করো।'

বাকী পথটুকু আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না রাখালের।

ঘরের দাওয়ায় গিয়ে যখন রাখালকে নামালো কাঁধ থেকে তখন সে শক্ত হয়ে গেছে। হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো রাখালের মা বউ মেয়ে। লম্ফের ম্লান আলোয় দেখা গেল—শুধু কপাল নয়, চাঁদির অর্ধেকটা ফেটে ছেতরে গেছে।

কান্না গোলমাল হৈ-হল্লা অভিসম্পাত—সবটা মিলে পশ্চিম চর যেন জেগে উঠলো অন্ধকারে। হরি মণ্ডল এলো, চৌকিদার এলো। ডাকা হলো কিষ্টকে আর তার বউকে। রাখালের কাছ থেকে কলিমদ্দি যতোটুকু শুনেছে তাই বললে সে সকলের সামনে।

কিন্তু কলিমদ্দির সব কথা উল্টে দিয়ে কিষ্ট দাস বললো, 'সব মিছা কথা। ও মোর বউকে চেপে ধরলো। আমি যেয়ে দেখলম—বউকে মোর চিৎ করে ফেলেছে বাঁধের উপরে। শুধাও অস্তাদকে। একেবারে উলঙ্গ করে ফেলেছে। দেখে মোর মাথায় খুন চেপে গেল।'

প্রধান সাক্ষী বোবা, অতএব বরবাদ। কিষ্ট চেঁচাতে লাগলো সমানে।

হরি মণ্ডল বললো, 'তাই তুই মেরে ফেলবি একেবারে লোকটাকে?'

'বিচার কর মণ্ডল—মোর পরিবারের উপরে অত্যাচার !' কিষ্ট দাস বললো, 'আমি মরদ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো ? চিরকাল ওর স্বভাব চরিত্ত খারাপ—এতো তুমি জান না মণ্ডল।'

চৌকিদার গম্ভীর গলায় বললো, 'থানায় যেতে হবে।'

'চল থানায়।' কিষ্ট দাস আবার বললো, 'মোর বউয়ের ওপর অত্যাচার করলো। কি করবো ! মোর খুন চেপে গেল।'

বিচার সালিশের পেছনে একটা নিরবচ্ছিন্ন কান্নার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে রাতের অন্ধকারে। সে কান্না পেছনে ফেলে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দু-জন—কলিমদ্দি আর ওস্তাদ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মিন মিন করছে মেঘাবৃত জ্যোৎস্না। চরের আকাশ আর মাটি যেন দম চেপে চেয়ে আছে একভাবে অনাদ্যন্ত কাল : এই এখানকার জীবন ! এতটুকু সাড়া নেই কোথাও। ব্যাঙের ঘর্ঘর আর ঝিঁঝির ঝর্ঝর—তার অবিশ্রান্ত শব্দটুকুও যেন এখানকার মুখ-গোমড়া প্রকৃতিরই একটা অংশ। কান্নার বোবা তরঙ্গ একটা শুধু জীবনের একমাত্র চিহ্নের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে—মৃত্তিকায়—জলে—আকাশে। রাখালের বউটা কাঁদছে বোধ হয়।

অনেকক্ষণ পরে কলিমদ্দি কথা কইলো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'মোর লেড়কাটার আবার আজ থেকে বেদম জ্বর অস্তাদ।'

ভারী চোখ তুলে ওস্তাদ তাকালো কলিমদ্দির দিকে। কলিমদ্দি আর কোনো কথা বললো না। হেঁটে চললো। তারপর এক সময়ে হেসে উঠলো একটু। আত্মগত ভাবে রাখালের প্রলাপের পুনরুক্তি করলো, 'মোর দেড় কাঠা !' ...

ওস্তাদ তাকিয়ে আছে আর একদিকে—বোধ হয় কলিমদ্দির কথা তার কানে গেল না। কলিমদ্দি ওস্তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করলো—দূরে

বুক চিতিয়ে আছে নফরের ভিটে—সেই দিকে চেয়ে আছে ওস্তাদ অপলকে।

কলিমদ্দি বলে উঠলো, 'তোমার সাঙাতের ভিটে—তোমার সঙ্গতের আখড়া। মনে পড়ে ?'

কলিমদ্দির কথা শোনায় যেন ঠাট্টার মতো। ওস্তাদ তার গভীর ভারী চোখে চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। সঙ্গতের আখড়া কি এ চরে বসেছিল কোনদিন ? মানুষের সদ্য জেগে ওঠা প্রাণগুলিতে লেগেছিল সুরলোকের হিন্দোল ? আজ তা বিশ্বাস হয় না। এখনও এ চরে মানুষ-জন আছে—তবু কেমন একটা বন্য অনাত্মীয়তা যেন খাঁ-খাঁ করছে চর জুড়ে। রাখালের অপঘাত—ক্ষুধা—অপমৃত্যু—আর দেড় কাঠার দু-হাত নিয়ে হানাহানি। রাখালের বউয়ের মড়া-কান্না এক মাত্র পরম সত্যের মতো হাওয়ায় কাঁপছে থর থর ক'রে।

এক দৃষ্টে কি দেখছে ওস্তাদ কি জানি—কলিমদ্দি তার মানে বোঝে না। সে কি অতীত ? স্বপ্ন ? ভাবীকাল ? কে জানে ! কলিমদ্দি জানলো না—আস্তে আস্তে কেমন ক'রে ওস্তাদের বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে উঠছে। বুকের একান্ত গভীরে অত্যন্ত গোপনে হয়তো জন্ম হচ্ছে সুরের—এ চরের ক্ষুব্ধ আত্মার। ঠোঁট নড়ছে, আঙুল কাঁপছে বোবা লোকটার, যেন কিছু বলবে সে। হঠাৎ কথা কয়ে উঠবে—অত্যন্ত নির্মম আর করুণ। হ্যাঁ—করুণই।…

সখী থাকলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতো, 'না না—সারা জীবন মোকে কাঁদতে হবে কেন অস্তাদ !' বলে একদিন কিন্তু সে নিজেই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল না ?—মনে পড়ছে। মনে মনে বললে সে : অনেক কথা মনে পড়ছে ভাই কলিমদ্দি—অনেক কথা।…

বড় একা লাগছে ওস্তাদের। কোথায় আসতে গিয়ে যেন কোথায় এসে পড়লো সে !—

২৩

কিষ্ট দাসের বিচার ঝুলতে লাগলো পুলিসের হাতে—এদিকে শেষ হয়ে গেল ওস্তাদের বিচার। গ্রামের সবাই এসে জড়ো হলো একদিন হরি মণ্ডলের দাওয়ায়। ওস্তাদকে আসতে হলো—ভিড়ের সামনে বসে রইলো মুখ নীচু করে।

হরি মণ্ডলের অভিযোগ খুব সোজা-সাপটা : তার বউকে শাড়ী ঘুষ দিতে এসেছিল ওস্তাদ। সাক্ষী কলিমদ্দি।

কলিমদ্দি কি বলতে যাচ্ছিল—হরি মণ্ডল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'এ চরের আর একটা বিধবা বউকে নিয়ে ঢলাঢলির খবর জানো সব তোমরা—তাকে নিয়ে কোথায় চলে গেল ক'মাস। এদিকে অনাথা হয়ে গেল দীন দাসের ঝি—কেউ ছিল না তার মুখের দিকে চাইবার। আমি তাকে আনলাম মোর ঘরে। এখন ও এসে আবার তার সঙ্গে কি কাণ্ড আরম্ভ করে দিল ছাখ। একে আবার বলো তোমরা—আমাদের লোক! এই লোকের ঘর করে দিয়েছিলে তোমরা মোদের চরে!'

কাজটা যে ভালো হয়নি, আজ যেন বুঝতে পারছে সবাই—বিশেষ করে ছোকরারা। তারা মুখ নীচু ক'রে বসে রইলো। মণ্ডলের অভিযোগের জবাব কিছু নেই।

হরি মণ্ডল ছোকরাদের আবার একটু তোয়াক্ক ক'রে বললো, 'হ্যাঁ—তোমরা ওর ঢের করেছিলে, এ মানতেই হবে। মাথায় ক'রে রেখেছিলে, ঘর করে দিলে, বিয়ে-সাদি দিতে চাইলে—কিন্তু ও তখন পালালো। আজ দ্যাখ, কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে এসে ঘরের বউ-ঝির সঙ্গে ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিল। বেশ তো, অতই যদি তোদের বালক কালের পীরিত তো তখন বিয়ে-সাদি করলেনি কেন বল?'

কি বলবে বোবা লোকটা? তবু সে 'অঁ—অঁ' করে উঠলো। কিছু বলতে চায়। গুরু তার বাপের মতো, গুরুকন্তে তুলসী যে তার বোন,

তাকে বিয়ে-সাদি করার চিন্তাও তার কোনোদিন ছিল না।—এ কথাটা বোঝায় কেমন ক'রে সে!

তার বোবা গোঙানী চাপা দিয়ে হরি মণ্ডল বললো, 'কি বলতে চায় ও? আমি কি মিছা কথা বলছি, বল তোমরা সব, বল একটা কথা মোর মিছা!'

সভা সুদ্ধ 'না না' করে উঠলো।

'তবে?' হরি মণ্ডল বললো, 'ওর হলো রক্তের দোষ—জম্মের দোষ। মুখি রাঁড়ীর কাণ্ডকারখানা জানতে তোমরা সবাই।'

মায়ের প্রসঙ্গ উঠতে ওস্তাদ আর বসে থাকতে পারলো না—উঠে দাঁড়ালো। সভার সামনে মাথা নুইয়ে নাক কান মলে চলে গেল।

হরি মণ্ডল চেঁচিয়ে বললো, 'এখন বল, এমন লোককে এক-ঘরে করা উচিৎ কি না।'

একটি ছোকরা বলে উঠলো, 'যা হয় তুমি কর মণ্ডল। আর বসতে পারছি না। মাঠে সারাদিন গতর খাটিয়ে এসে আর ই সব শালা ভালো লাগে না। তাড়াতাড়ি শেষ কর।'

হরি মণ্ডল খুব নরম গলায় বললো, 'ই সব কার ভালো লাগে বল দেখি। তোমরা মোর ব্যাটার মতো, তোমাদের ভাল মন্দ মোর বুকেই লাগে। বউ-ঝি নিয়ে ঘর করি সবাই, পেটের চিন্তায় গতর পাত করি—ঘরে এসে শান্তি চাই। মোদের এ দুঃখের কথা ও কি বুঝবে বলো। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় দিব্যি আর পরের বউ-ঝি ধরে টানাটানি করে। ওর জন্যে তোমরা কি কম করেছ! বাপরে!'—

বুড়ো ভৈরব দাস ছড়া কেটে উঠলো, 'চোরা না শুনে ধম্মের কাহিনী।'

'এক ঘরে ক'রে দাও—বাস।'

সকলের এক মত।

মাঠের পরিশ্রান্ত লোকগুলোর চোখ ঢুলে আসছে ঘুমে—হাই উঠছে এখানে ওখানে, বিরক্ত হয়ে উঠছে সবাই।

এক-ঘরে করাই ঠিক হয়ে গেল। ওস্তাদের সঙ্গে কোনো সামাজিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কও রাখবে না কেউ।

কলিমদ্দির মুখে বিচারের রায় শুনলো ওস্তাদ। শুনে ম্লান একটু হাসলো শুধু।

কলিমদ্দি বললো, 'তোমার হইয়ে। বর্ষা তো শেষ হয়ে গেল—চরেই তো থাকবে না তুমি! ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যাত্রার দলের সঙ্গে।'

ওস্তাদ বসে রইলো চুপ ক'রে। কেমন ক'রে বোঝাবে সে কলিমদ্দিকে—এই চর, এই চরের মানুষগুলিকে লক্ষ্য করেই ছুটে এসেছিল সে অনেক দূর থেকে, অনেক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে! তার বোবা মুখে একটা মার খাওয়া অসহায়তা ফুটে উঠেছিল শুধু—যেটুকু বুঝতে পেরেছিল হয়তো কলিমদ্দি। ওস্তাদ বসেছিল পুবচরের ভাঙা বাঁধে। কলিমদ্দি তাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল নিজের ভাঙা কুঁড়েতে। বলেছিল, 'এক-ঘরে করেছে সবাই, করুক—তুমি চলো মোর ঘরে। মোর সমাজ নাই সংসার নাই অস্তাদ—মোর সব খোলা। চলো তুমি পুবচরের লোক পুবচরে। বেহালা শোনাবে মোর লেড়্কাকে।'

শেষ পর্যন্ত পব্‌নাই হয়ে উঠলো যেন ওস্তাদের একমাত্র সঙ্গী—বেহালার শ্রোতা, সমঝদার। কলিমদ্দির চাষের কাজ শেষ হয়নি তখনও—সারা দিন পড়ে থাকে বাতিল পুবচরের জলায়। পব্‌নার জ্বর চলেছে এক ভাবে। তাকে দেখে ওস্তাদ। তার বুভুক্ষিত হৃদয় চরের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে যেন আঁকড়ে

ধরেছে এই রুগ্ন মুসলমান বাচ্চাটাকে। বিচারের পর পশ্চিম চরের সবাই এড়িয়ে চলে ওস্তাদকে। শেষ পর্যন্ত তার একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে উঠলো পুবচরের কলিমদ্দির ঘর।

ব্যাপারটা চোখ এড়ালো না মাতব্বর হরি মণ্ডলের। একদিন এসে দাঁড়ালো সে কলিমদ্দির ক্ষেতের পাশে। পেছনে জোঁকের মতো বুড়ো ভৈরব দাস। কলিমদ্দি ওদের দেখে কাজ ছেড়ে উঠে এলো মাঠ থেকে।

হরি মণ্ডল বললো, 'এটা কি ভালো হচ্ছে শেখ?'

'কোনটা মণ্ডল?' কলিমদ্দি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো

হরি মণ্ডল বললো, 'চরের সবাই যাকে এক-ঘরে করলো সে তোমার ঘরে এসে ওঠ-বোস করে!'

'বুঝেছি মণ্ডল।' কলিমদ্দি একটু থেমে বললো, 'মোর লেড়কার ঘুরঘুট্টি জ্বর মণ্ডল। ইদিকে আবাদের কাজ মোর এখনও শেষ হয় নি—মাঠে পড়ে থাকি সারাদিন। অস্তাদ না দেখলে কি যে হতো মোর লেড়কার!'

ভৈরব দাস ছড়া কেটে বললো, 'রাখে হরি মারে কে।'

'তা ঠিক।' কলিমদ্দি বললো, 'কিন্তু আমি থাকি সারাদিন মাঠে। অস্তাদ মোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—মোর লেড়কাটাকেও বাঁচিয়েছে। না হলে হয়তো পব্‌না পানি-পানি ক'রে মরে যেত মণ্ডল, মুখে একটু পানি পড়তো নি।'

'হুঁ।' হরি মণ্ডল মুখ ভার করে বললো, 'অস্তাদই তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—আর মোরা তোমাকে মেরে ফেলেছি, এই তোমার কথা!'

'আমি তা তো বলি নাই মণ্ডল।'

হরি মণ্ডল বললো, 'একটা সত্যি কথা বল তো শেখ।—অস্তাদ তোমাকে কত টাকা ঘুষ দিয়েছে? শুনলাম তুমি ধান কিনেছ, তোমার ব্যাটার ওষুধ কিনেছ!'

'সাচ বাৎ বলবো মণ্ডল। একবেলা বাপ-বেটায় তোমার ওখানে খেতম—আর একবেলা শুধু জল খেয়ে পড়ে থাকতম। অস্তাদ তাই দেখে টাকা দিল ধান কিনতে, মোর লেড়কার ওষুধের জন্যে ভি টাকা দিল। একে ঘুষ বলতে হয় বলো মণ্ডল।'

'ওকেই বলে ঘুষ। চরের সবাই যখন তাকে বন্দ করেছে তখন তোমাকে সে টাকা দিয়ে কিনে নিল।' হরি মণ্ডল বললো, 'আর একটা কথা—অস্তাদ তোমার ঘরে ভাত খায়?'

কলিমদ্দি বললো, 'হ্ তোমাকে কে বাজে কথা বলেছে মণ্ডল। ও নিজের ঘরে রেঁধে খায়—মোর ঘরে খাবে কেন?'

হরি মণ্ডল মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'কাজটা কিন্তু ভালো হলো না শেখ।'

'কোনটা মণ্ডল?'

'চরের সবাই যাকে বন্দ করেছে তার সঙ্গে ওঠ-বোস করা।'

'আমি তো তোমার পছিম চরের বার মণ্ডল—একা মুখ গুঁজে পড়ে আছি পুবচরে।'—

হরি মণ্ডল তবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'সকলের সঙ্গে এ তোমার নেমখারামী হলো।'

এই কথায় হঠাৎ এই হৃতসর্বস্ব নিরীহ মুসলমান লোকটার কোটরাগত দৃষ্টি ঝকমক করে ওঠে যেন। ঠোঁট কামড়ে বললো, 'ওই কথাটি বলোনি মণ্ডল।' একটু দম নিয়ে আবার বললো, 'নিমকহারাম! যে মোকে, মোর ব্যাটাকে বাঁচালো—তোমার কথায় তার সঙ্গে নিমকহারামী করবো!'

'আমিও তোমাকে লাঙল বলদ দিয়েছিলাম শেখ।'

'তেমনি আমিও তোমার চাষ-আবাদ করে দিয়েছি মণ্ডল—যেমন কথা ছিল!' সভার মাঝখানে হরি মণ্ডলের মুখে মুখে যে কথাটা বলতে

পারেনি বলে, ক্ষোভ ছিল তার—থম্‌কে গেছলো হরি মণ্ডলের ধমকে, সেই কথাটা বলে ফেললে সে আজ।

'জানি তুমি এই রকম বলবে। এই জন্যেই বলছিলাম নেমক-হারাম। ও তোমাদের জাতের স্বভাব।'

ভৈরব দাস চট করে ছড়া কেটে উঠলো ফের :

'কটা-চক্ষু, জারজ পুত্তুর, বেঁটে মুসলমান।
ঘর-জামাইয়া, পোষ্যপুত্তুর—এ পাঁচ শালা সমান।'

হরি মণ্ডল বললো, 'যা বলেছ। চলো হে।'— যাওয়ার সময় শুধু বলতে বলতে গেল, 'ভালো হলো না শেখ—ভালো করলেনি কামটা। বুঝবে পরে।'

কলিমদ্দি চেয়ে রইলো তীব্র চোখে। 'নিরীহ লোকটাকে হঠাৎ অত্যন্ত বেপরোয়া দেখায়। দুসাঃহসী—উদ্ধত। বিড় বিড় করে বললো, 'মোর লেড়কাকে বাঁচিয়ে দিল—বাপের মতো। নিমকহারাম!'

জাহান্নমে যাক।—সে চরের বাইরের লোক, বাতিল চরের উটকো চাষী। হরি মণ্ডলের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কাজে মন দিল সে। পশ্চিম চরের সমস্ত চাষীর আবাদের কাজ প্রায় শেষ। শুধু সেই পড়ে আছে এই ফাটা বাতিল চরের আবাদ নিয়ে। একটু একটু ক'রে অনেকখানি আবাদ করেছে সে—অল্পই আর বাকী, বড় জোর আর সাত দিনের কাজ। ধানের চারাগুলি পুঁততে পুঁততে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো কলিমদ্দি। সে জানে না, কি তার ভাগ্যে আছে। হয়তো সোনা ফলবে—অথবা হয়তো আগামী ষাঁড়াষাঁড়ীর কোটালে সর্বনাশী গাঙের ধস চড়-চড় ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে তার আবাদ, তার পরিশ্রম, তার স্বপ্ন।

তবু স্বপ্নই দেখে কলিমদ্দি। ধানের চারাগুলো পুঁততে পুঁততে হঠাৎ অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থাকে তার বহু দুঃখে আবাদ করা সবুজ

ধানবনের দিকে—নেশার মতো ঝিমোনি আসে স্বপ্নের। বয়সও হলো তার, বহু দুঃখ দারিদ্র্য আর আঘাত তাকে আরও বুড়ো করে দিয়েছে—তার জীবনের ভোগ আর আনন্দ শেষ হয়ে গেছে। তবু সে স্বপ্ন দেখে—জনকের মতো—বংশধরের জীবনে, তার লেড়কার জরু গোরু জমি ঘর—নিশ্চিন্ত নির্ভরের গৃহকোণ। তার সে প্রবল উদগ্র স্বপ্নের কাছে সর্বনাশা প্রকৃতিরও ধ্বংস-মূর্তি যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন লোকটা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বাতিল পুবচরের একটা অংশ সবুজ ক'রে তোলে।

সেই আবাদের কাজ তার একদিন শেষ হয়ে গেল। খুশি মনে ঘরে ফিরলো। ওস্তাদকে বললে, 'শেষ করে এলম গো অস্তাদ—এবার নসিব ঠুকে বসে থাকি।'

পব্‌নাও সেরে উঠেছে। বললো, 'তামুক খাবি বাপজান ?'

'খাবো—সাজ।' কলিমদ্দি বসলো ওস্তাদের সামনে। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল তার বেহালাটার কথা। বললে, 'তুমি তো আর বেহালা বাজাও না অস্তাদ ?'

ওস্তাদ শুধু একটু ম্লান মুখে হাসলো।

কলিমদ্দি বললো, 'মনে কষ্ট পেয়েছ—বুঝি। না-হক এত সব কাণ্ড বাধালো ওই মণ্ডল। যাক, এক-ঘরে করে তো ভারী ক্ষেতি করবে তোমার। দিন তোমারও কাটছে, ওদেরও কাটছে। তা বলে বেহালা বাজাবেনি তুমি কেন ? প্রাণ ভরে আজ একটু বাজাও অস্তাদ—শুনি।'

পব্‌না উৎসাহিত হয়ে বললো, 'বাজাও অস্তাদ।'

'ভাখ, মোর লেড়কাও বলছে।' কলিমদ্দি হেসে বললো, 'খুব জোরে জোরে বাজাও—যাতে পছিম চর শুনতে পায়।'

কৌতুক ক'রে বললো কলিমদ্দি। লোকটা আবাদ শেষ ক'রে যেন ফেটে পড়ছে খুশিতে।

বেশ কয়েকদিন বেহালায় হাত দেয়নি ওস্তাদ—মন আর উৎসাহ কোনোটাই ছিল না। বোবা লোকটা তার নিজের মনের গভীরে যুদ্ধ করেছে ক্রমাগত কদিন ধরে। যে লোকগুলো তাকে একই সঙ্গে দিল গৌরব আর অপমান—সে আঘাত যেন সে সামলাতে পারছিল না। মনে মনেই ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। সে যুদ্ধের ক্লান্তির ছাপ পড়েছে তার মুখে—চোখে—হাসিতে। কলিমদ্দির অনুরোধে আজ আবার সে বেহালা তুলে নিল কাঁধে।

রাত হয়েছে।

তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলো তুলসী। বহু দিন পরে বেহালাটা বেজে উঠেছে আবার। শূন্য হাওয়ায় গোঙিয়ে মরছে বহু দিনের সেই পরিচিত সুরটা :

ঘরে রইতে দিলি না রে ...

সুরের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অতীত যেন কাঁপতে থাকে—সেই হারানো পুবচর, ছোট কুঁড়েটুকু, তার বাবা, ওস্তাদ!

আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসলো সে। হরি মণ্ডল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিছানা থেকে উঠে দাওয়ায় বেরিয়ে এলো তুলসী। তাকালো। অন্ধকারে পুবচর তো দেখা যায় না!

এমন সময় কড়া মুঠোর থাবায় পেছন থেকে কে ধরলো তার চুলের ঝুঁটি।

'অ মা গো!'—

পেছনে হরি মণ্ডল। চুলের মুঠি ধরে ধাঁই করে পাছায় মারলো এক লাথি।

'বেহালায় ডাক দিয়েছে নাগর! হারামজাদী!'

ককাতে লাগলো তুলসী—ছটফট করতে লাগলো মাটিতে পড়ে।

'যাবি কোথায়—এ্যাঁ, যাবি কোথায়?' চুলের মুঠি ধরে তুলসীকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চললো হরি মণ্ডল। ঠেসে ধরলো বিছানায় ফেলে, 'যাবি—আর যাবি?'

যন্ত্রণায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে তুলসীর।

বেহালাটা গোঙিয়ে মরছে তখনো—তুলসীর দম-চাপা অন্তরাত্মার মতো।

২৪

এ চরে আবাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ডগমগিয়ে উঠেছে ধানের চারা গাছগুলো। কচি-কাঁচা ফিকে সবুজে ধরেছে এখন যৌবনের গাঢ় রং। সে রংয়ের ছোপ আবার বেশী করে লেগেছে যেন কলিমদ্দির বাতিল চরের ক্ষেতে। তার সীমানা-বাঁধ ভাঙা—জোয়ারের জল হু-হু করে ঢুকেছে—তার সঙ্গে বয়ে এনেছে মৃত্তিকার প্রাণশক্তি পলিমাটি। ধানের চারাগুলি অল্প দিনেই বেড়ে উঠেছে হু-হু করে বাড়ন্ত মেয়ের মতো।

হরি মণ্ডল বললো, 'তোমার কপাল খুলে গেছে হে শেখ।'

কলিমদ্দি হেসে কথাটা ঘুরিয়ে বললো, 'মোর নসিব চারদিকে খোলা গো মণ্ডল—জরু ঘর জমিন, কোন কিছুর বাঁধন নাই। যা করে আল্লা।'

'আল্লা তোমার এবার ছপর ফেড়ে দেবে শেখ।'

'বেশী আশা করতে নাই মণ্ডল।' কলিমদ্দি বললো বটে কথাটা—কিন্তু চাপা খুশির ভাবটুকু উপচে উঠলো তার কথা থেকে।

'আশায় মরে চাষা।' ···

সেই ছড়া-কাটা বুড়ো ভৈরব দাস মূর্তিমান অমঙ্গলের মতো ছড়া কেটে উঠেছে। ধক্ করে উঠলো কলিমদ্দির বুক। তাকালো কটমট করে। ওই বুড়োটাকে সে সহ্য করতে পারে না। যেখানেই থাক হরি মণ্ডল—তার পেছনে টিকটিকির ল্যাজের মতো লেগে থাকবেই। আর কথায় কথায় ছড়া কাটবে মেয়েমানুষের মতো।

কলিমদ্দি বললো, 'ষাঁড়াষাঁড়ীর কোটালে কি হবে মণ্ডল জানি না। এখন থেকেই চাপ বাড়ছে জোয়ারের, জল ঠেলে আসছে তোমাদের পছিম চরের বাঁধের কোল পর্যন্ত। কে জানে, হয়তো সব ভেঙে চুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

ষাঁড়ার বান এ মরশুমের শেষ বড় জোয়ার। সকলের চোখেই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া কাঁপছে তার জন্য।

কলিমদ্দি বললো, 'সারা রাত ঘুমোতে পারি না মণ্ডল—ভেবে ভেবে মরি, কি হবে!'

কি হবে! জোড়া জোড়া চোখ, চেয়ে আছে নিষ্পলকে। বাঁধের ওপরে মণ্ডলকে দেখে আশপাশের ক্ষেত থেকে ঘাস নিড়োতে নিড়োতে উঠে এসেছে আরও কয়েকজন চাষী। মণ্ডলকে ঘিরে জটলা করে ওরা—তামাক খায় আর অনাগত আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে মনে মনে। শরতের ভরা গাঙ—তার বিস্তার আর খরস্রোত অত্যন্ত ভয়াল। এ গাঙ যখন ছুটে আসবে জোয়ারের বেগে মহাসমুদ্রের মতো—তখন কি হবে! কোথায় থাকবে এই নোনা মাটির বাঁধটুকু! প্রলয়ংকরী প্রকৃতির সামনে লোকগুলো বসে থাকে অসহায় হয়ে।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘিরে আসছে মাঠ প্রান্তর জুড়ে। ওরা ঘন হয়ে বসে কথা বলে। অসহ্য দুঃস্বপ্নের মতো আসন্ন একটা দিন নিঃশব্দে এসে ঘিরে ধরে ওদের। আবাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে—এখন এ চরে বেকার দিন। আর ক্ষুধা ও অনটন—চেপে ধরছে দিনে দিনে।

অনেক দিন আরও অপেক্ষা করতে হবে ওদের—মাঠের ধানগাছগুলি আস্তে আস্তে এগুচ্ছে পরিণতির দিকে। বড় আস্তে। ···

এর মধ্যে কে মিন্‌মিন্‌ করে বলে উঠলো, 'মোরা ক'জন ঠিক করেছিলাম—আবাদ শেষ ক'রে মাটি কাটতে যাব লাটে।'

'উঁহুঁ'—হরি মণ্ডল মাথা নেড়ে বললো, 'কেউ যেয়োনি চর ছেড়ে এবার। কপালে কি আছে ভগমান জানে। কলিমদ্দি ঠিক বলেছে—ষাঁড়ার কোটালে মোদের বাঁধ টিকলে হয়।'

ভুষণা বললো, 'খাব কি মণ্ডল! ঘরে যে একটা দানাও নাই।'

হরি মণ্ডল বললে, 'এরই মধ্যে উপরি কাজ-কাম খুঁজে দেখ।'

কোথায় কাজ-কাম! একেবারে বেকার দিন। অন্যান্য বছরে এই সময়ে ওরা তাই দল বেঁধে চলে যেত মাটি-কাটার কাজে।

একটি ছোকরা চাষী বলে উঠলো আক্ষেপে, 'তবু মালিক যদি মাটি দিত বাঁধে—মোরা খেটে খেতম।'

কলিমদ্দি হেসে উঠলো, 'ওই আশায় বসে থাক তোমরা। জানি শেষ তক্ পুবচরের চাষীদের মতো পালাবে চর ছেড়ে—যখন বাঁধ ভেঙে যাবে।'

এত কষ্টের আবাদ!—এত অনটন!—এত ক্ষুধা! ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় সকলেরই বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে। কি করবে তারা? পশ্চিম চরের বাঁধের ওপরে বসে হতাশায় দু'চোখ ভরে চেয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে।

হরি মণ্ডল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'সব কপাল!'

অন্ধকারে আবার ফেটে পড়লো সেই বেপরোয়া লোকটার গলা—কর্কশ, একরোখা, 'আমি রইলম—যে যাও তোমরা যাও, আমি দেখে যাব এ চরের শেষ। মোর নসিব চারিদিকে খোলা।'

ভুষণা বললো, 'কি হবে মণ্ডল!'

'কেউ যেয়োনি চর ছেড়ে।' হরি মণ্ডল বললো আবার, 'দেখ কপালে কি আছে।'

ভূষণা বললো, 'আর একবার যেয়ে মালিককে বল মণ্ডল তুমি। মোদের এত কষ্টের আবাদ!'—

মণ্ডল বললো, 'তো চলো তোমরাও মোর সঙ্গে—কলিমদ্দিও চলো।'

কলিমদ্দি রুখে বললো, 'আমি আর যাবনি। মোর সব আশা মিটে গেছে। তোমাদের এখনও আছে—তোমরা যাও মালিকের কাছে। আমি শালা বাতিল চরের চাষী। মোর মালিক শুধু খোদা। চল বে পবনা।' বলে বেপরোয়া একরোখা লোকটা চলে গেল গট্‌গট্ করে।

আর সবাই বসে রইলো। অন্ধকারে থৈ-থৈ করছে অনির্দিষ্ট দুর্ভাগ্য। তার কুলকিনারা নেই। কেমন করে লড়বে এরা তার সঙ্গে?

অসহায় শিশুর মতো বসে আছে ওরা।

এমন সময় সেই অভিশপ্ত বেহালাটা আর্তনাদ করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলো হরি মণ্ডল। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো, 'দ্যাখ! মোরা কপাল চাপড়ে মরছি যখন—তখন আর এক জনের চুল্‌কে উঠলো মাগী-ভোলানো গাওন-বাজন! দ্যাখ তোমরা।'

বেহালার বুক-ফাটা আর্তনাদটা কারুর অন্তরই স্পর্শ করে না আজ। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত এরা—এদের জান্তব যন্ত্রনার অসহ্য আর্তনাদের তলায় চাপা পড়ে গেছে প্রাণের আর্তনাদ—হৃদয়ের ক্রন্দন।

ভৈরব দাস ছড়া কাটলো, 'কারো সব্বনাশ—কারো পৌষ মাস।'

বিচলিত হরি মণ্ডল উঠে দাঁড়ালো। মনে হলো অসহ্য ক্রোধে সে কাঁপছে। বেহালার শব্দ আশ্চর্য ভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে তাকে।

সবাই চেয়ে রইলো মণ্ডলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে। হরি মণ্ডল খ্যাপার মতো চলে গেল ঘরের দিকে।

হন হন ক'রে এসে দাঁড়ালো সে নিজের উঠোনে। উঁকি মেরে দেখলো চোরের মতো—দাওয়ায় তুলসী নেই। বিকৃত উল্লাসে বড় আশা করেছিল সে—সেদিনের মতো তুলসী এসে দাঁড়িয়ে থাকবে দাওয়ায়। ক্ষাণিকটা হতাশ হয়ে দাওয়ায় উঠলো মণ্ডল—উঁকি মেরে দেখলো রান্না ঘরে ; ছোট ঘুলঘুলিটা দিয়ে হাঁ-ক'রে চেয়ে আছে তুলসী। ওই ছাখ, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেললো ! হরি মণ্ডল অন্ধ বেগে ছুটলো রান্নাঘরের দিকে। পেছন থেকে আচমকা গিয়ে ধরলো চুলের মুঠি—দিল হেঁচকা টান।

'অ মা গো'—

'শুনবি—শুনবি, আর—শুনবি !'

'আঁ ...'

কানে যেন জলন্ত অঙ্গার পড়লো।

'শুনবি আর ...

হায় রে, কেমন ক'রে সে না শোনে ! না হয় কান দুটো জলন্ত খোঁচায় কালাই হয়ে গেল কিন্তু তার হিয়ের কথা ? সে যে সবার অলক্ষ্যে তার সমস্ত স্বপ্ন ও ব্যর্থতা নিয়ে জেগে বসে আছে এই অবোধ গেঁয়োমেয়েটার বুকের একান্ত গভীরে।

তার বুক ফাটা অসহায় আর্তনাদ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে উঠলো।

মুহূর্তের জন্যে বেহালার সকরুণ মীড়কে ছাপিয়ে ওঠে শব্দটা। মুহূর্তের জন্যে হাতের আঙুলগুলো থমকে দাঁড়ায় ওস্তাদের—কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে। আর শোনা যায় না। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছড়ি টানে সে আবার : কে কোথায় বউ পিটোচ্ছে হয়তো। এ চরের সমস্ত মেয়েগুলোর বুকের ভেতরে ওই রকম

আর্তনাদ যেন দম চাপা হয়ে আছে—ফাঁক পেলেই ছিটকে আসে। এ রকম অনেক শুনেছে সে তার শৈশবকাল থেকে।

এ তার ভালো লাগে না—এ-চরের এই বন্য জীবনধারা। এরই মধ্যে কবে যেন বেনামী কয়েকটা দিন মাতাল সুরের হাওয়ায় পাল তুলে নোঙর করেছিল এসে এ-চরে। চলে গেছে আবার কোথায়—ধ্বসের সামনে থেকে। শুধু পড়ে আছে সেই পুরানো চরটা। আর তার সেই পুরানো মানুষগুলো। ক্ষুধায় আর অনটনে টুঁটি চেপে ধরে ওরা পরস্পরের। সেই রাখালের দেড় কাঠা! ··· এ তার ভালো লাগে না; এরই মধ্যে কাটছে তার কোন্‌ঠাসা দিন। একমাত্র সঙ্গী তার বেহালা আর কলিমদ্দি, আর পব্‌না। আর কেউ তার ভালো মন্দের খবরও শুধায় না। সে এক-ঘরে।

বর্ষা কেটে শরৎ এসেছে। অপেক্ষা করছে সে মনে মনে—তার যাত্রার দলের ডাক আসবে কবে। চরে একদিন ফিরে এসেছিল সে দেহ ও মনের অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে। কিন্তু এখন সে তার চারগুণ ক্লান্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে, যাত্রার দলের অধিকারী ডাকতে আসবে কবে। চলে যেতে পারবে এ-চর থেকে দূরে। ততোদিন তার ছোট্ট কুঁড়েটুকুর এক কোণে একমাত্র দুঃখের সঙ্গী তার এই বেহালা। অত্যন্ত স্নেহে সে কোলে টেনে নেয় বেহালাটাকে—তার হতভাগ্য জীবনের একমাত্র সঙ্গী, যার সঙ্গে প্রাণ ঢেলে মনের কথা বলা যায়। তার গুরু দীন দাস তাকে আশীর্বাদ করেছিল এই বলে। বড় খাঁটি কথা বলেছিল তার গুরু! দণ্ডবৎ গুরু—দণ্ডবৎ তোমাকে।—বেহালাটা সে বার বার মাথায় ঠেকায়।

কিন্তু কদিনই সে লক্ষ্য করছে, বেহালার মীড়ে মীড়ে তার হিয়ার বোঝা হালকা করার এক সুরলোকে যখন খোঁজে সে মনের একটু সুখ—একটু সান্ত্বনা তখন কোথায় যেন একটা বুকফাটা আর্তনাদ সমস্ত

অন্ধকারকে মুহূর্তের জন্যে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। আর্তনাদটা যেন তাকে তার সে সুরলোক থেকে টেনে হিঁচড়ে আনে চরের বন্য জীবনধারার মাঝখানে : যাবে কোথায় সে! বুঝতে পারে না ওস্তাদ—কে কোথায় এমন বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন রাতে তার ঘরে হুড়মুড় ক'রে এসে ঢুকলো তুলসী। লম্ফের ম্লান আলোয় তাকে দেখে চমকে উঠে দাঁড়ালো ওস্তাদ।

তুলসী হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'মোকে বাঁচাও অস্তাদ—আমি ঝুরকা ভেঙে পালিয়ে এসেছি! মোকে ঘরে তালাবন্ধ করে মণ্ডল গেছে খালের মুখে মাছ ধরতে। আজ রাতে আসবেনি। মোকে যেখানে হোক নিয়ে চল অস্তাদ।'

মেয়েটা উত্তেজনায় কাঁপছে। তার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওস্তাদ।

'এই ত্মাখ—এই ত্মাখ,' পিঠের কাপড় খুলে, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুল দেখালো, 'যত দিন তুমি বেহালা বাজিয়েছ ততদিনের দাগ—এই ত্মাখ কান, এই ত্মাখ গাল। মেরেছে, কেটেছে, ছ্যাঁকা দিয়েছে। আরও আছে, সে সব তো তোমাকে দেখাতে পারবোনি। মোকে নিয়ে চল অস্তাদ—যেখানে হোক, যেমন রাখবে—থাকবো আমি।'

সেই ভীরু লাজুক মেয়েটা সহ্যের শেষ সীমায় এসে মুখরা হয়ে উঠেছে—পালিয়ে এসেছে জানালা ভেঙে! এর পরে মণ্ডলের হাতে তার কি দুর্গতি হবে—ভেবে যেন শিউরে উঠলো ওস্তাদ। ব্যাকুল ভাবে 'অঁ-অঁ' করে উঠলো সে—হাত নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে জানালো—পালিয়ে যাক তুলসী, এক্ষুনি।

'মোকে চলে যেতে বলছ অস্তাদ!' হঠাৎ তুলসী ফুঁপিয়ে উঠলো এবার, 'মোকে চলে যেতে বলছো তুমি। আমি কিন্তু

এতদিন বসেছিলাম তোমার আশায়। বাপ মোর যার হাতে সঁপেছিল—'

গুরুকন্যা! ওস্তাদ কানে আঙুল দিল—শুনলেও যে পাপ হয়। ব্যাকুল ভাবে তুলসীকে ঠেলে বার ক'রে দিতে চাইলো বাইরে—মাথায় হাত বুলিয়ে দিল কয়েকবার। হয়তো সান্ত্বনা দিতে চাইলো।

তুলসী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো, 'আমি বাঁচবনি অস্তাদ। এই মোর ভাগ্য!'…

ওস্তাদ বিব্রত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো তুলসীর কোঁপানো কান্নার সামনে। তাকালো গভীর চোখে। তারপর নিজেই হঠাৎ সে ছটপটিয়ে পালালো সেখান থেকে—যেন ভয়ে। ছুটে পালালো পুবচরের দিকে।

চোখ মুছতে মুছতে তুলসী ফিরে চললো আবার। খোলা পড়ে রইলো ওস্তাদের ঘর। দমকা হাওয়া ঢুকে কখন এক সময়ে নিভে গেল লম্ফটা।

ভাঙা ভেড়ি বাঁধের ওপরে এসে থমকে দাঁড়ালো ওস্তাদ। একটা আর্তনাদ চিড়িক দিয়ে উঠলো এ চরের গভীর অন্ধকারে। এই ভয়টাই করছিল সে—হয়তো ধরা পড়ে গেছে তুলসী হরি মণ্ডলের হাতে। কান পেতে রইলো সে, যেন আর একটা আর্তনাদ শুনবে। না, আর কোন শব্দ নেই। গভীর রাত্রি আপন স্তব্ধতায় ঝিম ঝিম করতে লাগলো।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পা বাড়ালো সে কলিমদ্দির ঘরের দিকে।

পরের দিন সকালে পশ্চিম চরে হৈ-হল্লা উঠল নতুন এক দুর্ঘটনার। গলায় দড়ি দিয়ে তুলসী ঝুলছে। নাক আর কান বেয়ে

রক্তের ধারা নেমেছিল একটু সরু হয়ে—শুকিয়ে গেছে কখন সারা রাতে

২৪

তুলসীর মৃত্যু এ চরে নতুন কিছু নয়। এখানকার জীবনধারার আরও পাঁচটা ব্যাপারের মতোই ওটাও একটা ব্যাপার। শুধু চৌকিদারই ব্যাপারটা কেমন তেরছা ক'রে দেখেছিল।

হরি মণ্ডলকে একান্তে ডেকে চৌকিদার বলেছিল, 'এবার তা হ'লে থানায় খবর দিতে যাই মণ্ডল।'

'তোমার মাথা খারাপ!' হরি মণ্ডল বলেছিল, 'ই তো সামান্য ব্যাপার হে!'

'উঁ হুঁ।' চৌকিদার বলেছিল, 'তুমি বউটাকে বড্ড অত্যাচার করতে।'

হরি মণ্ডল কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, 'ওকে মানুষে কামড়েছিল—ই খবর তো তোমরা সবাই জানতে ভাই। তারপর ভ্যাখো, ক্ষুরকাটা ভাঙা!'

'উ সব বাজে কথা।' চৌকিদার বলেছিল, 'বউটার সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকার দাগ দেখেছি আমি মণ্ডল! তারপর, নাকে কানে রক্ত কেন বলো? তুমি মাতব্বর লোক! তুমি কি না'—

'চেপে যাও চৌকিদার।' হরি মণ্ডল আর শক্ত থাকতে পারেনি—হাত চেপে ধরেছিল চৌকিদারের।

'বেশ, তবে বিশটা ট্যাকা দাও।' চৌকিদার হাত পেতেছিল ঝপ করে।

হরি মণ্ডল বলেছিল, 'অতো! একটা বিবেচনা করে বলো ভাই।'

চৌকিদার ধাঁ করে নেমে এসে বলেছিল,' বেশ, তবে দশটাই দাও।

তুমি মোকে দিয়ে অনেক কাজ বাগিয়েছ মণ্ডল—একটা পয়সাও দাওনি। ইবার ছাড়ছি না।'

'বললাম তো—দেব তোমাকে। দুদিন সবুর করো ভাই। এই সেদিন কিষ্ট দাসের কাছ থেকে তোমাকে কতগুলান ট্যাকা খাইয়ে দিলম ত্থাখো!'—

'উটি হবেনি মণ্ডল।' চৌকিদার বলেছিল, 'একবার লাস পোড়ানো হয়ে গেলে তুমি আর টাকা দেবে?'

'মোকে অবিশ্বাস কর!' হরি মণ্ডল যেন অত্যন্ত আঘাত পেয়ে বলেছিল, 'এতদিন এত কাজ করলম এক সঙ্গে আর আজ তুমি বললে এ কথা!'

'মোর চেয়ে তুমি ভালো ভালো কথাগুলান দিব্যি গোছগাছ করে বলতে পার মণ্ডল—আমি শালা তা পারি না।' চৌকিদার বলেছিল, 'কিন্তু উ সব বাজে কথা। টাকা দেবে তো দাও—না হলে আমি যাই থানায়।'

টাকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত মিটমাট হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। তারপর চৌকিদার নিজেই কাঁধ লাগিয়ে বয়ে নিয়ে গেল মড়া। পোড়াল, হা-হুতাশ করলো, হাজারবার সান্ত্বনা দিল মণ্ডলকে: 'দুঃখু ক'রে আর কি হবে মণ্ডল। অমন আর মুখ শুকনো ক'রে থেকনি। অনেক সয়েছ তুমি—আরও অনেক সইতে হবে তোমাকে। শেষ কাজটি করো এখন। চিতায় আগুন দাও।'—

তারপর তুলসী বলে একটি ভীরু লাজুক মেয়ে একেবারে শেষ হয়ে গেল এ চরের মাটি থেকে—তার ঘর, তার সংসার, তার স্বপ্ন নিয়ে। তার সেই স্বপ্নের দাওয়া থেকে একটি লোক শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছিল তালপাকানো আকাশে ওড়া চিতাধূম। সে ওস্তাদ। শ্মশানে যায়নি—যেতে সাহস পায়নি।

কলিমদ্দি এসে বলেছিল, 'তুমি এবার চলে যাও অস্তাদ—চলে যাও ই চর ছেড়ে। দিনে দিনে সবাই কেমন যেন খেপে উঠছে তোমার ওপরে। বলছে, যত নষ্টের গোড়া তুমি।'

বেদনাহত বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সে কলিমদ্দির দিকে। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

'উপায় কি! মাতব্বর যেমন বোঝায়!' কলিমদ্দি বলেছিল হতাশ ভাবে, 'তার চেয়ে তুমি চলে যাও।' তুলসীর মৃত্যুর ইঙ্গিত করেই বলেছিল বোধহয়, 'এ চরে কি আছে আর তোমার?'

কি আছে! কলিমদ্দিকে ওস্তাদ কেমন ক'রে বোঝাবে এই কথাটা যে, কিছুই নেই বটে—তবু এইখানেই যে কোথায় কেমন করে সমস্ত মানুষটা গাঁথা হয়ে আছে!—এখানকার সমস্ত মানুষগুলির অবহেলা ও বিরোধের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে সে। তবু এ চর তার জন্মভূমি—তার প্রবল টান সে এড়াতে পারে না। এর গাছপালা, নদীনালা মাঠ সব কিছু যেন তার সঙ্গে কেমন ক'রে কবে থেকে এক হয়ে গেছে। এখানকার দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা—সব মিলিয়ে আঁকড়ে রেখেছে তাকে, বার বার টেনে নিয়ে এসেছে এখানে—যেখানে যত দূরেই যাক। হায়, এই কথাটা সে কোন রকমেই বোঝাতে পারবে না কলিমদ্দিকে—কেন এ দুর্নিবার অপ্রতিরোধ্য টান!—সে নিজেও হয়তো জানে না ভালো ক'রে। সে জানে না কেমন ক'রে সবার অলক্ষ্যে এ চরের আকাশ আর মৃত্তিকা, প্রকৃতি আর জীবনধারা তার শৈশবের শূন্য মস্তিষ্ককে একটু একটু ক'রে ভরে তুলেছে—স্থান করে দিয়েছে তার জন্যে। এ তার জন্মভূমি—এই চরটুকু ছাড়া গোটা জগত তার কাছে ফাঁকা—পরিচয়হীন। কোথায় ছেড়ে যাবে সে তাকে!

সে যাবে না—কোথাও যাবে না। কলিমদ্দির মতোই শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে এ চরে।

এ চরের মানুষগুলির বিরোধিতা জীবনে তার নতুন নয়। এমনি ক'রে যেমন অনেকদিন কেটে গেছে—তেমনি করেই কেটে যাবে দিন একান্তে। কিন্তু সেই একান্তের জীবনেই আজ একটা নতুন নিঃসঙ্গতা খাঁ-খাঁ ক'রে ওঠে ওস্তাদের মন ভরে। তার নিঃশব্দ এ ঘরটা যেন গিলে খেতে আসে আজ।—মনে পড়ে তুলসীকে। এ ঘরে তার হাতের ছোঁয়া আছে। ওই যেখানে বেহালাটা ঝোলানো আছে একটা পেরেকে —আজ চোখে পড়ে, সেখানে ভাঙা কাঁচের চুড়ি একটা গলানো আছে। ওই পেরেকটা পুঁততে গিয়ে চুড়ি ভেঙেছিল তুলসী, হাত কেটে রক্ত পড়েছিল, দেয়ালে তার দাগ কালো হয়ে আছে। তার সবটা ইতিহাস জানে না ওস্তাদ। শুধু ওই একটুকরো ভাঙা চুড়িই বিঁধতে থাকে আজ বড় বেশি করে। মনে মনে বলে : না এ চরে আর কোনো দিন সে বেহালায় হাত দেবে না।

গুরু দীন দাসের একটা গান মনে পড়ে বারে বারে :

আ গো দু'কুল গড়ে দুকুলেই ভাঙন।
কুন কূলে তুই না বাঁধিবি মন।...

এ চরের ভাঙা কূলে বাঁধা মন তখন শংকায় টলোমল। দিনগুলি একটি একটি ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে আগামী পূর্ণিমার দিকে—সামনে এ মরশুমের সব চেয়ে বড় জোয়ার ষাঁড়াষাঁড়ীর কোটাল। কয়েক মাইল দূরে মাত্র সাগর—মোহানার নদী। স্রোতের বেগ তার প্রচণ্ড—জোয়ারের রূপ তার ভয়াবহ দুকূল প্লাবী। সম্ভাব্য এক সর্বনাশের মাঝখানে বড় হয়ে ওঠে শুধু পশ্চিম চরের সীমানা বাঁধটা। কোথায় চাপা পড়ে যায় তুলসী বলে একটা মেয়ের গলায় দড়ির ইতিহাস। তা নিয়ে ভাববার বা হা-হতাশ করবার নিশ্চিন্ত সময় কোথায় এ হতভাগা চরের মানুষদের !

কখনো কেউ একা, কখনো দু-চারজন চাষীকে প্রায়ই দেখা যায় পশ্চিম চরের সীমানা বাঁধের ওপরে নিজের ক্ষেতের সোজা দাঁড়িয়ে বাঁধটাকে নজর ক'রে ক'রে দেখে, ধক্ পরীক্ষা করে। যেন বাঁধটা ভাঙলে ভাঙবে এইখানেই—তারই ক্ষেতের সোজা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—মালিক বাঁধে মাটি দিল না! তারপর হাঁ-করে চেয়ে থাকে গাঙের দিকে। চোখে ভয় আর স্বপ্নের করুণ দ্বন্দ্ব: জীবন কাঁপছে থর থর ক'রে।

দু-চারজন ক'রে কখনো বড় জটলা বসে যায় বাঁধের ওপরে। ঘনিয়ে আসছে পূর্ণিমার দিন।

এমনি একটা জটলা বসে গেল একদিন বাঁধের ওপরে।

কলিমদ্দি খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মালিক বাঁধে মাটি দিবে কবে হে? পূর্ণিমা যে কাছিয়ে এলো!'

সে কথার জবাব নেই। সবাই চাইলো একবার ফ্যাল ফ্যাল ক'রে।

হরি মণ্ডল বললো, 'তারা এ চরের আশা ছেড়ে দিয়েছে।'

কলিমদ্দি হেসে বললো, 'আশা ছাড়েনি মণ্ডল, ওৎ পেতে আছে। বুক ফেড়ে তোমরা বাঁধ বাঁচাও—ফসল হোক, তখন দেখবে সুড় সুড় ক'রে এসেছে ধানের ভাগ নিতে।'

সবাই চুপ ক'রে রইলো।

কলিমদ্দি নিজের মনে হেসে বললো, 'তবে তার বড় আশা নাই ইবার। মনে হচ্ছে—ভেসেই যাবে সব।'

ভেসেই যাবে। সবার মন বলে—ভেসেই যেতে হবে।

কথায় কথায় ওদের ভয় পাওয়া মনের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায় কতগুলো অপ্রাকৃত দুর্লক্ষণ।

কলিমদ্দি বললো, 'গভীর রাতে চমকে উঠে বসি—কোথায় কে যেন ধামসা বাজাচ্ছে—সে কী গুম্ গুম্ শব্দ! শুনেছ তোমরা?'

শুনেছে—অনেকেই শুনেছে সে শব্দ। রাত যখন গভীর হয়—সে শব্দ যেন হাতুড়ীর ঘা মারে ওদের বুকে। চরের মাটির তলায় কেমন একটা গুম্ গুম্ শব্দ।

হরি মণ্ডল ভুরু কঁচকে ভীতার্ত গলায় বললো, 'উটি বড় খারাপ লক্ষণ হে।'

কলিমদ্দি বললো, 'দিন দিন শব্দ যেন বেড়েই চলেছে মণ্ডল—যতো জোয়ার কাছিয়ে আসছে। মোর এক চাচা থাকে বাতিঘরে—আলো দেখায় সাগরের মুখে। সে বললো—তার সেখানে নাকি শব্দ আরও জোর!'

'শুধু কি ওই একটা লক্ষণ কলিমদ্দি!' হরি মণ্ডল বললো, 'সেদিন দেখি, দিনের বেলায় একটা শেয়াল ডাকছে—পছিম দিকে মুখ ক'রে। বোঝ—দিনের বেলা!'

'গোয়ালের গোরুগুলোও কি যেন শোঁকে বাতাসে!' একটি চাষী বললো, 'সেদিন দেখে মোর কেমন ডর লেগে গেল।'

হরি মণ্ডল বললো, 'শুধু কি ওই! আর একদিন মাঝরাতে উঠে দেখি—ফুট ফুট করছে জোছনা। হঠাৎ এক ঝাঁক কাক কা-কা ক'রে মোদের চরের উপর দিয়ে চলে গেল পছিম দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় একটা কুকুর কাঁদতে লাগলো। চরের জন্ম দেখলম আমি—কখনো এসব দেখিনি। মোর পর্যন্ত বুকটা কেমন কেঁপে উঠলো হে!'

বুক কেঁপে উঠেছে সকলেরই। এ সমস্ত দুর্লক্ষণের মাঝখানে যে অলুক্ষণে কথাটা আড়ালে থেকে যাচ্ছে তা হ'লো এই যে, শেষ হয়ে এলো এ চরের দিন। সেটা আর মুখ ফুটে কেউ বলে না।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়েছে। চার দিক ঘিরে জমাট বেঁধে গেছে নিস্তব্ধতা। অন্তিম জীবনের মতো সেই আদিগন্ত জোড়া স্তব্ধতার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অসহায় ভয়ার্ত মানুষগুলো।

জীবনের এই অন্তিম দৃষ্টিটিকে দেখে ওস্তাদ—চরের মেয়ে মরদ শিশুদের চোখে : শেষ হয়ে এলো। শেষ হলো এ চরের দিন তবে।

২৫

শেষ পর্যন্ত এলো পূর্ণিমার দিন।

কলিমদ্দি সকাল সকাল উঠে পবনাকে কাঁধে করে নিয়ে সোজা হাঁটা ধরলো দক্ষিণ মুখো। বাঁধের ওপরে দেখা হয়ে গেল হরি মণ্ডলের সঙ্গে। হরি মণ্ডল ভোরে ভোরে এসেছিল গাঙের অবস্থা দেখতে। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। এতদিন পরে এই চৌকো-মুখো বলিষ্ঠ লোকটাকে বুড়ো দেখাচ্ছে ভয়ানক। মুখে ক্লান্তি, ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়ালটা। সঙ্গে আছে পশ্চিম চরের আরও কয়েকজন চাষী। তাদের মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়, কত রাত তারা কেউ ঘুমোয়নি।

হরি মণ্ডল বললো, 'শেখ কি চর ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

'কোন্ চুলায় যাব মণ্ডল! বলেছি তো, সব্বনাশার শেষ দেখে যাব।' কলিমদ্দি ম্লান হেসে বললো, 'লেড়কাটাকে রেখে আসি বাতি-ঘরে চাচার কাছে। মোর যা হয় হবে।'

হরি মণ্ডল বললো, 'লক্ষণ বড় খারাপ শেখ।'

কলিমদ্দি বললো, 'সারারাত কাল পিঁপড়ে তাড়িয়েছি মণ্ডল! কোথা থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে সব ডিম মুখে করে। সব উঠছে যেয়ে চালে মটকায়। ওরা তো বোঝে সব।'

হরি মণ্ডল আর কোন কথা বললো না—শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

কলিমদ্দি চলে গেল হন্‌হন্ ক'রে।

দু-একজন ক'রে আরও অনেকে এসে জুটলো বাঁধের ওপরে। সকলের মুখেই শেষ যবনিকার ক্লান্তি আর অবসাদ। এত ক্ষুধা, এত

দারিদ্র, এত পরিশ্রম—আর সামনে দোদুল্যমান এত বড় মূর্তিমান ব্যর্থতা, সবটাকে আর যেন তারা বয়ে বেড়াতে পারছে না। একদিকে মাঠ ভরা ঘন সবুজ ধানবন—উছলে উঠেছে অসংখ্য মানুষের প্রাণরস নিংড়ে। আসন্ন গর্ভধারণের কাল। এ অভিশপ্ত চরের মানুষদের স্বপ্ন আর জীবন যেন অপেক্ষা ক'রে আছে ওই সরু সরু সবুজপাতাগুলির গভীর অন্তরালে। আর একদিকে প্রবহমান দুরন্ত জলধারা।

হরি মণ্ডল বিড় বিড় ক'রে বলে উঠলো, 'হোই দ্যাখ—রাঁড়ীর ব্যাটা এসেছে বাঁধ দেখতে।'

সকলে ফিরে তাকালো। দূরে দেখা যাচ্ছে ওস্তাদকে। বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে শূন্য চোখে চেয়ে আছে গাঙের দিকে।

হরি মণ্ডল বললো, 'মোদের অবস্থা দেখে মনে মনে ও খুশি—এ আমি হক কথা বলে দিলাম। দেখতে এসেছে—বাঁধের ওপরে মোরা সব কেমন আকুপাকু করছি।'

ভূষণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ওর কি বলো মণ্ডল—চর ভেসে গেলে ও চলে যাবে যেদিকে খুশি।'

হরি মণ্ডল বললো, 'তবু ভালো যে এতদিনে বুঝেছ কথাটা।'—

'মোরা মরে গেলাম। বউ ছেলেপুলের হাত ধরে সব ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় যে যাবো!'—আর একটি চাষী বলে উঠলো।

'ও শালা হাঘরে মোদের সে দুখের কথা কি বুঝবে বলো!' হরি মণ্ডল গাল দিল বিড় বিড় ক'রে। বললো, 'ওই হাঘরে শালার ঘর করে দিয়েছিলে তোমরা চরে! দ্যাখ দ্যাখ—শালা বাঁধের ধক্ দেখছে।'—

সবাই ফিরে তাকালো আবার। দেখা গেল ওস্তাদ পা দাবিয়ে বাঁধের ধক দেখছে যেন।

হরি মণ্ডল বললো, 'দেখছে—বাঁধ টিকবে কি-না। এ আমি বলে

দিলাম তোমাদের—জোয়ার আসবার আগেই ও চর ছেড়ে পালাবে। শালা বোবা শয়তান।'

ভৈরব দাস বললো, 'থেকে যেতেও পারে। রাতের বেলা. সাপের মতো দেবে হয়তো কোথাও বাঁধ ফাঁসিয়ে!'

'ঠিক বলেছ।' হরি মণ্ডল বললো, 'কেনারাম তশীলদারের পুত্তুর তো—তারই রক্ত বইছে ওর মধ্যে।, সেবার উত্তর চরের প্রজাদের জব্দ করবার জন্যে ওর বাপ দিয়েছিল বাঁধ কেটে—ভেসে সব্বশান্ত হয়ে গেল প্রজারা। মনে আছে, সেবার লোকগুলান ভিক মেগে খেয়েছিল!'

'তাই তো বলে গো,' বলে ভৈরব দাস একটা ছড়া কাটতে যাচ্ছিল —ভূষণা থামিয়ে দিয়ে বললে, 'সে যা হয়ে গেছে—হয়ে গেছে. এখন মোদের কি হবে বলো মণ্ডল!'

হরি মণ্ডল মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'না না—সব দিকে হুঁশিয়ার থাকা ভালো, ভৈরব ভালো কথা মনে করে দিয়েছে। সবাই চোখ রাখ ওর ওপরে।'

'কিন্তু বাঁধই যে টিকবেনি মণ্ডল।'

'কপালের কথা কে খণ্ডাবে বাপা!' হরি মণ্ডল ঘোলাটে চোখে চেয়ে বললো, 'জোয়ারের সময় সবাই চলে এস বাঁধের ওপরে। যা হবার হবে। মেয়েমানুষ আর কাচ্চাবাচ্চাদের সাবধান করে দাও, সজাগ রাখ।' তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'এ চরে বুড়া হলাম—এমন বাঁধ ভাঙার বছর মোর জীবনে হয়নি কোন দিন! সুখে দুঃখে চাষ-আবাদ ক'রে খেয়েছি। কিন্তু আজ'—বলে থেমে যায় হরি মণ্ডল।

হরি মণ্ডলের অভিজ্ঞতায় আজ তার প্রথম জোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ। সর্বনাশা গাঙ আজ এসে ঠেকেছে চরের শেষ সীমানায়। উদ্দাম

ভয়াবহ তার রূপ। তার সামনে বহু ঝড়-ঝাপটা খাওয়া পুরাতন মানুষ হরি মণ্ডলও বিচলিত।

সন্ধ্যের মুখোমুখি জোয়ারের জল এসে লাগলো পশ্চিম চরের সীমানা বাঁধের তলায়।

মেয়েরা বাচ্চা ছেলেপুলে নিয়ে জড়ো হয়েছে চরের শেষ সীমার অপেক্ষাকৃত উঁচু চড়াইয়ে। গোরু বাছুর ছাগলও সব সেইখানে। চরের প্রত্যেকটি পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে বাধের ওপরে। আসেনি শুধু ভৈরব দাস। সে গেছে মেয়েদের সঙ্গে। সকলের চোখেই আতংক—মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, হৃতসর্বস্ব মানুষের মতো। পূর্ণিমার আদিগন্ত ঢালা জ্যোৎস্না—সে আলো ম্লান করুণ হয়ে ঝিকমিক করছে শুকনো চোখগুলিতে। জোয়ারের জল বাড়ছে—আস্তে আস্তে উঠছে বাঁধের ওপরে।

প্রতিটি বুকের ওঠা-পড়া, মাঝে মাঝে ভেঙে পড়া প্রতিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায় কান পেতে। কারুর মুখে কথা নেই—সবাই যেন দম বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছে শেষ অংকের, এ চরের যবনিকার। সকলের মাঝখানে এসে বসেছে ওস্তাদও। হরি মণ্ডল আর কলিমদ্দি ঘুরে ঘুরে দেখছে বাঁধের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত। ওস্তাদকে দেখে হরি মণ্ডল কাকে যেন বললো ফিস ফিস করে :

'নজর রাখিস শালার ওপরে।'—

আবার স্তব্ধতা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যে মহানীরবতা তার নিস্পন্দ দৃষ্টি তুলে তাকায় পলকের জন্যে—সেই আশা-নিরাশায় ছাওয়া দৃষ্টি যেন ঝরে পড়ছে মহাশূন্য ছেয়ে। মুহূর্তগুলি গড়িয়ে চলেছে অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসের মাঝখানে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

এর মাঝখানে সহসা ফেটে পড়লো কলিমদ্দির গলা, 'হোঃই—ঝোরা ঝোরা হে! খড় দাও—খড়—কোদাল!'

বাঁধের ওপরের লোকগুলোর মধ্যে হঠাৎ একটা আলোড়ন ওঠে। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকায় কলিমদ্দির দিকে।

কলিমদ্দির গলা হাঁক পাড়তে থাকে, 'গেল গেল!—খুঁটি মারো। খড় দাও। ছুটে এসে হাত লাগাও স্যাঙাৎরা। আরো খড়—আরো খড়।'—

লোকগুলো এতক্ষণ যেন এই রকম একটা নির্দেশের অপেক্ষাতেই ঠাণ্ডা মেরেছিল। কলিমদ্দির হাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই। খুঁটি পোতার ঠক ঠক শব্দ।—হঠাৎ একটা আলোড়িত হাল্লা কেঁপে ওঠে। সর্বনাশের শেষ মুহূর্তে জেগে উঠলো যেন এতক্ষণের হতাশ হাতগুটোনো মানুষ-গুলো। ভাগ্যের সঙ্গে শেষ লড়াই লড়বার মত একটা কিছু পেয়ে গেছে এবার। তাদের মাঝখানে বারে বারে ফেটে পড়ছে আদেশের মতো বহু জোয়ার-খাওয়া বেপরোয়া কলিমদ্দির গলা। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাওয়া জোড়া জোড়া হাত-পায়। কাঠ—খড়—কোদাল। ছুটোছুটি পড়ে যায় বাঁধ থেকে গ্রাম—গ্রাম থেকে বাঁধে।

'খড় আনো—বাঁশ আনো—কাঠকুটো যা পাও।' ···

নোনা মাটির বাঁধ—ছোট ছোট তরঙ্গের মাথার ঘায়ে ঝরে পড়ছে বাঁধের মাটি। বাঁধের ওপরে ক্রমশ ফেঁপে উঠছে জল। ঝোরা পড়ার সম্ভাবনা সর্বত্র। একবার একটু ঝোরা পড়লে কয়েক মিনিটেই তা বাঁধকে ধসিয়ে নেবে।

অনেক তোড়জোড় ক'রে একটা ঝোরা বন্ধ হলো।

'ভগমান!' আবেগে কেঁপে উঠলো কার গলা।

কলিমদ্দি বললো, 'ঝোরা পড়লে বাঁধ গেল। কড়া নজর রাখ চারদিকে—যদি বাঁচতে চাও। দলে দলে ভাগ হয়ে বোসো।'—

দল ভাগ ক'রে সারা বাঁধ জুড়ে বসিয়ে দিল কলিমদ্দি। বললে, 'এক দল আর একদলের দিকে যাবে না। ঝোরার দিকে চোখ রেখে পাহারা দাও।'

বাঁচার বিশ্বাস ফিরে এসেছে এতক্ষণে। অত্যন্ত সজাগ সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ঘুরছে কয়েকজন। কিছু লোক কাঠ আর খড় স্তূপীকৃত করে তুলছে বাঁধের ওপরে। হরি মণ্ডল দেখছে সবটা চুপ করে—বহু জোয়ার-খাওয়া কলিমদ্দির কাছে আজ হঠাৎ যেন লোকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। জোয়ারের সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা হয়নি কোনোদিন তার।

'পুবের বাতস দিচ্ছে হে কলিমদ্দি।' হরি মণ্ডল এতক্ষণে বলবার মতো একটা কথা যেন খুঁজে পেল, 'ই লক্ষণ কিন্তুক ভালো নয়।'

কলিমদ্দি বললো, 'মোদের চরের কোন লক্ষণটা ভালো মণ্ডল? তবু গ্যাখো—লড়ো। যদি বাঁচতে পারি।'—

আবার গড়িয়ে চললো মুহূর্তগুলি—শ্বাসরুদ্ধ, গুরুভার। জল উঠে এসেছে তখন প্রায় বাঁধের মাথায়—কানায় কানায়। জ্যোৎস্নার রহস্যময় আলোয় দুলছে সীমাহীন জলরাশি।

কলিমদ্দির হাঁক শোনা গেল আবার, 'হুঁশিয়ার গো—সময় বুঝে শালার কুমীরও এসে লেগেছে।'

রাত্রি এগিয়ে চলেছে গভীরতার দিকে। এই সময়ে দীর্ঘ একখণ্ড মেঘে ঢেকে গেল পূর্ণিমার চাঁদ। আরও জমাট মনে হয় রাত। জেগে আছে প্রতিটি উৎকণ্ঠিত মানুষ। কোথাও দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসাদে ঝিমোনি এসেছে হয়তো। দু-একটা লোক ঝিমোচ্ছে। হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখে শিউরে খাড়া হয়ে বসছে কেউ।

কে বললো ক্লান্ত গলায়, 'ভাটির টান ধরছে না তো!'

কে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

মুহূর্তগুলি বড় দীর্ঘ মনে হয়। দুঃখের রাত্রির যেন শেষ নেই।

লোকগুলো আর পারছে না। বহু বিনিদ্ররজনী আর আজকের দীর্ঘায়িত উৎকণ্ঠার পীড়ন—অবসাদে মাথা যেন আর খাড়া রাখতে

পারছে না। ঢুলে পড়ছে থেকে থেকে। ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে আজ বেহালাটা বাজাতে সাধ হয় ওস্তাদের—দেখতো সে, কোথায় যায় ওদের ঘুম কিন্তু হরি মণ্ডলের দিকে চেয়ে কোথায় উবে যায় তার সে সাধ। ঘুমে ঢুলে পড়া লোকগুলোর কিছুটা দূরে খাড়া হয়ে বসে আছে ওস্তাদ—চোখ জ্বালা করছে, চোখে তার ঘুম নেই। এ চরের শেষ অংকে এসে বার বার হানা দিচ্ছে তাকে অতীত—তার বাল্যকাল।

হঠাৎ ঋজু হয়ে দাঁড়ালো সে—মনে হলো যেন ঝোরা দেখলো। মেঘে ঢাকা চাঁদ—ভালো দেখা যাচ্ছে না। দু-পা এগিয়ে গেল। ঝোরাই বটে। একটি সরু ফাটল বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে—জলের সরু রেখা একটি নামছে ধান ক্ষেতে।

একটা কোদাল নিয়ে ছুটে গেল ওস্তাদ। মাটি কুপিয়ে ফাটল বন্ধ করতে লাগলো। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো 'অঁ-অঁ' ক'রে।

হরি মণ্ডল চেঁচিয়ে উঠলো ওস্তাদের দিকে চেয়ে, 'হায় হায়—দিল বাঁধ কেটে। খেপে গেছে—খেপে গেছে শালা শয়তান!'

মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে হাতে কোদাল নিয়ে বোকার মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো ওস্তাদ।

পাশের ঝিমোনো লোকগুলো খাড়া হয়ে উঠে বসলো ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে। ছুটে আসছে ক্রুদ্ধ চাষীরা। এমন সময় ঝোরার মুখে হুস ক'রে ধস নামলো একটা। ভরা জোয়ারের চাপ। দেখতে দেখতে বেড়ে যাচ্ছে সেটা।

'শালা মোদের সব্বনাশ ক'রে দিল রে—মেরে ফ্যাল ওকে, পুঁতে ফ্যাল ওইখেনে।' হরি মণ্ডল চেঁচাতে লাগলো সমানে।

ধসের মুখে সুরু হয়ে গেছে তখন ধ্বস্তাধ্বস্তি। মার মার ক'রে ছুটে আসছে সবাই সেই দিকে।

কলিমদ্দি ছিল বাঁধের আর এক প্রান্তে। ছুটে এলো সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'হলো কি গো!' তারপর ধস দেখে আঁৎকে উঠলো, 'গেল গেল—হানা পড়ে গেল। হানা সামলাও—আগে হানা সামলাও। গেল সব যে!'

দেখতে দেখতে দু-হাতের মত হানা পড়ে গেছে একটা। ধানের ক্ষেতে জলের তোড় নামছে হু-হু ক'রে—ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে যাচ্ছে হানাটা।

ওস্তাদকে ছেড়ে ক্রোধান্ধ মানুষগুলো ছুটে এলো কলিমদ্দির ডাকে—হতচকিত হয়ে যায় হানা দেখে।

কলিমদ্দি হেঁকে বললো, 'শুয়ে পড়ো—যে কজন পারো, নেমে যাও হানায়। জল আটকাও যেমন ক'রে পারো, মোদের দুঃখের ধান জীবনের ধন হে ভাই!'

ঝপ্ ঝপ্ ক'রে হানায় নেমে পড়েছে ক-জন—অবরোধ ক'রে দাঁড়ালো দুরন্ত জলের স্রোত। পারছে না—জলের তোড় ঠেলে ফেলে দিচ্ছে।

আসন্ন সর্বনাশকে ঘিরে হট্টগোল ওঠে একটা। তাকে রুখবার জন্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই। সে আলোড়নের মধ্যে হারিয়ে গেল হরি মণ্ডলের কুটিল গলা।

ওস্তাদ দাঁড়িয়েছিল দূরে এক পাশে স্তম্ভিত বিস্ময়ে—কিছু যেন বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। এক ফাঁকে কলিমদ্দি ছুটে এসে হাত চেপে ধরলো তার। চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, 'পালাও অস্তাদ—পালাও তুমি। দাঁড়িয়ে থেকনি আর। পালাও ই চর ছেড়ে।'

কলিমদ্দির দিকে ওস্তাদ তাকালো গভীর চোখ তুলে।

কলিমদ্দি হাত-ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললে, 'খেপে আছে সবাই—পালাও তুমি অস্তাদ। মোর কথা শুন।'

তেমনি গভীর চোখে তাকালো ওস্তাদ—দেখলো হানায় পড়া লোকগুলোকে, যারা জীবন-মরণ সংগ্রামের অভিনয় করছে এ চরের শেষ নাটকে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ম্লান করুণভাবে হাসলো কলিমদ্দির দিকে চেয়ে। মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে। হয়তো বিদায় জানালো বোবা লোকটা। তারপর চলে গেল আস্তে আস্তে। কলিমদ্দি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলো চেয়ে চেয়ে—ওস্তাদের রোগা দীর্ঘ দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

তারপর হানার দিকে চোখ ফেরালো কলিমদ্দি—সবাই তখন সেইখানে ব্যস্ত খড়, কাঠ, খুঁটি, কোদাল নিয়ে। চলছে হাঁক ডাক হৈ-হল্লা। চেয়ে দেখলো—তার মাঝখানে হারিয়ে গেছে হরি মণ্ডল। আপাতত চাপা পড়ে গেছে তার উস্‌কানী।

কলিমদ্দি হেঁকে বললো, 'হুঁশিয়ার হে—কুমীর এসে গেছে। ক-জনা কষে ডাণ্ডা পিটাও জলে।'

ক্লান্ত স্নায়ুর শেষ শক্তি-বিন্দুগুলি দিয়ে জল আটকাবার, বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করে সবাই। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লড়াই করার পর হানা বন্ধ হ'লো। জলে কাদায় মাখামাখি হয়েও ঘেমে উঠেছে সবাই। বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছলো।

কলিমদ্দি বললে, 'সাবাস ভাই—সাবাস।'—

'হে মা গঙ্গা! দুঃখীর ধন—মোদের জীবন!' গলা কেঁপে উঠলো হরি মণ্ডলের। সকলের ক্লান্ত মুখগুলোর দিকে চেয়ে বললো, 'বাঁধ তো বাঁচালে কিন্তু খুঁজে ছাখ সবাই—মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা পালালো কোথায়। শালা সব্বনাশ করে দিচ্ছিল মোদের এখুনি।'

অন্ধ ক্রোধ আবার ধক্ ধক্ করে জলে ওঠে ওদের সবার চোখে। বললে, 'এইখেনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল তো।'

'খোঁজ—ওর টুঁটিটা ধরে দে হানায় পুঁতে শালাকে।' হরি মণ্ডলের কর্কশ গলা ফেটে পড়লো ক্রোধে—ক্ষোভে।

কে একজন বললো, 'এখানে নাই—পালিয়েছে। ঘরে পালিয়েছে বোধ হয়।'

কয়েকজন ঘরের দিকে ধাওয়া করবার জন্তে ঘুরে দাঁড়ালো।

কলিমদ্দি হেঁকে বললো, 'বাঁধ ছেড়ে কেউ গেলে ভাল হবেনি কিন্তু হে! উ সব কাল সকালে হবে—বিচার-সালিশ। আগে বাঁধ বাঁচাও জোয়ারের মুখ থেকে।'—

হরি মণ্ডল দাঁত কড়মড় ক'রে বললো, 'শালা পালাবে কিন্তক।'

আবার কে চিৎকার করে উঠলো, 'ঝোরা—ঝোরা হে! ছুটে এস।'

'আগে ঝোরা সামলাও মণ্ডল।' বলে কলিমদ্দি ছুটে গেল সেই দিকে। সবাইকে ডাক দিয়ে বলে গেল, 'আগে নিজেরা বাঁচ স্যাঙাৎ।'

২৬

নরম নোনা মাটি। জীর্ণ বাঁধ। ঝোরা নামছে এখানে ওখানে। মোহানার গাঙ—জলের চাপের যেন শেষ নাই। বাঁধের ওপর থেকে ভাটির জলের চাপই নামতে নামতে রাতের অধিকাংশ ভাগ কেটে গেল। জল নামার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁধের ওপর শুয়ে পড়লো কেউ কেউ। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সবাই।

কলিমদ্দি নিজের কুঁড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, 'হাই স্থাখ, মোর শালা চালা ভেসে গেছে গো।'

ভূষণা আবেগে বললো, 'মোরা তোমার চালা তুলে দেবো শেখ। আজ তুমি মোদের বাঁচিয়ে দিলে।—সাহস দিলে।'

হরি মণ্ডল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'বেঁচে গেলম শেখ—বেঁচে গেলম এ সন। কিন্তু সেই মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা, তাকে

মোরা ছাড়বনি। পষ্ট দেখলাম—বাধ কাটছে। মোদের এত দুখের চাষ-আদাদ !'—

কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'চলো ওর বিচার করি মোরা।'

'চলো। কোথায় পালিয়ে যাবে শালা !'—

'ঠাণ্ডা হও এখন—ঠাণ্ডা মাথায় তার বিচার সকালে করবে।'

কলিমদ্দি থামাতে চাইলো, কিন্তু অতোগুলো খেপে ওঠা মানুষের ক্রোধান্ধ গর্জনে ডুবে গেল তার গলা। হরি মণ্ডল তাদের এগিয়ে নিয়ে চললো। খ্যাপা দলটা এগিয়ে চলেছে ওস্তাদের ঘরের দিকে। সকলের আগে কলিমদ্দি চলেছে বিমূঢ়ের মতো। বুক কাঁপছে তার। কে জানে —ওস্তাদ ঘরে আছে কি-না !

দলটা এসে দাঁড়ালো ওস্তাদের ঘরের সামনে। দরোজায় তালা ঝুলছে।

কলিমদ্দির বুকের কাঁপুনি থামলো। যাক—ঘরে নাই তাহলে।

কিন্তু ব্যর্থতায় সবাই যেন পাঁচগুণ খেপে গেছে তখন। কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে দমাদ্দম লাথি মারতে লাগলো বাঁশের দরোজায়।

'ভেঙে গুড়ো করে দে শালার ঘর।'

'আগুন নাই—আগুন !'

'ঠিক—পুড়ে দে শালা শয়তানের বাসা।'

হরি মণ্ডল একটা দেশলাই ছুঁড়ে দিল খ্যাপা ভিড়ের দিকে। আশ্চর্য ! সবাই সাগ্রহে হাত বাড়িয়েছে। ভুষণা দেশলাইটা লুফে নিল। চালা থেকে এক গোছা খড় টেনে দেশলাই জেলে আগুন ধরালো তাতে। সেই আগুন গুঁজে দিল ঘরের চারকোণে।

কলিমদ্দি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। চালা ধুঁইয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। জ্বলবে।

ভুষণা আগুন দিয়ে এসে বললো, 'যাক শালা'—

কলিমদ্দি বললো, 'একদিন এ ঘরের দেয়াল দিয়েছিলে তুমি।'

'অনেক কিছু করেছিলম—অনেক পাপ করেছিলম।' ভুষণা বললো, 'আজ খণ্ডন করলম শেখ।'

দেখতে দেখতে আগুন ধরে উঠলো চারদিক থেকে। খ্যাপা দলটা ফেটে পড়লো উল্লাসে।

কলিমদ্দি আর দাঁড়াতে পারলো না। ফিরে এলো একা পুবচরে। চর থেকে জল নেমে গেছে একেবারে। তার ক্ষেতের ধান গাছগুলি স্রোতের চাপে নুয়ে পড়েছে কিছুটা। ঘুরে ঘুরে দেখলো কলিমদ্দি। তার আনন্দ হওয়ার কথা—এ মরশুমের বড় বিপদ কেটে গেল আজ। কিন্তু মন ভারি হয়ে আছে তার। পশ্চিম চরের আকাশ লাল হয়ে আছে তখনও।

সেই ভারি মন নিয়ে এসে দাঁড়ালো সে তার চালা-ওড়া কুঁড়ের সামনে। একদিকের দেয়াল ধসে গেছে। জমেছে এখানে ওখানে স্রোতে ভেসে-আসা জঞ্জাল। অন্যমনে সে দেখছিল দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চম্‌কে উঠলো সে পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনে।

ওস্তাদ। কাঁধে বেহালা। এসে দাঁড়ালো ম্লান হেসে।

কলিমদ্দি ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো তার হাত। আবেগে বলে উঠলো, 'আবার তুমি ফিরে এলে! কি আছে আর তোমার এ চরে? তোমার পোড়া ঘরের ধোঁয়াও এখনও মিলায়নি আশমানে—হোই দেখ!'

নতুন একটা আঘাতের দাগ পড়লো ওস্তাদের ম্লান বিষণ্ণ মুখে। মার-খাওয়া চোখে তাকালো পশ্চিম আকাশের দিকে।

'হোই দ্যাখো—তাল তাল ধোঁয়া।' কলিমদ্দি বললো, 'তোমার কিছু নাই—কেউ নাই—কেউ নাই আর এ চরে। যাও, পালাও তুমি।'

কলিমদ্দি ওস্তাদকে জড়িয়ে ধরে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো, 'তুমি গাওন-বাজনের লোক, অন্য কোথাও যাও তুমি। এ চরে তোমাকে আর কেউ চায় না গো অস্তাদ। এ দুখের জীবনে কে চাইবে তোমাকে!'

গাঙের ধারে ধারে আঘাটা দিয়ে ওস্তাদকে জোর করে অনেকখানি এগিয়ে দিল কলিমদ্দি—যাতে কেউ দেখতে না পায়। তারপর এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, 'চলে যাও জোর পা চালিয়ে—রাত থাকতে থাকতে, যত দূরে পার। খ্যাপা কুত্তার মতো খুঁজছে তোমাকে সবাই। যাও'—

তারপর মুহূর্তের জন্যে বোধ করি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওস্তাদের মুখটা দেখেছিল সে। দেখে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠেছিল তার। আবেগে বলে উঠেছিল পেছন থেকে, 'চোখে পানি তোমার অস্তাদ! অস্তাদ!'—

হ্যাঁ, পানিই। ওস্তাদ তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে চলতে লাগলো সামনের অন্ধকার ভেঙে—বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে নিঃশব্দ তার চাপা কথার কলরব: সেলাম কলিমদ্দি ··· দণ্ডবৎ গুরু দীন দাস ··· দণ্ডবৎ আমার জন্মের মাটি—পুবচর পছিম চর দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ! ···

কলিমদ্দি দাঁড়িয়ে রইলো যতক্ষণ দেখা যায় ওস্তাদকে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে চললো পুব চরের দিকে। হঠাৎ যেন কেমন সঙ্গীহীন বন্ধুহীন মনে হয় বহু দিনের অভ্যস্ত এই নিঃসঙ্গ লোকটারও। যেতে যেতে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে উঠলো অবরুদ্ধ গলায়:

'যাও তুমি যাও, ই চরে আর গাওন বাজন নাই, হিয়ের মানুষ নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই—চলে যাও তুমি।'

সহস্র ফাটল ধরা জীর্ণ পরিত্যক্ত চরের ওপর দিয়ে বিষণ্ণ ক্লান্ত গতিতে মন্থর পা ফেলে ফেলে ফিরে চললো কলিমদ্দি। কানে এসে লাগছে

কান্নার সুর—কে কাঁদছে বোধ হয়। টানা কান্নার রেশ একটা কাঁপছে হাওয়ায়। হবে—এ চরে কান্নার বিষয় আর লোকের অভাব তো নেই।

২৭

ষাঁড়ার কোটাল গেল। পূর্ণিমার পরের দিন থেকে উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের চাপ কমতে লাগল ক্রমশ।

সামনে শীত—গাঙের রুদ্ররূপ শান্ত হয়ে আসবে এবার দিনে দিনে ফণা-গুটোনো ভুজঙ্গের মতো। সর্বনাশা প্রকৃতির কাছ থেকে এবারের মতো নিশ্চিন্ত ওরা। বাঁশ, খড়, লকড়ি দিয়ে গোঁজাতাপ্পি মারা পশ্চিম চরের সীমানা বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে গাঙের দিকে চেয়ে চেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চাষীরা। দিনের পর দিন, বহু সংগ্রাম, বহু ক্ষয় ক্ষতির পর ভাবনাহীন আনন্দে বেড়ে উঠছে চরের ধান গাছগুলি। এবার ওদের কেশর ধরার কাল—চরের মাঠ জুড়ে যেন গর্ভাসন্ন নারীর উচ্ছ্বসিত হিল্লোল।

সেই হিল্লোলের মধ্যে দিয়ে ক্ষুধার্ত স্বপ্নরা হানা দেয় নিরন্ন কুঁড়ে গুলো ঘিরে ঘিরে। ফসল ওঠার আগে অন্নহীন চূড়ান্ত উপবাসী দিন। চাষীরা বলে 'কাত্তিকা টান।' ক্ষুধা আর ফসলের স্বপ্ন তীব্র হয়ে ওঠে সমানে। গর্তে ঢোকা উপবাসী শুকনো চোখগুলো মাঠের উচ্ছ্বসিত সবুজের দিকে চেয়ে চেয়ে স্বপ্ন দেখে আগামী ফসলের—উঠোন-ভরা খড়ের গাদা, মরাই-ভরা ধান—একটু সুখ, একটু সচ্ছলতা।

কলিমদ্দির গর্তে ঢোকা চোখের রুক্ষ দৃষ্টি নরম হয়ে আসে—গলে গলে পড়ে পিতৃস্নেহের মতো। তার আবাদ করা ক্ষেত বাতিল চরটার সমস্ত দারিদ্র্যকে ঢেকে দিয়ে উছলে উঠেছে। তারও মাঝখানে মাথা উঁচু করে আছে তার কুঁড়ের নতুন চালা—পশ্চিম চরের চাষীদের

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন; সবাই মিলে নতুন ঘর তুলে দিয়েছে কলিমদ্দির। সবটা মিলে যেন একটা নতুন জীবনখণ্ড। কে বলবে এটা পরিত্যক্ত বাতিল চর!

সবটা জড়িয়ে স্বপ্ন আর আশা ঘন হয়ে নামে কলিমদ্দির চোখে। সেই চোখ মেলে সে দেখে—পরিত্যক্ত এ চরটায় শুধু তো ওই একটি নিঃসঙ্গ কুঁড়ে নয়—আরও অনেক কুঁড়ে, অনেক মানুষ-জনে ভরে গেছে। গাঙের এপার-ঘেঁষা গভীর জলের নিশানা-বয়াটা সরে গেছে ধরো ওই পারে, স্রোত-গতি পরিবর্তন করেছে। তারপর দেখা গেল একদিন—কে যেন ছুটে আসছে উর্ধ্বশ্বাসে বন্ধ্যা বাতিল চরের ওপর দিয়ে—মুঠো করা দুটো হাত আকাশে তোলা। দু-মুঠোয় এপারে নতুন এসে জমা বালি। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে তার গলা—হাঁকে কাপছে চরের আকাশ।

'বালি—বা ··· লি! ···

চর জমলো আবার বহু বছরের ভাঙনের পর। ক্ষেতে ফসল। নতুন ঘর। কিন্তু আমিনা তো নেই সেদিন!

পেটে দু-হাত চেপে সে সিটিয়ে মরে গেল কবে! মরুক। জীবন-ধারা সেইখানেই তো আর শেষ হয়ে যায়নি। পব্‌না আছে। পব্‌না বড় হবে—তার বউ আসবে। আর পব্‌নাও কি তখনো বউটাকে ধরে পিটোবে! ···

'আবে পব্‌না!'

'কি!'—

'বউটাকে মারলি? বেতমিজ!'—

'খুন ক'রে ফেলাবো। উ ধান-ঘরে যাবে কেন?'

'তোর মাকে ভি যেতে হয়েছিল। বছরের শেষে ধান কর্জ করতে সব্বাইকে যেতে হয়!'

'উ সাঁজ পহরে যাবে কেন ?'

'তশালদার যে ঝি-বউড়িদের সাঁঝ পহরেই ডাকে।'

'বে-ইজ্জতি কাম। মণ্ডল ঘর বন্ধ ক'রে পাহারা দেয়—তশীলদার বে-ইজ্জৎ করে। উ যাবে কেন ?'

'যাবে যাবে—জরুর যাবে। লাথ মারতে যাবে। উ ঘরটাকে ভাঙতে যাবে।'—

যাবে যাবে—জরুর যাবে একদিন।...

'কি বিড়-বিড় কর শেখ একলা ?' ভুষণা বলে উঠলো ভেড়ি বাঁধের ওপর থেকে। সঙ্গে তার আরও জনকয়েক চাষী ঘাস নিড়োতে নিড়োতে ক্ষেত থেকে উঠে এসেছে তামাক খেতে। তারা হেসে উঠলো কলিমদ্দির দিকে চেয়ে।

কলিমদ্দি হেসে জবাব দিল, 'মোর নসিবের সঙ্গে কথা বলছিলাম গো—মোর বাতিল চরের নসিব ভাই।'

দু-একজন ক'রে আরও জুটে যায় কয়েকজন। কলিমদ্দিও উঠে এলো ক্ষেত থেকে। তামাক খায়—জটলা পাকায় ওরা বাঁধের ওপরে বসে বসে।

কলিমদ্দি জিজ্ঞেস করলো, 'কাল সাঁজ পহরে মণ্ডলের ঘরের দিকে কিসের গোলমাল শুনলম একটা হে ?'

ভুষণা বললো, 'মণ্ডলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে বউয়ের জন্যে।'

'হলো কি ?'

কয়েকজন চাষী হাসলো। ওদের ভেতর থেকে একজন বললো, 'বদির বউকে ধান দেবে বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে মণ্ডল না-কি জাপটে ধরেছিল।'

'তোমরা কি করলে ?' কলিমদ্দি খোঁচা দিয়ে বললো।

'মোরা আর কি করবো শেখ!' ভুষণা বললো, 'বদির বউ মণ্ডলের হাতে না-কি কামড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে।'

এমন সময় কে একজন বলে উঠলো, 'হেই—মণ্ডল আসছে ই দিকে গো!'

হরি মণ্ডল আসছে ওদের জটলা লক্ষ্য ক'রে, সঙ্গে সদাসঙ্গী টিকটিকির ল্যাজ ভৈরব দাস। চুপ ক'রে যায় সবাই। কলিমদ্দি এক-নজরে চেয়ে আছে মণ্ডলের দিকে। রুক্ষ অতৃপ্ত মুখটা মণ্ডলের—থুৎনিটা ঝুলে পড়ছে যেন ক্ষোভে। ডান হাতের কব্জির কাছে চুণ হলুদ লাগানো। কাছে আসতে কলিমদ্দি বলে উঠলো:

'আহা, হাতে কি হলো মণ্ডল?'

থুৎনিটা আরও ঝুলে গেল মণ্ডলের। বললো, 'রাতের বেলা কাল পড়ে গিয়ে কেটে গেল শেখ। বুড়ো হয়ে পড়লম! জানোই তো—সংসার মোর শ্মশান—চোখেও ভালো দেখতে পাই না।' ···

ভৈরব দাস টিক্-টিক্ ক'রে উঠলো, 'ভাঙা লৌকা—বুড়া কাল। রাত দিন সামাল সামাল॥'

'হাঁ—মোর ভাঙা লৌকা।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মণ্ডল বললো, 'সংসার মোর শ্মশান। এ চরের ভাঙা কপাল। এমনি ক'রেই তো কেটে গেল জীবন মোর! এমনি চির দুখে।'

সবাই চুপ ক'রে আছে।

কলিমদ্দি বলে উঠলো, 'চির দুঃখী মোরা মণ্ডল। তোমার দুঃখ কি? ঘর-বাড়ি, জমিন, গরু'—

'সব থাকতেও মোর কিছু নাই হে কলিমদ্দি।' মণ্ডল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'জোয়ান ব্যাটা ছেড়ে পালালো, সুখের আশায় বিয়ে-সাদি করলম—তা বউটাকে মানুষ কামড়ে খেল। সে-ও মরে গেল—

আমাকেও মেরে গেল। মোর সুখ কোথায় শেখ? এই এ চরের কপাল। বরঞ্চ সুখে আছে মুখি রাঁড়ীর ব্যাটা।'

'তার আর সুখ কোথায় মণ্ডল।' কলিমদ্দি যেন ঠেলে বলে উঠলো, 'তার ঘরে আগুন দিলে, ভিটে-ছাড়া ক'রে ছাড়লে। তবু তোমার রাগ পড়লোনি!'

মণ্ডল দাঁতে চিবিয়ে বললে, 'রাগ পড়বে মোর! মোদের এতগুলান চাষীর এত দুঃখের আবাদ বাঁধ কেটে ভাসিয়ে পয়মাল করে দিতে চেয়েছিল সে—সে-কথা ভুলে যাব এরই মধ্যে!'

'ও তোমার নিজের রাগ ছিল তার ওপরে, তাই একটা ছুতো তুলে খেপিয়ে দিয়েছিলে সবাইকে।' কলিমদ্দি বললো, 'সেদিন সবাই তোমরা বাঁধ পাহারা দিতে এসেছিলে—সেও এসেছিল, কোদাল কুপিয়ে তোমরাও যেমন ঝোরা বন্ধ করছিলে—সেও তাই করতে গেছলো। বাঁধ কাটবার ইচ্ছে থাকলে সে তোমাদের আঁ-আঁ ক'রে ডাক পড়বে কেন? ও তোমার বানানো কথা মণ্ডল। তোমরা যে যা বলো'—

'বানানো কথা মোর!' মণ্ডল খেপে উঠলো। জটলায় জমা সকলের মুখের দিকে চেয়ে ফেটে পড়লো রাগে, 'শুনছ তোমরা কলিমদ্দি শেখের কথা!'

কিন্তু সবাই চুপ করে আছে। ভুষণা শুধু মিন মিন ক'রে বললে, 'ও সব পুরাতন কথা বাদ দাও মণ্ডল।'

মণ্ডল ফুঁসে উঠলো—চোখে তার এ চরের মানুষের আদিম বর্বরতা—নৃশংসতা। দাঁতে চিবিয়ে বললে, 'আমি কথা বানিয়ে বলেছি! সেই জারজ পুত্তুরের ঘুষ খেয়ে—টাকা খেয়ে আবার চড়া চড়া কথা! বেইমান, তোর বাতিল চরের ফসল ওঠেনি এখনও ঘরে—এরই মধ্যে এত! এঁ্যা!'—

ভুষণা আবার বললো, 'ও কথা বাদ দাও মণ্ডল।'

'বাদ দেব ! ভুলে যাব সেই বাঁধ কাটার কথা !'

কিন্তু তেমন করে আর খেপে উঠে না কেউ। ওস্তাদের ঘরের নেভা আগুনের মতো ওদের ক্রোধও নিভে গেছে কবে—মণ্ডলও তার খবর রাখে না। খবর রাখে না সবুজের অঢেল বন্যা আর স্বপ্নের সঘন উচ্ছ্বাসে সেঁতিয়ে গেছে কবে ব্যর্থতা ও ঈর্ষার আগুন। সে আগুন জ্বলছে শুধু এখন মণ্ডলের বার্ধক্যের ব্যর্থতায়।

মণ্ডল বললে, 'পষ্ট চোখে দেখলম—কোপ মারছে বাঁধে।'

আরও কয়েকবার বললো মণ্ডল। কিন্তু মানুষগুলো বিপদমুক্ত দিনে আফিংখোরের মতো ঝিমিয়ে মিইয়ে গেছে যেন। শেষ পর্যন্ত মণ্ডল খেপে ওঠে ওদের সকলের ওপরে। গাল পাড়ে চৌকিদারকে উদ্দেশ ক'রে :

'সে শালাও এক ঘুষখোর—জলজ্যান্ত আসামী ধরে দিলেও ধরবে না। শুধু বলে—ট্যাকা দাও। এত পাপ ! যাবে—এ চর ধ্বংস হয়ে যাবে। এ আমি বলে দিলম। পাপ ঢুকেছে এ চরে।'

কেউ আর কোনো কথা বলে না। কলিমদ্দিও চুপ ক'রে গেছে। ওদের মাঝখানে ফুঁসতে থাকে শুধু হরি মণ্ডল। একটা চাপা পরাজয়ের গ্লানি তাকে অস্থির করে তোলে : আশ্চর্য, একটা লোককেও সে খেপিয়ে তুলতে পারলো না—দলে টানতে পারলো না আজ। শেষ পর্যন্ত ভৈরব দাসকে সঙ্গে করে চলে গেল অভিসম্পাত দিতে দিতে :

'ক্ষেতের ফসল উঠবে না কারুর—মড়ক লেগে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে সব। এ চরের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে—বলে গেলম।'

অভিসম্পাতে বুক কেঁপে উঠে চাষীদের : কে জানে কি ঘটে যাবে আগামী দিনগুলোয়। ক্ষেতের দিকে চেয়ে চেয়ে গুরু গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস একটা খসে পড়ে কার যেন : বহু কষ্টের—বহু সংগ্রামের আবাদ !—

ভূষণা ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'ওকে চটিয়ে দিলে শেখ—কি করবে কি জানি !'

'ঝুট বাৎ মেনে লেব ! ঝুটমুট বলে না-হক একটা বোবা মানুষকে গাঁ-ছাড়া করলে, ঘর জ্বালিয়ে দিলে—তা মেনে লেব ?'

'ঝুটমুট বলছো ?'

'ঝুটমুট ভূষণ ভাই—ঝুটমুট ! তোমাদের ও খেপিয়ে দিয়েছিল। জ্বলে মরছিল ও নিজের জ্বালায়—শেষ পর্যন্ত বউটাকে মেরে ঝুলিয়ে দিলে। না মানো আমার কথা, শুধাওগা তোমাদের চৌকিদারকে। সেদিন চৌকিদারের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটিতে বেরিয়ে পড়েছে কথাটা।'

'না না—তোমার কথায় মোরা বিশ্বাস করি শেখ। জানি তুমি ঝুট বলবার লোক নয়।' ভূষণা বললে, 'কিন্তু ও-সে এবার তোমার পেছনে লাগবে শেখ।'

কলিমদ্দি কাঠ-গলায় বললো, 'মোর কথা বাদ দাও—আমি বাতিল চরের চাষী, মোর ডর কি।'

'কিন্তুক তোমার ওই বাতিল চরের ক্ষেতের ফসল দেখে বুকের ভেতরটা যে জ্বলে যাচ্ছে ওর—সে খবর রাখো ?'

'রাখি—ওর জ্বালার আরও খবর রাখি স্যাঙাৎ। শুধু তোমরাই রাখ না।' কলিমদ্দি খোঁচা দিয়ে বললো, 'তোমাদের মণ্ডল—তোমরা মাথায় করে রাখ। আমি বাতিল চরের লোক—আমার পরোয়া কি !'

একটি চাষী ভয়ে ভয়ে বললো, 'তশীলদারকে ডেকে আনবে হয়তো।'—

'তাকে ডাকতে হবে না—সে আপনিই আসবে এবার।' কলিমদ্দি ত্যাড়া ভাবে বললো, 'বানে ডুবলে, ভুখায় মরলে, বাঁধ বাঁধলে, আবাদ করলে মরে মরে, সে আসবে এবার মালিকের ভাগ নিতে আর তোমার ঘরের বউ নিয়ে আমোদ করতে। আর তোমাদের মণ্ডল

দরজায় হুড়কো দিয়ে আগলাবে! সবুর কর, আসবে—আপনিই আসবে।'

এ চরের জীবন-বিপর্যয়কে কলিমদ্দি একটানে যেন জড়ো ক'রে ধরলো ওদের সামনে : ছাখ, এই তোমাদের এতদিনের জীবন-ধারা। বঞ্চনার সেই স্তূপের দিকে চেয়ে সবাই যেন ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে রইলো।

তারপর ভূষণা বললো আস্তে আস্তে, 'জানি শেখ এই মোদের কপাল।'

'কপাল!' কলিমদ্দি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে আবার কথাটা।

একটি চাষী মিন মিন ক'রে বললো, 'কি করবো—কোথায় যাব আর শেখ!'

'কেন যাবে? থাকবে। গতর দিয়ে থাকবে আর বউগুলানকে বলবে ধান-ঘরে যেয়ে লাথ মারতে।' কলিমদ্দির রোগা শুটকো মুখটা হঠাৎ ক্রোধে অনেক ভারি, অনেক বড় দেখায়। অসীম ঘৃণায় থুক্ করে থুথু ফেলে বললো, 'মরে মরে বাঁধ বেঁধেছ, আবাদ করেছ—ধানের ভাগ নিতে এলে টুঁটিটা চেপে ধরবে। সম্বন্ধি ছিল কোথায় এতদিন?'

কেউ কোনো কথা বলে না আর। সবাই চেয়ে আছে আদিগন্ত মেশা সবুজ হিল্লোলের দিকে : তাদের সারা বছরের মূর্ত জীবন-সংগ্রাম ধীরে ধীরে ফসল হয়ে উঠছে। চিকন সবুজ জঘনোরুর ফাঁক দিয়ে জন্মাচ্ছে কচি শিশুর মতো শীষ। ওরা কথা বলে না—প্রতিবাদ করে না। ওরা দিনে দিনে স্বর্ণাভ হয়ে ওঠে—আর মাথা নেড়ে চাপা গলায় যেন ডাকে : কে সে বীর লুটে নেবে ওদের—কে সে!···

২৮

কলিমদ্দির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় পরের দিনই মণ্ডল চলে গেল কোথায় ছাতা লাঠি নিয়ে—ফিরে এলো দিন দুই পরে। চৌকো মুখটা জমাট কঠিন। পশ্চিম চরের চাষীরা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল

না কেউ। আন্দাজ করে তারা নানান কথা। আশংকা করে—একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে এবার।

মণ্ডল এ ক'দিনে গম্ভীর হয়ে গেছে আরও—বড় একটা কথা বলে না কারুর সঙ্গে। তার বুড়ো বিক্ষুব্ধ মুখটার দিকে তাকায় সবাই ভয়ে ভয়ে। সেদিনের কথা কাটাকাটির পর মণ্ডল কথা বলে না আর কারুর সঙ্গে—যেন চটে গেছে সক্কলের ওপরে। তাই নানান সন্দেহ ও শঙ্কায় মনে মনে ছটফট করে পশ্চিম চরের চাষীরা : কে জানে—কোন দুর্ভাগ্যকে টেনে আনছে মণ্ডল এ চরে।

দাওয়ায় বসে বসে তামাক খায় মণ্ডল—এক-মনে কি যেন ভাবে। কখনো চেয়ে থাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। ওস্তাদের ঘরটা যেখানে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে কখনো বা খুক্ খুক্ ক'রে ওঠে। ঝুঁকে ঝুঁকে পায়চারী করে। ঘোলাটে বুড়ো চোখ দুটো তখন হঠাৎ শিকারী বাঘের মতো ভেতরের চাপা ক্ষুধা একটা ফিরে পায়। বন-কাটা, চর হাঁসিল করা মানুষের বেপরোয়া বন্যতা ছটফট করে ওর বুকের ভেতরে—চওড়া পাঞ্জা আর কেঠো কেঠো আঙুল কড়মড় করে মুঠোর মধ্যে : কিছু চাই, কিছু চাই-ই। আধিপত্য চাই—মেয়ে মানুষ চাই—প্রতিশোধ চাই—একটা ল্যাক-পেকে নরম গলা চাই। তারপর ওর জনহীন ঘরের স্তব্ধতায় ব্যর্থ আক্রোশে ঝিমিয়ে আসে সবটা।

এই লোকটার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি হঠাৎ আটকে গেল একদিন অনেক দূরে। কে একটা মেয়েলোক বাতিল পুবচরের খালের মোহনার কাছে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগলো পশ্চিম চরের দিকে। দূর থেকে চেনা যায় না। বেলাও পড়ে এসেছে তখন। মেয়েটি সোজা ভেড়ি বাঁধ ধরে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো আবার ওস্তাদের পড়ো ভিটের সামনে। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালো চার দিকে—যেন সে পথ-ভুল করেছে।

মণ্ডল এগিয়ে গেল সেই দিকে।

কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মণ্ডল। ফিরে এসেছে সখী—সেই মুখ-ফোঁড় মেয়েটা। কিন্তু মুখে নেই সেই ধার—দেহে নেই সেই যৌবনের তরঙ্গ হিল্লোল। বরং চোখে তার ক্লান্তি—বিশ্রামের তৃষ্ণা, সন্তান-সম্ভাবনায় গুরুভার দেহ। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো মণ্ডলের দিকে।

সখী জিজ্ঞেস করলো, 'অস্তাদের ঘর ?'—

মণ্ডল বললো, 'গ্রামের সবাই পুড়িয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে গো।'

সখীর চোখে এ সব শোনার কৌতূহল দেখা গেল না। শুধু ক্লান্তি—বিশ্রামের তৃষ্ণা ধু-ধু করছে তার দৃষ্টিতে। সখী যে-পথ ধরে এসেছিল সেই পথে আবার ঘুরে দাঁড়ালো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

মণ্ডল আমতা আমতা ক'রে বললে, 'একটু বসবি চল্ সখী—পথ হেঁটে কষ্ট হয়েছে হয়তো। মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে তোর! বসে একটু জিরিয়ে যা।'

সখী কোনো কথা না বলে তাকালো একবার মণ্ডলের চোখে চোখে অবাক হয়ে। তারপর কি ভেবে চললো মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে। মণ্ডলের দাওয়ায় এসে বসে পড়লো ক্লান্ত হয়ে। শুকনো ঠোঁটটা চেটে বললো, 'মোকে একটু জল দাও মণ্ডল!'

মণ্ডল ব্যস্ত হয়ে বললো, 'দিচ্ছি—হাত মুখ ধো, ধুয়ে শান্ত হয়ে বোস। কোথায় কতদূর থেকে এসেছিস তার ঠিক নাই!'

জল এনে দিল মণ্ডল। সখীর চোখে মুখে এক ভাবে লেগে আছে নিঃশব্দ একটা ঔদাসীন্য। যেন কোনো কথা তার জানারও ইচ্ছে নেই—বলারও ইচ্ছে নেই। অথচ এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলবার জন্যে মণ্ডল তখন ছটফট করছে কুলত্যাগিনী এই মেয়েলোকটাকে দেখে। গলে গলে পড়ছে তার খ্যাপা বুকের মধ্যে কি যেন।

মণ্ডল বললো, 'বসে একটু জিরো।'

সখী ঢক-ঢক ক'রে অনেকখানি জল খেয়ে নিয়ে বসলো তেমনি নিঃশব্দে।

মণ্ডল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, 'সুন্দরবন থেকে তা হলে দেখতে এলি আমাদের?'

সখী শুধু বললো, 'না মণ্ডল—চলে এলম, পালিয়ে এলম।'—

'ভালো ভালো—বেশ করেছিস!' মণ্ডল কেমন হল্‌বল্‌ ক'রে বললে, 'কোথায় থাকবি গাঁ ছেড়ে, দেশের মানুষ ছেড়ে। বেশ করেছিস—গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়ে ফিরে এলি।'

মণ্ডলের কথার ধরন শুনে সখী আবার তাকালো তার চোখে চোখে—মণ্ডলকে যেন সে বুঝতে পারছে না। বরং 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দিলে মণ্ডলকে চেনা যেন তার সহজ হতো।

মণ্ডল চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ তামাক টেনে গেল। যেন নিজেকে জড়ো করলো। তারপর বলতে লাগলো আস্তে আস্তে, 'এদিকেও কত কাণ্ড ঘটে গেল—পুবচরের পালালো সবাই ছেড়ে। মোরা আর কোথায় যাই—পড়ে রইলাম চরের মাটি কামড়ে। বুড়া বয়সে কম ঘা-ও তো পেলমনি। সংসার মোর শ্মশান হয়ে গেল সখী।'

সখী অবাক হয়ে দেখছে মণ্ডলকে: এ সেই পুরানো মাতব্বর হরি মণ্ডল নয় যেন। একটা কি ভেঙে দুমড়ে গেছে কোথায়।

মণ্ডল হলবল ক'রে বলে চললো, 'এই জমিন গোরু ঘর সংসার সব যেন মোর বুকে পাথর হয়ে চেপে বসেছে সখী। এ কি আমি মরে গেলে সঙ্গে যাবে? বল? আমাদের ভৈরব দাস ঠিক বলে: -এসেছ ল্যাংটা যাবে ল্যাংটা—মাঝখানে শুধু গণ্ডগোল।'

সখী এবার অস্বস্তি বোধ করছে।

মণ্ডল এক-মনে বলে চললো, 'সবই তো ফেলে চলে যাব— দিয়ে যাবো যাকে হোক। কিন্তু মনের মতো লোক পাই কোথায় বল !'

মণ্ডল হে-হে ক'রে হাসলো একটু সখীর দিকে চেয়ে। বললো আবার, 'তোকে দেখে হঠাৎ বুকের ভেতরটা মোর মোচড় দিয়ে উঠলো তাই। যাক্—চরের বউড়ি চরে ঘুরে এলো। গেল না হয় চর বাতিল হয়ে, ঘর না হয় ভেসেই গেছে—যাক, আমি হরি মণ্ডল তো এখনও বেঁচে আছি। তাই তো তোকে দেখে ছুটে গেলম।'—

সখীর ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে কেমন একটা সন্দেহ ঘনঘোর হয়ে উঠছে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো সখী। উসখুস করতে লাগলো এবার।

মণ্ডল ফের বললো মোলায়েম ক'রে, 'বেশ করেছিস পালিয়ে এসেছিস। কিছু ভাবনা নাই—থাক তুই। মোরও বুড়া বয়সে কেউ নাই।'—

সখী এবার উঠে দাঁড়ালো। বললো হঠাৎ, 'যাই আমি মণ্ডল।'

'যাবি !' মণ্ডল অবাক হয়ে বললো, 'কোথায় যাবি ?' গলা কেঁপে উঠলো মণ্ডলের—শুকনো ঠোঁটটা চাটলো জিভ বুলিয়ে।

'খেয়া ঘাটে।'

'কে আছে সেখানে ?'

'কেউ না।' তবু তারই মতো অনেকে আছে সেখানে—সেই ব্যর্থ জীবনের গুদামে। সখী পা বাড়ালো।

'তবে !' মণ্ডল আস্তে আস্তে কাঁপা গলায় বললে, 'সুখে থাকবি মোর কাছে সখী। মোর সব জমিন, গোরু, ঘর-বাড়ি'—

ঠিক এমনি ক'রেই বলেছিল একদিন হরেকেষ্ট মহাজন—মণ্ডল শুধু খপ-ক'রে হাতটা যা ধরছে না এখনও। সখী শুকনো গলায় বললো,

'ও লোভ আর মোকে দেখিওনি মণ্ডল। ও সব আমি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।'

'লোভ নয় সখী,'সত্যি। মা গঙ্গার দিব্যি।' মণ্ডল ঠিক হয়েকেষ্ট মহাজনের মত হাত একটা চেপে ধরলো এবার সখীর। বললো, 'সব তোর।'

'ছাড় মণ্ডল—ও আমি জানি। ও জীবন আমি চিনেছি।' বলে সখী ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল জোরে পা টেনে।

মণ্ডল দাঁড়িয়ে রইলো মার খাওয়া মুখে কিছুক্ষণ। তারপর থুকু থুকু ক'রে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দিল হাওয়ায়।

গাল দিলে, 'মর হারামজাদী।' দাওয়ায় ফিরে এসে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়লো ধপ্ ক'রে। সারা ঘর তার বড় নির্জন লাগে—বড় একলা মনে হয়। এই ঘরের শূন্যতা—এই মনের শূন্যতা ভরে দেওয়ার জন্যে এখনও তার একটা মেয়েলোকের দরকার। ওই বুড়ো কাঠামোটার মধ্যে এ চরের অপরাজিত আদিমতা ছটফট ক'রে মরছে তখনও।

মণ্ডল একদৃষ্টে চেয়ে রইলো দূরে অপসৃয়মান নারী মূর্তিটার দিকে। মেয়েটা ক্লান্ত পা টেনে টেনে চলে যাচ্ছে সিধে পুবচরের দিকে—যেখানে একটি মাত্র কুঁড়ে শুধু মাথা তুলে আছে। চরে ফিরে এসেছিল সে—ঘরে ফিরে এসেছিল, কিন্তু সব কোথায় ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে। কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।

তাকে দেখে কলিমদ্দিও থমকে দাঁড়ালো মণ্ডলের মতো অবাক হয়ে।

'সখী না!'

'চিনেছ কলিমদ্দি?' সংশয়ে তাকালো সখী।

'চিনেছি।'

'অস্তাদ কোথায় গেছে জানো ?'

কলিমদ্দি নীরবে শুধু মাথা নাড়লো।

'এ চরে শুধু একলা তুমিই আছ ?'

কলিমদ্দি বললো, 'একলা আমিই আছি।'

'আর সব ?'

'বাঁধ ভেঙে যেতে কে কোথায় সব পলালো।' কলিমদ্দি এক-নজরে দেখতে লাগলো সখীকে। বললো, 'সুন্দরবন থেকে চলে এলে যে ?'

'পালিয়ে এসেছি কলিমদ্দি।' সখী বললো, 'নিজের ঘরে মাথা গুঁজে মরতে এসেছিলাম। তাকে খুঁজে পেলম না—তাই গেছলাম অস্তাদের কাছে। সে-ও নাই'—বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে তাকালো সখী। আস্তে আস্তে বললো, 'মণ্ডল আবার পেছনে লাগলো।'

'কি বললো মণ্ডল ?' কলিমদ্দি কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

'সে আর কি শুনবে কলিমদ্দি।' সখী তার বিষণ্ণ মুখটা আর এক দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললো, 'যার ভয়ে পালিয়ে এসেছি সুন্দরবন থেকে—সেই ভয়েই পালিয়ে এলম মণ্ডলের কাছ থেকে।'

'এখন কোথায় যাবে ?'—

'কোথায় যাব ? কে জানে ! অস্তাদ নাই—থাকলে মোকে ভাবতে হতোনি।' টেনে টেনে বললো সখী। ঢোক গিলে বললো আবার, 'তোমার ঘরে একটুন বসে জিরোই কলিমদ্দি।—শরীর মোর আর সইছে না।'

'বসো বসো'—কলিমদ্দি বসতে দিল সাদরে। বললো, 'বসতে বলতে ভুলে গেছি কথায় কথায়। অস্তাদ নাই—তার হয়ে আমি আছি। বসো তুমি—জিরোও।' তারপর চুপ করে কি ক্ষানিক ভাবলো কলিমদ্দি। ভাবলো—এ চরের অনেক কথা, এক লহমায় ঠেলে এলো

সেই আনন্দের দিনের কাহিনী—তুলসী, ওস্তাদ আর এই মেয়েটার কথা। তুলসী নেই—মরে গেল কতদিন হলো! আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কলিমদ্দি বললে, 'কিছু মনে না করো তো থাক তুমি গরীবের ঘরে—আমি খুঁজে বার করি অস্তাদকে।'

সখী শুধু একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাকালো।

কলিমদ্দি বললো, 'এক্লা টিকে আছি এ চরে। অস্তাদ না থাকলে তখন কোথায় ফৌত হয়ে যেতাম এতদিনে আমি আর মোর লেড়কাটাও।'

'তার সব কথা বলো কলিমদ্দি।' সখীর শুকনো চোখ মরুভূমি—তাকিয়ে রইলো সে কলিমদ্দির দিকে তার অন্তহীন তৃষ্ণা নিয়ে।

তার কথা ভেবেই আবার এ-পারের চরে পাড়ি দিয়েছিল সখী। এখানে দুর্বিপাক আর যাই থাক—ওস্তাদ আছে। সে তাকে ক্ষমা করবে—হাত বাড়িয়ে দেবে দুর্দিনে। তার ভেতরে নতুন একটি অতিথি বেড়ে উঠছে দিনে দিনে—তার নিস্ফলা জীবনে বহু দূর দিনের এক মূর্ত স্বপ্ন। তাকে যেমন ক'রে হোক বাঁচাবেই সে জমি-লোভী হিংস্র মানুষগুলোর হাত থেকে।

কলিমদ্দি সে-সব কথা শুধোয় না কিছু—তবু বলে সখী আপনা থেকে। তার পেটের ছেলেটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল হরেকেষ্ট মহাজনের ছেলেরা—বাপের সম্পত্তির ওয়ারিশান কমাতে চেয়েছিল। সেঁকো বিষ দিয়েছিল মুড়ির সঙ্গে। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হয়েছিল সখীর—ছড়িয়ে দিয়েছিল কাকের মুখে।

'দেখতে দেখতে কাকগুলান মরে গেল ঠক ঠক ক'রে।' সখী বললে আস্তে আস্তে।'

'আল্লা!' কলিমদ্দি ভালো ক'রে দেখলো একবার আগাগোড়া সখীকে। বললে, 'ভাগ্যিস পালিয়ে এলে।'

'হ্যাঁ—তাই পালিয়ে এলম শেখ, মোর পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে। জীবনে মোর আর কি আছে শেখ—ওইটুকুন ছাড়া ?'

সেই দিন রাতেই পাড়ি দিয়েছে সখী কারুকে কিছু না বলে। এ চরে তার জমি না থাক, মাথা গোঁজার ভিটে একটু তো আছে, আর আছে ওস্তাদ।

কিন্তু কোথায় কি! ···

কলিমদ্দি বললে আস্তে আস্তে, 'নাই—এ চরে আর গান নাই, গানের লোক মোর চলে গেছে। এ চরে এখন আছে শুধু মোদের দুঃখ, মোদের মরণ।'

সূর্য কখন অস্ত গেছে। সখী বসে আছে এক ভাবে গালে হাত দিয়ে। সামনের মাঠ প্রান্তর জুড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার কালো আকাশের দরিয়ায় রহস্যময় হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।

কথা বলতে বলতে থেমে গেছে ওরা অনেকক্ষণ। সামনে অন্ধকার। সেই অন্ধকার ঠেলে পশ্চিম চরের কয়েকজন চাষী দল বেঁধে এসে দাঁড়ালো সন্ধ্যের পরে। সামনে ভুষণা।

'কে!'

'মোরা এলম শেখ'—ভুষণা এগিয়ে এলো তার দলবল নিয়ে। বললে, 'খবর দিতে এলাম শেখ—তশীলদার এসেছে। মণ্ডল ছুটেছে মুরগীর খোঁজে।'

কলিমদ্দি ত্যাড়া ভাবে বললে, 'আর শরাব—মদ ?'

'কে জানে—হারামজাদা ছ্যাঁচড়ের কাছে আছে হয়তো।'

'তোমরা গড় করতে গেলে না ?'

ভুষণা সহজ গলায় বললো, 'মোরা ঠিক করেছি, মোদের ডাকলেও যাব না শেখ।'

'ফসল—ধান ? সে তবে রাখবে কি ক'রে গো!'

'কার ধান কে নেয় শেখ।' ভূষণা বললো, 'দুটো কথা। তোমাকে মোরা বলতে এলম শেখ। তোমার ওপরে কোনো বেঅন্যায় অত্যাচার হলে মোরা তোমার সঙ্গে আছি। আর ফসল উঠে গেলে পরে তোমার ক্ষেতটুকুন মোরা বাঁধ দিয়ে ঘিরে দেবো শেখ।'

'শুধু মোর ক্ষেতটুকুন বেঁধে দেবে—না?' একটু হাসলো কলিমদ্দি। সখীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ওইখেনে আরও একজন পুব-চরের মানুষ বসে আছে গো—চরে ঘুরে এসেছিল নিজের ভিটায় মাথা গুঁজবে বলে। এসে দেখে—কোথায় কি, সব ফাঁকা।'

সবাই জিজ্ঞেস ক'রে উঠলো এক সঙ্গে, 'কে!'

অন্ধকারে এক-ভাবে বসে আছে সখী—তাকে দেখতে পায়নি কেউ। কলিমদ্দি বললো, 'সখী।'

'সখী!'

'হ্যাঁ, সখী।' কলিমদ্দি বললো, 'সে ছুটে এসেছিল ওপারের মায়া কাটিয়ে এপারে। ভেবে ভেবে এসেছিল, তেমনি হয়তো আছে চর—তোমাদের তেমনি গাওন-বাজন, তেমনি আনন্দ-মাতন।'

হায় সে-দিন! সে কত দিনের কথা! মুহূর্তে হারানো সেই ছবিটা ভেসে গেল যেন সামনের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত ক'রে। হারিয়ে গেলেও অতো বড় একটা জীবন্ত সত্যের সামনে ওরা যেন থমকে দাঁড়ায় মুহূর্তের জন্যে। কথা বলে না—অন্ধকারে খোঁজে কলিমদ্দির মুখটাকে।

কলিমদ্দি আস্তে আস্তে বললো যেন আপন মনেই, 'নতুন অতিথ আসবে মোর ফাটা বাতিল চরে। আহা মোর চর গো! সবাই একে ফেলে পালিয়েছে।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'থাক—আমি আছি। মোর ঘরে এখন কটা দিন থাক গো সখী—একটা কুঁড়ে তুলে দেব আমি। আর মোর বাতিল চরের ফসলে সমান ভাগ

রইলো মোর পবনার আর তোমার লেড়কার। এই মোর জবানী ! আর ভেসে যাই তো গেলাম !'—

'শেখ !' ভুষণা কলিমদ্দির একটা হাত চেপে ধরলো।

'বলো।'—

'তুমি একা নও।' ভুষণা বললো, 'সবাই ছেড়ে পালিয়ে গেছে তোমার চর—কিন্তু মোরা আছি, মোরা রইলম তোমার সঙ্গে আজ থেকে। সখীর কুঁড়ে তুলে দেবো মোরা সবাই।'

কলিমদ্দি ত্যাড়া ভাবে বলে উঠলো আবার, 'তারপর আগুন লাগিয়ে দেবে একদিন।'

'মোদের ক্ষ্যামা কর শেখ।'

'হোই কলিমদ্দি শেখ !'—

এমন সময় অন্ধকারে হাঁক পেড়ে এসে দাঁড়ালো আর একটি মূর্তি—হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি।

'আমি চৌকিদার। তশীলদারের ডাক আছে।' চৌকিদার এগিয়ে এলো কাছে। তারপর সবাইকে যেন সে আবিষ্কার ক'রে ফেললো, 'আরে সব তোমরা এখেনে। আমি শালা সক্‌কলকে খুঁজে খুঁজে হাল্লাক।'

কলিমদ্দি জিজ্ঞেস করলো, 'ডেকেছে কেন ?'

'জানিনি। মোকে শুধু ডেকে দিতে বললো। তোমাদের সবাইকে। ভুষণা—চল হে।'

কলিমদ্দি বললো, 'না যদি যাই।'

'যেয়ে তা হলে তাই বলবো।'

ভুষণা বলে উঠলো, 'তাই বলবে যাও। মোরা যাবনি।'

'সব্বনাশ ! খারাপ কথা হবে যে হে !'

'তুমি যাও হে—তোমাকে আর বোঝাতে হবে নি।' বস্থিনাথ খেঁকরে উঠলো।

হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চৌকিদার। ব্যাপারটা কেমন যেন বেয়াড়া লাগে তার কাছে। বললো, 'মোকে আট গণ্ডা পয়সা যদি দাও—আমি সব গোছগাছ ক'রে বলতে পারি।'

কলিমদ্দি বললো, 'মোদের পয়সা টয়সা নাই চৌকিদার—যা বলবার বল যেয়ে।'

'বেশ।'—চৌকিদার বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল ভেড়ি-বাঁধ ধরে, 'পয়সা দেওয়ার বেলা সব শালা সমান।'—

সবাই বসে রইলো চুপ করে। এই না যাওয়ার ফল কি হবে—কেউই সঠিক জানে না। তবু বোঝে এটুকু—তাদের বহু কষ্টের আবাদ—ফসলের ক্ষেত সামনে রেখে গোঁ ভরে দাঁড়ালো তারা সারি দিয়ে একদিকে।

কলিমদ্দি বললো, 'তোমরা গেলে না—ভেবে চিন্তে দেখেছ সবাই?'

'দেখেছি শেখ।' ফুঁসে উঠলো বস্থিনাথ, 'মোর বউয়ের ভাঙা হাতটার দিকে চাইলে তোমারও আর কিছু ভাববার থাকবে না। মণ্ডল মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। বউটা মোর মুখ গুঁজে গুঁজে কাঁদে গো—বুঝতে পারি না সে পেটের জ্বালা না ভাঙা হাতের জ্বালা।'

সামনের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মতো অনিশ্চিত আগামী দিন। ওই অনিশ্চয়তার মধ্যে ধুঁইয়ে উঠছে ওদের জীবন-সংগ্রামের অজ্ঞাত অধ্যায়। প্রকৃতিকে জয় করেছে ওরা—সামনে এবার প্রভুত্বের সংগ্রাম। এই অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে আছে কলিমদ্দি—চেয়ে আছে পশ্চিম চরের ক্ষুধার্ত চাষীরা। চেয়ে চেয়ে দীপ্ত হয়ে উঠছে সখীর ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখও কোন এক অফুরন্ত স্বপ্নভরা মহান সম্ভাবনায়—যখন কলতান উঠবে তার দাওয়া উঠোন ভরে, বুকের

লুকানো ঘুম-পাড়ানী গান কেঁপে উঠবে এ চরের আনন্দ-মুখর আকাশে আর মাঠে।—তবু একটা লোক—একটা বোবা লোকের জন্যে অনেকখানি জায়গা যেন ফাঁকা থেকে যাবে এ চরের মাটিতে আর আকাশে।

এমন সময় অনেক দূরে কে গান গেয়ে উঠলো যেন সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সবাই : কোথায় একটা সবল কণ্ঠ উছলে উছলে উঠছে গানে—সুরে। কতদিন পরে আবার এই গান! ধানবনের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে এ চরের জমাট স্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে :

আমি নয় গো নবীন বিদেশী।
আহে ঘুরে ঘুরে আবার এসেছি।

কতদিন আগের সেই হারানো সুর! ···

কলিমদ্দি শুধালো, 'কে!'

ভুবণা বললো, 'কালি বোধ হয়। ওর উঁচু ডাঙার জমিতে ধান পেকে গেছে—কাটতে গেছলো আজ।'

অন্ধকারে চোখ রেখে কানখাড়া ক'রে শুনতে লাগলো সবাই। ভরে উঠেছে ওদের চোখের সামনের শূন্য অন্ধকার—স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা লোকের অস্পষ্ট মুছে যাওয়া স্মৃতি-মূর্তি। কতদিন পরে আবার গান ফিরে এলো এই চরে! ধানের গায়ে কোথাও কোথাও লেগে গেছে পাকা সোনার রং। আর আনন্দ যেন গানে আর সুরে উছলে উঠছে ওই একটি সবল কণ্ঠে। সে হয়তো জানেও না—তার সামনের অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে আছে প্রভুত্বের সংগ্রাম। তবু—বুক খুলে রেখেছে এ চরের ফসল ভরা মাঠ—বীরের ভোগের অন্নদাত্রী বসুন্ধরা।

—